সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

দ্ব্যশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

দ্ব্যশীতিতম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮২তম বর্ষ ॥ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা ॥

সূচীপত্র

ক্রোড়পত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ত্র্যশীতিতম বর্ষগ্রন্থি উপলক্ষ্যে

মানবিকী-বিদ্যায় ভারতের জাতীয় আচার্য্য
অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত
সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ জীবনের ৮২ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৮৩তে পদার্পণ করিল। এই ৮২ বৎসরে, বঙ্গদেশ, গৌড়-জন (বা বঙ্গ-ভাষী জন) এবং বঙ্গভাষা, পৃথিবীর আর সমস্ত দেশ, অধিবাসী ও ভাষার মত পতন-উত্থান-বন্ধুর পন্থায় যুগে যুগে ধাবিত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র রাঢ়, সুহ্ম, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল, পট্টিকের, শ্রীহট্ট, কোচবিহার পূর্ব-কামরূপের অধিবাসী, মাগধী অপভ্রংশের পূর্বী শাখার অন্তর্গত আর্য্য-ভাষার নানা বুলী যাহারা বলিত, উপরন্তু যাহাদের ঘরোয়া ভাষায় কোল, দ্রাবিড় ও কিরাত শ্রেণীর বিভিন্ন উপভাষার পরিবেশ-প্রভাব ও আভ্যন্তরীণ-সংগ্রন্থন বা মিলন অল্প-বিস্তর দেখা দিতেছিল, তাহাদের সেই-সমস্ত বুলী, আলোচনার সুবিধার জন্য যেগুলিকে এক সর্বন্ধর নামের সূত্রে বাঁধিতে পারা যায়—"গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-পট্টিকের-চট্টল-সমতট-রাঢ়-সুহ্ম-ওড্র" এই নামে যে-সমস্ত বুলীর পারস্পরিক সংযোগের পরিচয় দেয়—সংক্ষেপে রাঢ়-সুহ্ম-গৌড়-বঙ্গ-কোচ-চট্টলের বুলী বা ভাষা, এখন হইতে হাজার বছর আগেই—যখন স্বতন্ত্র ভাষা রূপে বাঙ্গলা-অসমিয়া-উড়িয়া সৃজ্যমান, সেই চর্য্যাগানের যুগেই তখনও সৃজ্যমান এক সাধারণ সর্বজন-বোধ্য ও সর্বজন-গ্রাহ্য গৌড়-বঙ্গীয় সাহিত্যিক ভাষার বা সাধু ভাষার রূপ গ্রহণ করিতেছিল। এবং "বঙ্গাল-বাণী" নামে খ্রীষ্টীয় ১২০০ সালের আগেই এই ভাষা, ভারতের আধুনিক আর্য্যভাষা-গোষ্ঠীতে নিজ বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। এই ভাষা, গৌড়ীয় সাধু ভাষা, অথবা বাঙ্গাল ভাষা, যাহা বিদেশী মুসলমান

বিজেতাদের কাছে "জ. বান-এ-বঙ্গলহ" বা "বাঙ্গলা (বাংলা) ভাষা" রূপে পরিচিত হয়, এবং ইউরোপীয় বিদেশী যেমন পোর্তুগীস্, ফরাসী, ইংরেজ যে ভাষার নাম দেয় Bengalla, Bengal, Bengalese, Bengalee বা Bengali—এই ভাষা এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষা। বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপভেদ বা বুলী এই বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে থাকিলেও, সারা বাঙ্গলায় ইহার ব্যাকরণ, ইহার কতকগুলি উচ্চারণ-রীতি, ইহার সাধারণ শব্দাবলী, ইহার বাক্য-ভঙ্গী, ইহার "ভাষা-প্রকৃতি" সর্বত্র এক; এই জন্য ইহাকে এক এবং অখণ্ড ভাষা বলা যায়। পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে, লোকসংখ্যা ধরিলে বাঙ্গলা ভাষার স্থান এখন অষ্টম—ইংরেজী, উত্তর-চীনের ভাষা, ভারতের হিন্দুস্থানী (উর্দূ-হিন্দী), সোভিয়েট রাষ্ট্র-সংঘের রুষ, স্পানীয়, জর্মান, জাপানী—এই সাতটি প্রমুখ ভাষার পরে অষ্টম হইতেছে বাঙ্গলা। পূর্ব-বঙ্গ অর্থাৎ এখনকার স্বাধীন রাষ্ট্র "বাংলা-দেশ" এবং ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য "পশ্চিম-বঙ্গ"—এই দুই দেশেই যথা-ক্রমে ৭॥০ কোটি এবং ৪ কোটি, একুনে ১১॥০ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গলা। এ ছাড়া বিহারে, উড়িষ্যায়, আসামে, ভারতের অন্যত্র আরও বঙ্গভাষী আছে। ইংরেজীর প্রচলন ৫৫ কোটির উপর লোকের মধ্যে; উত্তর-চীনার, কমপক্ষে ৩০ কোটির মধ্যে; হিন্দুস্থানী বোঝে ১৭।১৮ কোটি, যদিও ঘরে বলে মাত্র ২॥০ থেকে ৩ কোটি; রুষ, ১২॥০ কোটি; জর্মান ১২ কোটির কিছু উপর; জাপানী ১২ কোটি; আর এর কাছাকাছি পৌঁছায় বাঙ্গলা। তার পরে আসে "বাহাসা (বা ভাষা) ইন্দোনেসিয়া (বা মালাই)"—৮॥০ কোটি। এগুলির পরে পাই—আরবী ৬॥০-৭ কোটি, ও ফরাসী ৬॥০ কোটি।

এই ভাষায় নিহিত সাহিত্য পৃথিবীর কয়েকটি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম; বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনার অনন্য গৌরবের অধিকারী হইয়াছে আমাদের বাঙ্গলা। প্রাচীনতর বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নাই, বঙ্কিমচন্দ্র নাই, মধুসূদন নাই, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর নাই—কিন্তু কতকগুলি বৈষ্ণবপদ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, এবং চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ—এমন কি

ভারতচন্দ্র— অন্য যে কোনও ভাষার গৌরব-স্থল হইতে পারে। বাঙ্গলা ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, ইহার মিষ্টতা ও ভাব-ব্যঞ্জনা, উচ্ছ্বসিত ভাবে ভাষা হিসাবে ইহার নানা গুণের ভূয়সী প্রশংসা ভাষাতত্ত্বে প্রথিতযশাঃ বহু আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত-ও করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষার উত্তরাধিকারী বাঙ্গালী শিক্ষিত জনের মাতৃভাষার রক্ষণ ও পোষণ সম্বন্ধে যে দায়িত্ববোধ থাকা উচিত, তাহার কিছু অভাব এতদিন দেখা যায় নাই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, বিশেষতঃ আমাদের স্বাধীনতা-লাভের পরে এই শতকপাদ ধরিয়া, ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে, বিশেষ করিয়া ব্যাপক ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, যে অভাবনীয় অধোগতি দেখা দিয়াছে, তাহার ভয়াবহ পরিণাম এখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। "মাতৃভাষাকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করো, বিদেশী ভাষা ইংরেজিকে তাড়াও" এই বুলি মুখে জোর-গলায় আওড়াইতেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই মিলিয়া মহোৎসাহে বাঙ্গলা ভাষার পরিপাটী, তাহার শালীনতা, ভদ্রতা, তাহার দ্যোতনা-শক্তি, সমস্তই নষ্ট করিয়া, তাহার গুণ, শক্তি ও মাধুর্য্য কোনও কিছু রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা আমরা করি না। মাতৃভাষার চর্চায় যে কিছুটা পরিশ্রম অবশ্য কর্তব্য, কিছুটা জিজ্ঞাসা ও বিচার-বিবেচনা বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত— সে কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। কি বানানে, কি ব্যাকরণে, কি শব্দের প্রয়োগে, কি বাক্যরীতিতে, কি ভাষার স্বকীয় প্রকৃতির সহিত পরিচয়ে কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ না থাকিলে যে সেই ভাষা ঠিক-মত সানন্দ-সাবলীল ভাবে লিখিতে পারা যায় না, তাহা আমাদের বোধ-বিচারের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার আধুনিক লেখক যাঁহারা এ বিষয়ে অবধান করেন না, বিনীত ভাবে যুক্তি-তর্ক দিয়া নূতন করিয়া আবার তাঁহাদের গোচরে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ফল হয় নাই।

পশ্চিম-বঙ্গের বহু লেখকের মধ্যে যে একটা অবহেলার ভাব দেখিতে পাই, তাহা কিন্তু অধুনাতন স্বাধীন "বাংলা-দেশ"-এর অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের লেখায় তেমন পাই না। যে নিষ্ঠার সহিত পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গ নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী লেখক মাতৃভাষার চর্চা করিতেন, তাহা, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবী উর্দুর

কবল হইতে বাঙ্গলা ভাষাকে রক্ষা করিবার পর, বাংলা-দেশের লেখক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আবার দেখা দিতেছে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, কায়কোবাদ, মশার্‌রফ হোসেন, আবদুল করীম, গিরীশচন্দ্র সেন, এমনকি সুদূর কালের আলাওল, দৌলত কাজী, অজ্ঞাতনামা "ইসলামী সাহিত্য" রচয়িতা বহু কবি,—ইহাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সার্থকভাবে বাংলা-দেশের বহু লেখক মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন, এবং বাংলা-দেশের অন্য হিন্দু লেখকগণের সহিত, তথা পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের সঙ্গে মিলিয়া বাঙ্গলা-ভাষার গৌরব আরও বাড়াইয়া তুলিছেন।

সুখের বিষয়, পূর্ব-বঙ্গের তথা পশ্চিম-বঙ্গের কৃতী লেখক-লেখিকাগণ বাঙ্গলা ভাষার বিরাট্ শব্দসম্ভারের সম্বন্ধে আর নিরপেক্ষ নহেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুপ্রাণনায় পূর্ব-বঙ্গের (পূর্বেকার "পূর্ব-পাকিস্তান"-এর) কয় জেলায় প্রচলিত মৌখিক বাঙ্গলার শব্দাবলীর অভিধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পশ্চিম-বঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় যে অনুরূপ মৌখিক বাঙ্গলা শব্দের অভিধান, সারা-বাঙ্গলার সব কয়টি জেলা ধরিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার মূল্য অপরিসীম। পরিকল্পিত পরিপূর্ণ বাঙ্গলা অভিধানের অন্যতম পৃষ্ঠভূমি বা আধার রূপে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের দুই খণ্ডে রোমান হরফে বাঙ্গলায় প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গলার অভিধানকেও এক মুখ্য স্থান দিতে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিকল্পিত এবং ইতোমধ্যে আরব্ধ বঙ্গভাষার বিরাট্ অভিধান, যাহাতে সাহিত্যিক ও মৌখিক, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব প্রকার শব্দের সংগ্রহ করিবার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য লইয়া উদ্যোক্তাগণ এই কাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার উল্লেখও এই প্রসঙ্গে আবার করিতে হয়। এক ও অদ্বিতীয় বাঙ্গলা-ভাষার বহু রূপ—এবং সেই-সমস্ত বহুধা প্রকাশিত বাঙ্গলার সুষ্ঠু সাহিত্যিক প্রকাশে সত্যকার রস-সর্জনা যে একাধিক বাঙ্গলা-লেখক-লেখিকা উভয় বাঙ্গলাতেই করিতেছেন, তাঁহাদের দুইএকজনের কথা বলিয়া আমি তাঁহাদের সাধুবাদ দিতে চাই। এইবার ঢাকায় গিয়া অধ্যাপিকা শ্রীমতী রিজিয়া রহমানের লেখা "ঘর ভাঙ্গা-ঘর" নামে একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস উপহার রূপে

পাই। ঢাকা হইতে ফিরিবার পথে বিমানের মধ্যেই পড়িতে আরম্ভ করি, এবং বইখানি শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারি নাই। নদীর দেশের গৃহচ্যুত গৃহ-হীন মুসলমান শরণার্থীদের জীবন-কথা, যে গভীর অনুভূতি ও সহানুভূতির সঙ্গে কতকগুলি সামাজিক আখ্যায়িকার মাধ্যমে লেখিকা দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত এই-সব গৃহ-হারা মানুষদের মুখের ভাষা কি সুন্দর ভাবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বইখানির কথা-বস্তু যে শুদ্ধ সাধু বাঙ্গলার কাঠামোর মধ্যে লেখিকা ধরিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে তাঁহাকে শত সাধুবাদ দিয়াছি। মধ্য বাঙ্গলার এক অস্পৃশ্য হিন্দুজাতি—বাঙ্গলার মুচিদের ঘরের কথা এবং তাহাদের মুখের ভাষা লইয়া আর একখানি বিশেষ লক্ষণীয় বই লিখিয়া, বাঙ্গলা-ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নির্মল আচার্য্য, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তাঁহার "তৃতীয় মেরু" গ্রন্থে। এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ হইল শ্রীযুক্ত আবদুল জব্বার তাঁহার নূতন একখানি অতি মূল্যবান বই বাহির করিলেন—"পল্লীর পদাবলী"—এই বইখানি কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রামের লোক, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-কথার একখানি সম্পূর্ণ আলেখ্য, এবং সাহিত্যের রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, এই অঞ্চলের গ্রামীণ বাঙ্গলা ভাষার একটি প্রায় সম্পূর্ণ শব্দ-সংগ্রহ। সারা বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সমাজের খাঁটি কথায় ভরপুর জব্বার সাহেবের "বাংলার চালচিত্র", "মুখের মেলা" প্রভৃতি কতকগুলি বইও অনবদ্য।

বিদেশাগত বঙ্গভাষা-প্রেমী বাঙ্গলা-লেখকদের দানও বিশেষ লক্ষণীয়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ হইতে বাঙ্গলাদেশে পোর্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গলায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বই লিখিতে থাকেন, এবং Dominic de Sosa দোমিনিক দে সোসা হইতে আরম্ভ করিয়া Padre Manoel da Assumpcam মানুএল দা আসুম্পসাওঁ ও তাঁহার পরেকার বহু পোর্তুগীস পাদ্রি, বাঙ্গলা ভাষায় একটি খ্রীষ্টান সাহিত্য গড়িয়া তোলেন, তাহারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইংরেজ খ্রীষ্টান পাদ্রিরাও এ-কাজে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহাদের হাতে অনুবাদের ভাষা তেমন খুলে নাই। কিন্তু পাদ্রি মানুএল দা

আস্‌সুম্পসাওঁয়ের "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থের পরে, ইংরেজ মেয়ে Mrs. Hannah Catherine Mullens শ্রীমতী হানা কাথেরীন্ ম্যলেন্স ১৮৫২ সালে যে একখানি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত করেন, "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ", তাহা উল্লেখযোগ্য। বইখানি অতি সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালে, অন্ততঃ দুইজন ফরাসী-ভাষী বেলজিয়ম-দেশীয় পাদ্রি, Father Dontaine দঁতেন ও Father Detienne দ্যতিয়েন, সার্থকভাবে বাঙ্গলা-ভাষার অপরিসীম সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। খ্রীষ্টান (রোমান কাথলিক মতের) শাস্ত্র-গ্রন্থের ভদ্র ও সুপাঠ্য বাঙ্গলা অনুবাদের কাজে নামেন ফাদার দঁতেন। প্রায় ৪৫ বৎসর ইনি কলিকাতায়, শ্রীরামপুরে ও তাহার আশপাশে কাটাইয়া গিয়াছেন। ফাদার দ্যতিয়েন কত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে আছেন জানি না, তবে তিনি পূর্ব-ও পশ্চিম-বঙ্গ উভয়ত্রই বহু বৎসর ধরিয়া শিক্ষা ও খ্রীষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন। রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের সম্মান-সূচক পদবী হইতেছে "পিতা", যাহার প্রতিরূপ লাতীনে Pater এবং তাহা হইতে পোর্তুগীসে Padre "পাদরি", ফরাসীতে Pere "পেয়রে", ইংরেজী অনুবাদে বা প্রতিরূপে Father. (বাঙ্গলায় আমরা ইংরেজির "ফাদার" না বলিয়া খাঁটি বাঙ্গলা ধর্মীয় উপাধি-রূপে উত্তর-ভারতে বহুশঃ ব্যবহৃত "বাবা" বা "বাবাজী" বলিতে পারি—পাদ্রি দঁতেন-ও "বাবাজী দঁতেন" শুনিয়া খুব খুশী হইয়া ছিলেন।) "বাবাজী দ্যতিয়েন" সাহেব, বিদেশী হইলেও বাঙ্গলা-ভাষার এক অদ্ভুত শক্তিশালী লেখক। ইনি নিয়মিত-ভাবে এখন "অমৃত" সাপ্তাহিক পত্রিকায় "রোজ-নামচা" এই নাম দিয়া, ছোট ছোট নকসা, চরিত্র-চিত্রণ, ছোট গল্প, জীবনের চিত্র অদ্ভুত সুন্দর ভাবে লিখিতেছেন, বাঙ্গলা-ভাষা "মোমিন" অর্থাৎ পাকিস্তান এবং বাঙ্গলা-দেশের আস্থাশীল মুসলমান ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ তরুণ-তরুণীর মধ্যে কী রূপ ধারণ করিতেছে, সাধারণ বাঙ্গলা কি ধরণে সকলেই প্রয়োগ করে,—বাঙ্গলা-ভাষার গভীর অন্তঃস্থল থেকে তাহার মর্মকথা, অসাধারণ জ্ঞান, শক্তি ও সাহিত্য-বোধের সঙ্গে বাহির করিয়া, সার্থক রসোত্তীর্ণ রচনায় তিনি এখন প্রকাশ

করিয়া দিতেছেন। ইহার পূর্বে "দেশ" পত্রিকায় তিনি নিজের জীবনের ও অন্য নানা কথায় পূর্ণ দিনলিপি ("ডায়ারি") বাহির করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লন। আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলার অন্তর্নিহিত এই-সমস্ত লুক্কায়িত শক্তি তিনি আবিষ্কার করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ফরাসী-ভাষী বিদেশী—মানুষের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুকম্পা ও সহানুভূতি, মনের মধ্যে ব্যথায় যে-মানুষ গুমরিয়া উঠিতেছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহার এই অপরূপ দরদ—আর ধর্ম-বিষয়ে তাঁহার সাধারণ মানবিকতা-বোধ, সব প্রকার গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে তিনি—মানুষের সেবায়, এবং ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বভূতে তাঁহার মৈত্রীর জন্য, এবং বিশেষ করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গে তাঁহার বঙ্গভাষার সেবার জন্য, আমি তাঁহাকে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিরাশীতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে সাধুবাদ দিতেছি।

নিজের আভ্যন্তর তৃপ্তির জন্য এবং সাহিত্যিক মর্য্যাদার জন্য বহু বিদেশী সাহিত্য-রসিক বাঙ্গলা-ভাষার চর্চা করিতেছেন; এবং অনেকগুলি বিদেশী লেখক, বাঙ্গলা-ভাষায় অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। গবেষণা, অনুবাদ এবং রসোত্তীর্ণ সাহিত্য-সর্জনায় যাঁহারা বাঙ্গলা-ভাষায় লিখিয়া নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন চারি জনের উল্লেখ করা এই প্রসঙ্গে অনুচিত হইবে না। যেমন আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Edward C. Dimock এডওআর্ড সী. ডিমক, রুষদেশের মস্কৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী Yevgeniya Bikova য়েভ্‌গেনিয়া বিকোভা, জাপানের টৌকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী Kazuko Yamada কাজুকো য়ামাদা, টৌকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Tsuyoshi Nara ৎসুয়োশী নারা, এবং আরও কয়েকজন, বাঙ্গলা ভাষায় প্রাবীণ্য অর্জন করিয়া, যেন বঙ্গভাষী লেখকের-ই সম্মান পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন।

কত দিক্ দিয়া বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা সংস্কৃতির সেবা করিবার আছে। একটি ছোট বিষয়, কিছুকাল হইল যেটি আমায় নাড়া দিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমি কলিকাতায় মানুষ। পল্লীর সঙ্গে আট নয় বৎসর পর্য্যন্ত আমার কোনও পরিচয় ছিল না।

অবশ্য হাওড়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে আমার মামার বাড়ী, শিবপুর তখন অতি দ্রুত হাওড়ার শহরতলীতে পরিণত হইতেছে, যদিও সে-সময়ে সেখানে গোলপাতার ঘর, গাছপালা, নারিকেল-বাগান, ডোবা, পুষ্করিণী, দীঘী, রাত্রে শিয়াল-ডাকা প্রচুর ছিল। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পরে হুগলী জেলার অধীন, জনাইয়ের সন্নিকটের গরলগাছা গ্রামেই পল্লী-গ্রামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। অবশ্য "অজ-পাড়া-গাঁ" না হইলেও, ভরা ধানক্ষেতের সর-সর ধ্বনি, শীতের ভোরে খেজুর রসের মতই যেখানে সহজ লভ্য ছিল—বাগান-ভরা আমের গাছ, আমের বোলের গন্ধ—এ সব লইয়া সত্যকার পল্লীগ্রাম। আমার ভগিনীপতির বাড়ীর প্রজারা—জোয়ান, বুড়া চাষীরাও দেখা করিতে আসিত। এক বার বর্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে। এক বুড়া চাষী আসিয়া আমার ভগিনীপতির দাদাকে বলিতেছে শুনিলাম—এই ভাবের কথা—"ভূমি হলেন লক্ষ্মী —ভূমি-লক্ষ্মী জলের জন্য হা-পিত্যেশ ক'রছেন, শেষে নারায়ণ সদয় হলেন। এই তো কাল সারা রাত ধ'রে আকাশ থেকে ঢেলে জল দিলেন। এইবার বেটির লজ্জা ভাঙ্‌ল। ঝেঁকে আর দু' একটা বর্ষা হ'ক্, তবে তো বেটি ধান দেবে, জীবকে অন্ন-দান ক'রবে।" —কথাগুলো বেশ লাগিয়াছিল। এ-তো সেই আদিম কথা—দ্যাবা-পৃথিবীর মিলনে পতিত বৃষ্টির জলে শস্যের উদ্ভব। এই মৌলিক ভাবটি আমাদের অজ্ঞ চাষীদের মধ্যেও তো বাঁচিয়া আছে। ইহার বহু দিন পরে, মাত্র কয় মাস পূর্বে, শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্যের এই কবিতাটি তাঁহার একখানি কবিতার বইয়ে বাহির হইয়াছে দেখিলাম —দেখিয়া পুলকিত হইলাম—জগদীশবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া একথা জানাইয়া দিলাম—

বঙ্গোপসাগর থেকে
গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে
বীর্য্যবান্ আকাশের যারা নেমে এল'।

* *

আকাশ ও বসুধার প্রথম সঙ্গম।
মাটির সোঁদাল গন্ধে বাতাস মাতাল হ'ল যেন।

"পর দিন ভোরে
বিজ্ঞ চাষী কৃষ্ণনগরের
আ'ল পথে পা চালিয়ে বলে—"
"মেয়ের আমার
সবে তো ভেঙেছে লজ্জা।
আরো কটি বর্ষণের পরে
হাল চালাবার কাজে তৈরি হবে ফসলের জমি।"

বাঙ্গালীর মনের মধ্যে এখনও যে দেব-লীলার রমন্যাস ঝিলিক দিতেছে, এখনও তাহাকে আদিম কবি-সুলভ মনোভাব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আকুল করে, সে-সব কথা একটু খুঁজিয়া দেখিলেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামীণ জনের ভাষায় এখনও পাওয়া যাইবে। সেজন্য চাই আমাদের চিন্তা করিবার মন, চাই দেখিবার চোখ ও শুনিবার কান, এবং চাই দেখাইবার ও শুনাইবার শক্তি। সহানুভূতি, ভালবাসা এই শক্তির আধার।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই কয় বৎসর ধরিয়া তাহার যথা-শক্তি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া যাইতেছে। পরিষৎ পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় Dias দিয়াস্ মহোদয়ের আনুকূল্য ও সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে অসীম ধন্যবাদ। পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও, পারিবারিক ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও, এবং কঠিন অসুস্থতার মধ্যেও প্রাণ-পণ করিয়া তাঁহার কর্তব্য করিয়া যাইতেছেন, গুণগ্রাহী-পরিষৎ-সেবকগণ তাহার মূল্য বুঝিবেন। গত দুই বৎসর কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ দ্বারা তিনি পরিষদের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। "ভারত-কোষ" পূরা করা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। এতদ্ভিন্ন, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রমুখ বিদ্বান্‌গণের নির্দেশ লইয়া, বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" মহা-গ্রন্থের সটীক নবম সংস্করণ প্রকাশ করা, তাঁহার আর একটি বড় কাজ—মদনমোহনের রচিত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের জীবনী ও তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কথা বাহির করিয়া এই নবম সংস্করণে প্রকাশ করায়, এই গ্রন্থের মূল্য ও মর্য্যাদা আরও বাড়িয়াছে। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস,

প্রথম পর্ব” এবং “করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবন ও কাব্য”—পরিষদের মাধ্যমে আর দুইটি মূল্যবান পুস্তক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গত দুই বৎসরে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা আশা করিতে পারি, এই ভাবে আগামী বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় আরও কিছু স্থায়ী উপকরণ তিনি দিতে পারিবেন।

দশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা হইতে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের গৌড়-বঙ্গের পাল-রীতির ধাতুময় বিষ্ণুমূর্তি অপহৃত হইয়াছিল। আমাদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার দুই বৎসরের অধিককাল যে অতন্দ্র পরিশ্রম করিয়া সেই অপহৃত অমূল্য বিষ্ণুমূর্তি গত বৎসর সমুদ্রপার হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, সে-কথা স্বর্ণাক্ষরে পরিষদের তথা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

এই বৎসর দিল্লীর সাহিত্য একাডেমির পশ্চিম-বঙ্গ শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও চেষ্টায়, বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি অতি মূল্যবান্ classic বা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল—কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রচিত “চণ্ডীমঙ্গল”। এই মহাগ্রন্থকে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক আকর-গ্রন্থ বলা যায়। এতদিন ইহার কোনও প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হয় নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই অভাব এখন মোচন করিলেন ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন—ইহা তাঁহার সাহিত্যিক যশোমুকুটের মধ্যে এক উজ্জ্বল হীরকখণ্ড রূপে চিরবিদ্যমান থাকিবে। নানা পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থের যথাসম্ভব সত্যকার পাঠ-নির্ণয়, বিভিন্ন ভূমিকা, টীকাটিপ্পনী, শব্দসূচী প্রভৃতির দ্বারা এই পুস্তক তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

এইবার শেষ কথা একটি বলিয়া নিবৃত্ত হইব। আমার বয়স এখন ৮৫ চলিতেছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, গ্রন্থ-নিবন্ধ-রচনা, সভা-সমিতি, দেশাটন, ভাষণ-দান প্রভৃতিতে জীবন কাটাইলাম। এখন দৈহিক ততটা না হইলেও, একটা ভীষণ মানসিক অবসাদ আসিতেছে। কি হইতেছে, আরও কি হইবে, এই চিন্তা প্রায়ই মনের মধ্যে জাগে। যাহা হইবার তাহা হইবেই, মানুষ তাহার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা নহে। আমরা কিছুই জানি না; মনে হয়, এ জীবনে কিছু জানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

এই বিশ্বাস এখন মনে একটা অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত শান্তি আনিয়া দিতেছে। যাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা সবকিছু জানিয়াছেন, সত্য বস্তু পাইয়াছেন, তাঁহাদের অবিশ্বাস করি না, তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। কিন্তু আমি জানি নাই। আমার কাছে শাশ্বত সত্তা আবিষ্কৃত হন নাই। সকলেরই এই গতি, তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি নাস্তিক নই। এক সার সত্য—তৎ সৎ, যাহা আছে—তাহাই সকল অস্তিত্বকে ধরিয়া আছে, তাহার মধ্যে আমিও আছি। "তত্র কো মোহঃ, কঃ শোকঃ —একত্বম্ অনুপশ্যতঃ।" সেই বিরাট্ শান্তি সমক্ষে থাকিলেও, আমি মানুষ, মানুষের অজানা ভবিষ্যৎ আমাকেও পীড়া দেয়। চোখের সামনে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আশা বা আনন্দের কিছু পাইতেছি না। মানুষের ভয়াবহ সংখ্যা-বৃদ্ধিই মানুষকে পশুর অধম করিয়া তুলিতেছে। আমার দেশের মানুষের, সমগ্র জগতের মানুষের সর্বত্রই ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবনতি। স্বার্থ-প্রণোদিত রাজনীতির খেলাতেই সকলে মাতিয়া উঠিয়াছে।

তবু আশা ছাড়িতে পারি না। ভীষণ কাঁটাবনের মধ্যেও দুই একটা মিষ্ট ফলও তো দেখিতে পাইতেছি। সার সত্য, শাশ্বত বস্তু যদি কিছু থাকে—ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক সমস্ত ধর্মের ঊর্ধ্বে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টাও দেখা যাইতেছে।

এটা ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। গত জুন মাসে ইটালির তুরিন-নগরে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃত-চর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল—৯।১০।১১।১২।১৩।১৪ জুন এই ছয় দিন ধরিয়া। UNESCO কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, সেখানে গিয়া, ঐ কয় দিন ধরিয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার এবং এশিয়ার নানা দেশ হইতে ৮১ জন সংস্কৃতের এবং ভারত-ধর্মের ও ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগী উপস্থিত হন। বোধ হয় দশ বারো জন ভারতীয় ছিলেন। মাদ্রাজ হইতে ডক্টর বেঙ্কট রাঘবন্ এবং পুনা হইতে ডক্টর রামচন্দ্র নারায়ণ দণ্ডেকর, আমারই মত নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন।

সেখানে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, কি করিলাম? এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা সে দিন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দিয়াছি, অন্যত্রও

দিবার ইচ্ছা আছে। যাহা দেখিলাম, তাহাতে ইউরোপের শিক্ষিত মণ্ডলে শাশ্বত-বস্তু সম্বন্ধে যে সত্যকার আকূতি, সত্যকার জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দের উপলব্ধি হইয়াছে। ঘনায়মান অন্ধতমিস্রার মধ্যে এ যেন দুই-একটি আলোক-রশ্মি। তথাকথিত অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের আধারে স্থাপিত গতানুগতিক ধর্ম-বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, এক মৌলিক শাশ্বত পন্থার সম্বন্ধে ধারণার দিকে এখন সর্বধর্মের চিন্তাশীল মানুষের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিতেছে। পৌরাণিক-উপাখ্যান-ভিত্তিক, অতি-প্রাকৃতিক কল্পনার আশ্রয়ের উপরে স্থাপিত দেবতা-বাদ এখন অশিক্ষিত মনেরই পরিচায়ক বলিয়া দেখা দিতেছে। ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারা, বেদান্ত, মহাযান বৌদ্ধদর্শন, জৈন চিন্তা, যাহা লোকধর্মের অতীত—এই বিষয়ে প্রচলিত বহু ধর্মাস্থার মূলকে শিথিল করিয়া দিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও অন্য ভারতীয় শাস্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার ঊর্ধ্বে এই বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গী অবস্থিত ; প্রাচীন ভারতের লৌকিক আস্থার অতীত অধ্যাত্ম বিদ্যা, ইদানীন্তন কালে রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর বিচার-শৈলী, অনুভূতি ও উপলব্ধি, বিশ্বকাম্য এই বিচার ও বোধকে স্থাপনা করিতে সাহায্য করিয়াছে। মানুষের জীবনে শ্রেয়োলাভের জন্য, আধুনিক কালে ফরাসী সংস্কৃতবিৎ Louis Renou লুই রনু, এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক Arnold Toynbee আর্নল্ড টয়্‌নবি, তথাকথিত অপৌরুষেয় গ্রন্থের আশ্রয়ে স্থাপিত শেমেটিক ধর্মের স্থলে, ভারত চীন ও সূফী মননের অপরিহার্য্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট অভিমত প্রকট করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক্, প্রাচীন য়িহুদী ও প্রাচীন চীনা—এই কয়টি ভাষাতেই আমরা এখন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক চিন্তা, বিচার ও নিষ্কর্ষের কথা পাই—এই তিনটি ভাষা, এ বিষয়ে উচ্চতম বিচারের প্রধানতম ভাণ্ডার, পরস্পর এই ভাষাগুলি স্বস্বস্থানীয়। বৈদিক ও সংস্কৃত এতদিন ধরিয়া, আধুনিক জগতের ভৌতিক, মানবিক ও এমন কি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ও বিচারের পরিচালক ও নেতা ইউরোপীয় শিক্ষিত জনের নিকট অবজ্ঞাত ও সাধারণতঃ অবহেলিত ছিল। যাঁহাদের নাম কিছু পূর্বে করা হইল, তাঁহাদের বিদ্বত্তা, জিজ্ঞাসা,

জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রচারের ফলে, ইউরোপে সংস্কৃত প্রচারের ফলে, মহাভারত (কলিকাতা, ১৮৩৪-১৮৩৯), রামায়ণ (তুরিন ও পারিস, ১৮৪৩-১৮৫৮), ঋগ্বেদ (অক্সফোর্ড, ১৮৪৭-১৮৭৩) ও অন্যান্য সদ্বুদ্ধির সম্পুট গ্রন্থের মুদ্রণ, প্রকাশ, অনুবাদ ও চর্চার ফলে, এখন সংস্কৃত নিজের মহিমায়, প্রাচীন গ্রীক কাব্য ও দর্শনের পাশে, য়িহুদীদের ভক্ত ও ভাববাদীদের রচনার আধার তাহাদের থোরাহ, নেভীইম, কেথুভীম, জবুর প্রভৃতি রচনার (সংক্ষেপে এক কথায় বা ইংরেজীতে যাহাকে বলে Old Testament অর্থাৎ "প্রাচীন প্রমাণ" মহাগ্রন্থের) পাশে), এবং ঋষি লাউৎসে প্রমুখ চীনা দার্শনিকদের রচনার পাশে, বিশ্বমানবের গভীরতম ও উচ্চতম অপৌরুষেয়-কল্প তত্ত্বগ্রন্থ বা শাস্ত্র-গ্রন্থের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। বিগত ১৯৭৫ সালের জুন মাসে যে দ্বিতীয় International Congress of Sanskrit Studies সংস্কৃত বিদ্যার বিশ্বসম্মেলন সারা জগতের ৭০।৮০ জন সংস্কৃতপ্রেমির দ্বারা অনুষ্ঠিত ছিল—আমার জীবনের অন্তিম ভাগে যে তাহাতে আমি যোগদান করিতে পারিলাম, ইহা জীবনের পরিপূরক এক চরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। এই সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে, ধন্যবাদ দিবার সময়ে অন্য সদস্যগণের সঙ্গে মিলিত ভাবে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম—"এই পঁচাশী বৎসর বয়সে, এই সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ। জীবনের ষাট বৎসরের অধিক কাল সংস্কৃত ও ভারতীয় বাক্‌তত্ত্বের চর্চা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণায় কাটাইয়া গেলাম, জনসাধারণের প্রাকৃতজনোচিত আস্থার ঊর্ধ্বে যে শাশ্বত-বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার সন্ধানের চেষ্টায় বৃদ্ধ বয়স ব্যতীত হইল, অনুভূতির আভাস মাঝে মাঝে ঝলক দিলেও উপলব্ধি হইল না, কিছুই জানিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাতেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছি। এখন এই আকাঙ্ক্ষার টানে, এই আকূতির আহ্বানে, সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ বিশ্বমানবের মধ্যে দেখিতেছি। ইহাতেই জীবন ধন্য ও পূর্ণ হইল। যীশুর ভক্ত সাধু সিমোনের কথায়, অজ্ঞাত বিশ্বনিয়ন্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—যে কথা শিশু যীশুকে দেখিয়া সাধু সিমোন জন্ম সফল হইল বলিয়া তাঁহার দেবতাকে আকুল আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, এবং যাহা যীশুর জীবন-চরিতে খ্রীষ্টান ধর্মের

এক অন্তরতম শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা-মন্ত্র রূপে পঠিত হয়—রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান দেশ ইটালির প্রাচীন ভাষা এবং ধর্মের ভাষা লাতীনকে আশ্রয় করিয়া তাহাই সভায় পাঠ করি—nunc dimittis servum tuum, Domine, in pace "প্রভু, এইবার তুমি তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও।" রসগ্রাহী বহু ইউরোপীয় শ্রোতা ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অনুরূপ ভাবে আজ এখানে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই ত্র্যশীতিতম বর্ষ-গ্রন্থি উৎসবে আমার বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—আমার মাতৃভাষা ও তাহার সাহিত্য এবং তদাশ্রয়ী সংস্কৃতির পীঠস্থান এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সেখানে প্রথম যৌবন হইতেই প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া আমার সংযোগ, সেখানে আমি ৮৫ বৎসর বয়স অবধি যুক্ত থাকিতে পারিয়াছি। এই কারণে আমার জীবন সার্থক, সফল হইয়াছে মনে করি। এবং এখন বিদায়ের সময় আসিতেছে—বিনীত ভাবে আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করি।

বাঙ্গলা-ভাষাকে ভালবাসি বলিয়াই তাহার চর্চায় আগ্রহ। তাহার চর্চাকে মানসিক সাধনার অঙ্গ বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলা-ভাষার উন্নতি হউক, ইহার মর্য্যাদা আরও বাড়ুক, সেই জন্যই, বাঙ্গলার যোগ ও ক্ষেম উভয়ই সুদৃঢ় করিবার আগ্রহ লইয়া, ইংরেজিকে ও সংস্কৃতকে বাঙ্গলার মতনই ভালবাসি। আর কিছু বলিবার নাই—বাঙ্গলা দেশ, বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গালী মনন, বাঙ্গলার সংস্কৃতি জয়যুক্ত হউক; এবং ভারতও চিরস্থায়ী হউক, জয়যুক্ত হউক॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮ শ্রাবণ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ,
২৫ জুলাই ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ॥

বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রভাব অবিসংবাদিত। তাঁহার রচিত সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ পূর্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal, Vol. I গ্রন্থে তাঁহার লিখিত অধ্যায়গুলিতে আমরা তাঁহার মতামত একস্থানে পাই। সম্প্রতি ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি History of Ancient Bengal সংজ্ঞক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পালরাজগণের কালক্রম বিষয়ক অংশে তাঁহাকে নূতন আবিষ্কারের ভিত্তিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের আধুনিক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পরেও একটি মূল্যবান্ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেজন্য ইহাতে প্রকাশিত কালপঞ্জীতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত অপর কতকগুলি বিষয়েও তাঁহার সহিত আমাদের কিছু কিছু মতবিরোধ আছে। তন্মধ্যে দুই একটির সম্পর্কে পূর্বে আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। এই বিষয়গুলি বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সকলেই জানেন যে, বাংলার পালবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের দলিলে কোন অব্দের ব্যবহার করিতেন না; ঐ গুলিতে কেবলমাত্র তাঁহাদের রাজ্যবর্ষের উল্লেখ থাকিত। ইহাতে রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য অনুমান করা সম্ভব হয় এবং প্রত্নলিপিবিদ্যা অনুসারে দলিলের সময় মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। যাহা হউক, নানা কারণে পাল আমলের কোন কোন লেখে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। যেমন সারনাথে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালের সময়কালীন একখানি শিলালেখের তারিখ বিক্রম সংবৎ ১০৮৩ অর্থাৎ ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ।[১] ইহাতে বুঝা যায়, মহীপাল ঐ সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তিনি কবে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উহা হইতে জানা যায় না। এদিক হইতে মদনপালের সময়ের বলগুদর মূর্তিলেখ[২] অত্যন্ত মূল্যবান্। ২৬ বৎসর পূর্বে আমি এই লেখটি মুঙ্গের জেলার একটি গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। এই মূর্তিলেখের তারিখ মদনপালের রাজত্বের ১৮শ বর্ষ এবং ১০৮৩ শকাব্দ (১১ই জ্যৈষ্ঠ)। ইহা হইতে জানা গেল যে, মদনপাল ১১৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং অন্ততঃ ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপ গোবিন্দপালের গয়া শিলালেখের তারিখ বিক্রমসংবৎ ১২৩২ (বিকারী) অর্থাৎ ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ[৩] এবং গোবিন্দপালের ১৪শ রাজ্যবর্ষ (বিনষ্ট রাজ্যবর্ষ)। ইতিপূর্বেই গোবিন্দ-

পালের রাজ্য শত্রুর অধিকৃত হইয়াছিল, যদিও গয়াবাসীরা দলিলের তারিখে তাঁহার রাজ্যবর্ষই উল্লেখ করিতেছিল। তিনি যে তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার কিছু প্রমাণ আছে। সুতরাং গোবিন্দপাল ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি মদনপালের অব্যবহিত পরে পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য মজুমদার মহাশয়ের ধারণা এই যে, ১১৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দপাল রাজ্যভ্রষ্ট হন; অর্থাৎ তিনি মদনপালের সমকালেই চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ধারণা অযৌক্তিক। কারণ একই পাটনা-গয়া অঞ্চলে, মদনপাল এবং গোবিন্দপালের রাজত্বের প্রমাণ আছে। Journal of the Asiatic Society, Vol. XX (1954), pp. 45-46-এ আমি ইহার উল্লেখ করিয়াছিলাম; কিন্তু মজুমদার মহাশয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।[৩ক] আবার লেখমালায় তারিখ ব্যবহারের ভাষা হইতেও মজুমদার মহাশয়ের মত সমর্থিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য এই সময়ের পালরাজগণ সেন-বংশীয় রাজাদিগের বশীভূত মিত্রে পরিণত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

পালরাজগণের রাজ্যকাল সম্পর্কে উল্লিখিত ধরণের ইঙ্গিত ব্যতীত আর যে প্রমাণ আছে উহা তাঁহাদের সমসাময়িক নরপতিগণের তারিখ। রাষ্ট্রকূট বংশীয় নরপতি তৃতীয় গোবিন্দের নেসরিকা তাম্রশাসন[৪] ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকূটরাজ যে-সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন বঙ্গালের রাজা ধর্ম (ধর্মপাল)। প্রকৃত পক্ষে তৃতীয় গোবিন্দের সহিত ধর্মপালের সংঘর্ষ ৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষের সঞ্জান তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, গোবিন্দ যখন উত্তর ভারতে দিগ্বিজয় করিতেছিলেন, তখন ধর্ম অর্থাৎ ধর্মপাল তাঁহার নিকট অবনতি স্বীকার করেন।[৫] এই দিগ্বিজয়ের তারিখ ৮০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।[৬] সুতরাং ধর্মপাল ৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 'অনেক পূর্বে'ই বলা উচিত; কারণ ইতিপূর্বে ধর্ম-পাল কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্থলে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তৎসম্পর্কে রাজস্থানের গুর্জর-প্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এদিকে আবার তিব্বতরাজ Mu-tig Btsan (৮০৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন।[৭]

তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে পশ্চিমদেশীয় নরপতি কর্ণ্য (কর্ণ) পালবংশীয় নয়পালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মগধদেশ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় দুই নরপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।[৮] সিয়ান শিলালেখে নয়পালের এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চেদিরাজ কর্ণ বলা হইয়াছে, যাঁহার রাজত্বকাল ১০৪১-৭১ খ্রীষ্টাব্দ।[৯] দীপঙ্কর ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিব্বত চলিয়া যান।[১০] সুতরাং কর্ণের রাজত্বের গোড়ায়

দিকেই তিনি পাল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তখন রাজা নয়পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে (১৯ টীকা) দেখা যায়, তৃতীয় বিগ্রহপাল ডাহলপতি কর্ণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। পাল বংশীয় রামপালের ভাগিনেয়ী কুমরদেবী (কুমারদেবী) গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী ছিলেন ৯ক গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল ১১১৪ ৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। রামপাল তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

পালরাজগণের লেখাবলী সম্পর্কে একটি কথা প্রথমেই বলা উচিত। তাম্রশাসন-গুলিতে শাসনদাতা নরপতির বংশলতা দেওয়া হইত। তাহাতে রাজার পরিচয় বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু মূর্তিলেখে রাজার বংশ পরিচয় না থাকায় এক নামের একাধিক নরপতির পরিচয় ব্যাপারে সন্দেহ জন্মিতে পারে। কারণ এক নামের দুই জন নরপতির মধ্যে ব্যবধান কম থাকিলে, প্রত্নলিপিবিদ্যা হইতে সকল সময় আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। মূর্তিলেখ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পুস্তকের পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পুষ্পিকা সম্পর্কেও ঐ কথা প্রযোজ্য।

উপরে উল্লিখিত প্রমাণাদি এবং পাল রাজগণের রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার ভিত্তিতে মজুমদার মহাশয় পালবংশের কালপঞ্জী উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১০] ঐ কালপঞ্জী অনেকটা নিম্নরূপ :—

	রাজা	সর্বাধিক রাজ্য বর্ষ	রাজত্বকাল	
১।	প্রথম গোপাল (আদি রাজা)	অজ্ঞাত	৭৫০-৭০	খ্রীষ্টাব্দ
২।	ধর্মপাল (গোপালের পুত্র)	৩২	৭৭০ ৮১০	,,
৩।	দেবপাল (ধর্মপালের পুত্র)	৩৯ বা ৩৫	৮১০-৫০	,,
৪।	প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল (দেবপালের খুল্লতাত-পুত্র জয়পালের পুত্র)	৩	৮৫০-৫৪	,,
৫।	নারায়ণপাল (প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপালের পুত্র)	৫৪	৮৫৪-৯০৮	,,
৬।	রাজ্যপাল (নারায়ণপালের পুত্র)	৩২	৯০৮-৪০	,,
৭।	দ্বিতীয় গোপাল (রাজ্যপালের পুত্র)	১৭	৯৪০-৬০	,,
৮।	দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (দ্বিতীয় গোপালের পুত্র)	২৬ (?)	৯৬০ ৮৮	,,
৯।	প্রথম মহীপাল (দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র)	৪৮	৯৮৮-১০৩৮	

১০।	নয়পাল (প্রথম মহীপালের পুত্র)	১৫	১০৩৮-৫৪	খ্রীষ্টাব্দ
১১।	তৃতীয় বিগ্রহপাল (নয়পালের পুত্র)	১৭	১০৫৪-৭২	,,
১২।	দ্বিতীয় মহীপাল (তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১০৭২-৭৫	,,
১৩।	দ্বিতীয় শূরপাল (ঐ)	অজ্ঞাত	১০৭৫-৭৭	,,
১৪।	রামপাল (ঐ)	৫৩	১০৭৭-১১৩০	,,
১৫।	কুমারপাল (রামপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১১৩০-৪০	,,
১৬।	তৃতীয় গোপাল (কুমারপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১১৪০-৪৪	,,
১৭।	মদনপাল (রামপালের পুত্র)	১৮	১১৪৪-৬১	,,
১৮।	গোবিন্দপাল	৪	১১৫৮-৬২	,,

উপরে আমরা বলিয়াছি যে, একটি নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় উল্লিখিত কালপঞ্জীতে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্তন মজুমদার মহাশয় যাঁহাকে দেবপালের খুল্লতাতপুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহার সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ ৩ এবং রাজত্বকাল ৮৫০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন, তৎসম্পর্কিত। নারায়ণপাল এবং পরবর্তী পাল রাজগণের তাম্রশাসনে নারায়ণের পিতা জয়পালপুত্র প্রথম বিগ্রহপালের উল্লেখ দেখা যায়।[১১] আবার বাদাল প্রশস্তিতে দেবপাল এবং নারায়ণপালের মধ্যে শূরপাল নামক রাজার উল্লেখ আছে।[১২] তাই অনুমান করা হইয়াছিল যে, নারায়ণের পিতা বিগ্রহপাল এবং এই শূরপাল অভিন্ন, এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে Bulletin of the *Museums and Archaeology in U.P. (Nos. 5-6)* সংজ্ঞক পত্রিকার ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় মীর্জাপুর জেলায় আবিষ্কৃত শূরপালের তৃতীয় রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনের কথা বলা হইয়াছে।[১৩] ইহা হইতে জানা যায় যে, রাজা শূরপাল দেবপালের মহিষী দুর্লভ-রাজপুত্রী মহাদেবী ভবদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি জয়পালপুত্র বিগ্রহপাল হইতে পৃথক ব্যক্তি। অতএব দেবপাল এবং নারায়ণপালের মধ্যে এখন আমাদিগকে একজনের স্থলে দুইজন নরপতিকে স্থান দিতে হইবে। এই দুই জনের মধ্যে বিগ্রহ-পালের কোন লেখ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু শূরপালের রাজত্বকালীন কতিপয় মূর্তিলেখ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে রাজৌনাগ্রামের মূর্তিলেখটির তারিখ শূরপালের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ। সুতরাং তাঁহার সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ ৩ নহে এবং তাঁহার চারি বর্ষাধিক রাজ্যকাল ৮৫০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে ফেলাতে ত্রুটি ঘটিয়াছে। শূরপালের রাজৌনা মূর্তিলেখটির বিষয় মজুমদার মহাশয়ের একেবারে অজ্ঞাত ছিলনা; কারণ গ্রন্থের উপক্রমণিকাংশে তিনি

ঐ লেখ সম্পর্কে Indian Historical Quarterly, Vol. XXIX (1953) p. 301-এ প্রকাশিত আমার একটি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪]

মজুমদার মহাশয়ের কালপঞ্জী সম্বন্ধে আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল সম্পর্কিত। তিনি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব ৯৬০-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ২৮ বৎসর এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল ১০৫৪-৭২ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৮ বৎসর বলিয়াছেন। আমরা ইহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। কারণ দ্বিতীয় বিগ্রহপালের কোন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁহার রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। পক্ষান্তরে তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসন[১৫] তদীয় রাজত্বের ১৭শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রমাণ আছে। তাই আমাদের বিবেচনায় যে বিগ্রহপালের ২৪শ বৎসরে নৌলাগড়ের মূর্তিলেখ উৎকীর্ণ এবং ২৬শ বর্ষে পঞ্চরক্ষার পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত হইয়াছিল, তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল।[১৬] এই দুই নরপতির রাজ্যকালের মধ্যে মাত্র ৬৫ বৎসরের ব্যবধান; তাই এক্ষেত্রে প্রত্নলিপিবিদ্যা আমাদিগকে ততটা সাহায্য করেনা। কিন্তু যাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই, তাঁহার রাজ্যকালের দৈর্ঘ্য ২৮ বৎসর এবং যিনি অন্ততঃপক্ষে তদীয় ১৭শ রাজ্যবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানি তাঁহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর স্থির করা নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র সংশয় নাই।

আমাদের তৃতীয় বক্তব্য রাজা গোপালের রাজীবপুর মূর্তিলেখ সম্পর্কিত।[১৭] ইহার তারিখ ১৪শ রাজ্যবর্ষ। প্রত্নলিপিবিদ্যা অনুসারে রাজীবপুরের মূর্তিলেখ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। সুতরাং লেখটি সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই রাজা গোপালকে তৃতীয় গোপাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই গোপাল কিছুতেই দ্বিতীয় গোপাল নহেন; কারণ তিনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দশম শতাব্দীর বাংলাদেশ-প্রচলিত অক্ষর দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষর হইতে অনেকটা পৃথক্। যেমন ধরুন, শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন (১০ম শতাব্দী) এবং বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালেখ (১২শ শতাব্দী)—এই দুইটি লেখের পার্থক্য ছাপ দেখিলেই চোখে পড়ে।[১৮] সুতরাং তৃতীয় গোপালের রাজ্যবর্ষ অজ্ঞাত এবং তিনি ১১৪০-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, মজুমদার মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক মনে করি।

চতুর্থ বক্তব্যটি এই যে, পলপাল নামক জনৈক নরপতির একটি মূর্তিলেখ অনুসারে তদীয় ৩৫শ রাজ্যবর্ষে ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পা নগরীতে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্নলিপিবিদ্যা অনুসারে তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে History of Bengal Vol. I (1943) গ্রন্থে মজুমদার মহাশয় একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বর্তমান গ্রন্থে (১৯৭১) ঐ কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।

কিন্তু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ লেখটি প্রকাশ করিতে গিয়া আমি মজুমদার মহাশয়ের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছিলাম।[১৯] দুঃখের বিষয়, তাঁহার বর্তমান গ্রন্থে আমার প্রবন্ধের কোন উল্লেখ নাই এবং আমার যুক্তি খণ্ডনেরও প্রয়াস নাই। এই ধরণের ত্রুটি History of Bengal, Vol. I-এ তেমন দেখা যায় না ; কারণ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস-বিষয়ক কোন রচনাই উহাতে অবিবেচিত দেখি নাই।

যাহা হউক, উপরিলিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা পাল বংশীয় রাজগণের যে কালপঞ্জী নির্ধারণ করিতে চাই, তাহা নিম্নরূপ :—

রাজা	সর্বাধিক রাজ্যবর্ষ	রাজত্বকাল	
১। গোপাল (আদি রাজা)	অজ্ঞাত	৭৫০-৭৫	খ্রীষ্টাব্দ
২। ধর্মপাল (গোপালের পুত্র)	৩২	৭৭৫-৮১২	,,
৩। দেবপাল (ধর্মপালের পুত্র)	৩৫	৮১২-৫০	,,
৪। প্রথম শূরপাল (দেবপালের পুত্র)	৫	৮৫০-৫৮	,,
৫। প্রথম বিগ্রহপাল (দেবপালের খুল্লতাত-পুত্র জয়পালের পুত্র)	অজ্ঞাত	৮৫৮-৬০	,,
৬। নারায়ণপাল (প্রথম বিগ্রহ-পালের পুত্র)	৫৪	৮৬০-৯১৭	,,
৭। রাজ্যপাল (নারায়ণপালের পুত্র)	৩২	৯১৭-৫২	,,
৮। দ্বিতীয় গোপাল (রাজ্যপালের পুত্র)	১৭	৯৫২-৭২	,,
৯। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (দ্বিতীয় গোপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	৯৭২-৭৭	,,
১০। প্রথম মহীপাল (দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র)	৪৮, ১০৮৩ বিক্রমাব্দ	৯৭৭--১০২৭	,,
১১। নয়পাল (প্রথম মহীপালের পুত্র)	১৫	১০২৭-৪৩	,,
১২। তৃতীয় বিগ্রহপাল (নয়পালের পুত্র)	২৬	১০৪৩-৭০	,,
১৩। দ্বিতীয় মহীপাল (তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১০৭০-৭১	,,
১৪। দ্বিতীয় শূরপাল বা শুরপাল (ঐ)	অজ্ঞাত	১০৭১-৭২	,,
১৫। রামপাল (ঐ)	৫৩	১০৭২-১১২৬	,,

১৬।	কুমারপাল (রামপালের পুত্র)	অজ্ঞাত	১১২৬-২৮
১৭।	তৃতীয় গোপাল (কুমারপালের পুত্র)	১৪	১১২৮-৪৩
১৮।	মদনপাল (রামপালের পুত্র)	১৮ (১০৮৩ শকাব্দ)	১১৪৩-৬১
১৯।	গোবিন্দপাল (মদনপালের পুত্র ?)	৪	১১৬১-৬৫
২০।	পলপাল (গোবিন্দপালের পুত্র ?)	৩৫	১১৬৫-৯৯

॥ পাদটীকা

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ১০৮।

২। Epigraphia Indica, Vol. XXVIII, pp. 142, 145.

৩। ঐ, Vol. XXXV (1963-1964), pp. 234-35, 237-38. মজুমদার মহাশয়ের আধুনিক গ্রন্থে আমার এই প্রবন্ধটির কোন উল্লেখ লক্ষ্য করি নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের তর্কবিতর্কের জন্য Journal of the Asiatic Society, Vol. XVII, 1951, pp. 27ff.; Vol. XVIII, 1952, pp. 117ff.; Vol. XX, 1954, pp. 43ff. দ্রষ্টব্য। মজুমদার মহাশয় তাঁহার সাম্প্রতিক গ্রন্থে এই বিতর্কেরও কোন উল্লেখ করেন নাই।

৩ক। আমি বলিয়াছিলাম, "It has to be remembered that a manuscript is known to have been copied at Nalanda (Patna District) during the fourth year of Govindapala's reign (cf. Banerji, *Vangalar Itihasa*, Vol. I, 2nd ed., pp. 347-48; *The Palas of Bengal*, p. 112). This manuscript and the Gaya inscription suggest that the Patna and Gaya Districts formed parts of the dominions of Govindapala. The inscriptions of Madanapala have been discovered at Bihar-sharif in the Patna and Jaynagar and Valgudar in the Monghyr District (cf. *History of Bengal*, Vol. I, p. 175). Dr. Majumdar now exclusively associates Madanapala with the Monghyr District and Govindapala with the Gaya District without taking notice of the fact that both the kings are known to have held sway over the Patna District. This fact, ignored by him, may be regarded as an evidence against the theory that the two kings ruled contemporaneously over different regions."

৪। ঐ, Vol. XXXIV, p. 123.
৫। Epigraphia Indica, Vol. XVIII, p. 245, verse 23.
৬। ঐ, Vol. XXXIII, p. 330 and note 5.
৭। Majumdar, History of Ancient Bengal, p. 118 দ্রষ্টব্য।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৮।
৯। Journal of Ancient Indian History, Vol. VI, p. 40.
৯ক। Ep. Ind., Vol. IX, pp, 319 ff.
১০। History of Ancient Bengal, pp. 161-62.
১১। গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮, শ্লোক ৪-৭, পৃষ্ঠা ৯৩ শ্লোক ৩-৫, ইত্যাদি।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা ৭৪, শ্লোক ১৫।
১৩। Monthly Bulletin of the Asiatic Society, Vol. VI, No. 10, November, 1971, pp. 4-5.
১৪। Journal of Ancient Indian History, Vol. VII, pp. 102-08.
১৫। Epigraphia Indica, Vol. XXIX, pp. 48ff.
১৬। Journal of the Bihar Research Society, Vol. XXXVII, Part III, pp. 1 ff.
১৭। Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1936-37, pp. 130-33; Indian Historical Quarterly, Vol. XVII (1941), pp. 217 ff.
১৮। N. G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, Vol. III, Plates facing pp. 4 and 44.
১৯। Journal of the Bihar Research Society, Vol. XLI, Part 2, June, 1955, pp. 143 ff.

"বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার "বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কালপঞ্জী" নামক প্রবন্ধে আমার কয়েকটি মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমার মত যে "নিতান্ত অযৌক্তিক" সে বিষয়ে তাঁহার "কিছুমাত্র সন্দেহ নাই", এবং আমার "সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভ্রমাত্মক"।

প্রথম মন্তব্যের কারণ তাঁহার কথাতেই বলি. "দ্বিতীয় বিগ্রহপালের কোন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁহার রাজত্বের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসন তদীয় রাজত্বের ১৭শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বের প্রমাণ আছে। তাই আমাদের বিবেচনায় যে বিগ্রহপালের ২৪শ বৎসরে পৌলাগড়ের মূর্তিলেখ উৎকীর্ণ এবং ২৬শ বর্ষে পঞ্চরক্ষার পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত হইয়াছিল, তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল।...যাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই তাঁহার রাজ্যকালের দৈর্ঘ্য ২৮ বৎসর এবং যিনি ১৭শ রাজ্যবর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানি তাঁহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর স্থির করা নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই।"

প্রাচীন পালযুগের তাম্রশাসন সংখ্যায় খুব বেশী নহে। * মুঙ্গের লিপি আবিষ্কৃত না হইলে তাঁহার সুদীর্ঘকাল (৩৯ অথবা ৩৫ বৎসর) রাজত্বের কথা আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না—এরূপ অবস্থায় 'প্রমাণের অভাব' খুব 'জোর প্রমাণ' নহে, অর্থাৎ নেতিবাচক প্রমাণ হইতে কোন 'ইতি'বাচক সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার যে মন্তব্য তিনি নিঃসংশয়ে "নিতান্ত অযৌক্তিক" বলিয়া মনে করেন—আলোচ্য প্রবন্ধে দীনেশবাবু নিজেই—রাজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোপালের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনুরূপ ভুলই করিয়াছেন। রাজ্যপালের পুত্র দ্বিতীয় গোপাল অন্ততঃ ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে তৃতীয় গোপালের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানা নাই, চতুর্দশ রাজ্য সংবৎসরে উৎকীর্ণ রাজা গোপালের এক খানি লিপি তিনি সেই তৃতীয় গোপালের লিপি বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহার স্বপক্ষে প্রত্নলিপিবিদ্যার দোহাই দিয়াছেন। তাঁহার কালপঞ্জী অনুসারে এই দুই রাজার রাজত্বের ব্যবধানকাল মাত্র ১৫৬ বৎসর। যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিগ্রহপালের যথাক্রমে রাজ্যারম্ভ ও রাজ্যশেষের

* দেবপালের

ব্যবধানকাল (১০৭০-৯৭২) ৯৮ বৎসর ; তথাপি তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্নলিপি-বিদ্যা এক্ষেত্রে "আমাদিগকে ততটা সাহায্য করে না"। অথচ মাত্র ১৫৬ বৎসর কালের ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি প্রত্নলিপিবিদ্যার প্রমাণের উপর নিঃসংশয়ে নির্ভর করিয়াছেন। আমার মতে অন্ততঃ দুই বা তিন শতাব্দীর ব্যবধান না থাকিলে কেবলমাত্র লিপিবিদ্যার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তারিখ সম্বন্ধে কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।*

কিন্তু সে যাহাই হউক তাঁহার মন্তব্য—যে রাজার সম্বন্ধে কিছুই জানা না তাঁহার অপেক্ষা যাঁহার রাজ্যকাল সম্বন্ধে কিছু জানা আছে দীর্ঘ রাজত্বকাল তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—ইহা যে সাধারণ ভাবে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন নহে, দীনেশবাবু প্রকারান্তরে তাঁহার নিজের এই মত নিজেই খণ্ডন করিয়াছেন।

দীনেশবাবুর কালপঞ্জী সম্বন্ধে সর্বপ্রধান আপত্তি এই যে, এই পঞ্জী অনুসারে পাল উপাধিধারী রাজগণ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত (১১৯৯ খ্রী.) অব্যাহত ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মদনপালের (১১৪৩-৬১) পরবর্তী রাজা গোবিন্দপাল ও তাঁহার পুত্র (?) পলপাল ১১৬১ হইতে ১১৯৯ খ্রী. পর্যন্ত কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন? দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন-বংশীয় রাজা বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেবল সমগ্র বঙ্গদেশ নহে, দক্ষিণ-বিহার যে বল্লালসেনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে উৎকীর্ণ সানোখর লিপি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি যে মিথিলা (উত্তর-বিহার) জয় করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে এবং মিথিলায় প্রচলিত ল সং অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের নামযুক্ত অব্দ (লক্ষ্মণ সংবৎ) ইহার সমর্থন করে। যে গয়া অঞ্চলে গোবিন্দপাল রাজত্ব করিতেন সেখানেও লক্ষ্মণসেনস্যাতীত রাজ্য-সংবৎসর' যুক্ত উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন এই যে—দীনেশবাবুর মতে যে গোবিন্দপাল ও তাঁহার পুত্র পলপাল একাদিক্রমে ১১৬১ হইতে ১১৯৯ খ্রী. পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের রাজ্য কোথায় ছিল? এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কয়েকখানি পুঁথিতে "শ্রীগোবিন্দপালদেব গতরাজ্যে চতুর্দশ সংবৎসরে শ্রীমদ্‌গোবিন্দ-পালস্যাতীতসংবৎসরে ১৮ এবং শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সংবৎসরে" ইত্যাদি কালবাচক শব্দের অর্থ কি? দীনেশবাবুর মতে গোবিন্দপালের মৃত্যুর পরই তো পলপাল রাজ্য লাভ করেন এবং ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন; সুতরাং গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজ্য হইতে কালনির্ণয়ের হেতু বা তাৎপর্য কি?

*ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ...রামপালের শিলালিপি অপেক্ষা ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন...তবে ইহা স্থির যে হরিবর্মদেব ভোজবর্মার পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন নাই।...অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ও নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে হরিবর্মা ভোজবর্মার পরবর্তী।" (বাঙ্গালার ইতিহাস: প্রথম ভাগ, ৩য় সংস্করণ পৃ. ৩১৩-১৪)।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দীনেশবাবু নিঃসংকোচে রাজা শূরপালকে গোবিন্দ-পালের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ আমার জানা নাই। পলপাল নামক কোন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি (History of Ancient Bengal, pp. 160, 195 f.n. 264)।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার তাঁহার প্রবন্ধে (১৯ পৃষ্ঠায়) তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল সম্বন্ধে আমার মত ভ্রান্ত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত "পঞ্চরক্ষা" পুঁথিখানি বিগ্রহপালের ২৬ রাজ্য-সম্বৎসরে লিখিত হইয়াছিল। আমার মতে ইনি দ্বিতীয় বিগ্রহপাল; দীনেশবাবুর মতে ইনি তৃতীয় বিগ্রহপাল। আমার মতের সমর্থনে একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিতেছি।

বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের নবম রাজ্য-সংবৎসরে দত্ত তাম্রশাসনখানি মহীধর নামক শিল্পী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহীপাল আরও অন্ততঃ ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহীপালের পুত্র নয়পাল অন্ততঃ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। নয়-পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের দ্বাদশ রাজ্য-সম্বৎসরে উৎকীর্ণ আমগাছি তাম্রশাসন শিল্পী মহীধরের পুত্র শশিদেব উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমগাছি লিপির সময় তৃতীয় বিগ্রহপালের বয়স অন্ততঃ ৬০। ৭০ বৎসর হইয়াছিল। অতএব যে বিগ্রহপাল অন্ততঃ ২৬ বৎসর (অর্থাৎ আরও ১৪ বৎসর) রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাকে তৃতীয় বিগ্রহপালের অপেক্ষা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল মনে করাই অধিকতর স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পিতা পুত্রের লিখিত অক্ষরের ব্যবধান দ্বারা কাল নির্ণয় চেষ্টাও অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অবশ্য তৃতীয় বিগ্রহপাল ৯০ কিংবা ১০০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন ইহা অসম্ভব নহে—কিন্তু যেখানে নিশ্চিত কিছু জানা নাই সেখানে সম্ভব-অসম্ভব অপেক্ষা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ইহা দ্বারাই সত্য অনুমান করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের রচিত 'বাংলার পালবংশীয় রাজগণের কুলপঞ্জী' শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত হওয়ার পর অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে উক্ত প্রবন্ধের একটি মুদ্রিত কপি পাঠাইয়া এবিষয়ে তাঁহার অভিমত জানাইতে অনুরোধ করিলে ডক্টর মজুমদার তাঁহার অভিমত ক্ষুদ্র নিবন্ধের আকারে প্রেরণ করেন। দুইটি নিবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। এ বিষয়ে প্রাচীন বঙ্গদেশের ইতিহাসবেত্তাগণের গবেষণামূলক আলোচনা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। —পরিষৎ সম্পাদক।

ডেভিড্ হেয়ার
দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসব (১৯৭৬)
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যখন ছোট্ট ছিলাম, কৈশোরেও পৌছাইনি, তখন ঠাকুরদা ছিলেন আমার মহান্ গুরু এবং প্রেরণাস্থল। ১৯০৬-এ ৮৯ বছর বয়সে তাঁর লোকান্তর ঘটে। তিনি কিছুটা পারসী জানতেন—পারসীই তিনি প্রথমে পড়েছিলেন, পরে ইংরেজী আর বাংলা; পরিণত বয়সে কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিখেছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে যে সকল পুরোনো যুগের লোক ইংরেজী শিখে কতকটা আধুনিক মনোভাবাপন্ন হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। খুব সকালে, আমরা বিছানা ছাড়বার আগেই, তিনি রোজ চাণক্যশ্লোক-জাতীয় নীতি-গ্রন্থ থেকে কিছু শ্লোক এবং সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের কোন কোন অংশ আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন। সংস্কৃত আর বাংলা শ্লোক ও ছড়ার, অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল তাঁর। পারসী বয়েৎও তিনি কিছু কিছু জানতেন। সেগুলো আমাদের স্মরণে গাঁথা হয়ে আছে; এই পঁচাশী বছর বয়সেও তার কিছুকিছু আবৃত্তি করতে পারি।

একটি সংস্কৃত শ্লোক তাঁর কাছে শিখেছিলাম :

জোন্সঃ কেরী তথা হারঃ
প্রিন্সেপশ্চ কানিহমঃ
পঞ্চ গৌরান্ স্মরেন্ নিত্যং
জ্ঞানাঞ্জন-প্রদায়কান্।

নানাভাবে ইউরোপীয় শিক্ষার আলো এনে যাঁরা বাঙালীর মনের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, সাধারণ সংস্কৃত-শিক্ষার্থী এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সব শ্লোকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উক্ত পাঁচজন ইউরোপীয়ই ইংরেজ—স্যর উইলিয়ম জোন্স, রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী, মিঃ ডেভিড্ হেয়ার, ডক্টর জেম্‌স্ প্রিন্সেপ এবং স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই 'মহাজন'।

স্যর উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৬ খ্রীঃ ভারত ও ইউরোপ উভয়ের পক্ষেই একটি মহৎ আবিষ্কার করেন যে, যথার্থতঃ সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় সভ্যতার মূল উৎস, এবং পৃথিবীর মধ্যে, বিশেষতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জগতে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।

রেঃ উইলিয়ম কেরী ছিলেন ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের পাদ্‌রী। দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অনুবাদ করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রধান প্রধান আধুনিক ভারতীয় ভাষার ব্যাপক ও

গভীর অনুশীলন আরম্ভ করেন। এইভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় নব্য সাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেন।

ডঃ জেম্‌স্ প্রিন্সেপ ১৮৩৮ খ্রীঃ প্রথম প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি পাঠ ক'রে অশোক অনুশাসনের অর্থ উদ্ধার এবং তার অনুবাদ করেন। তার পূর্বে বহু শতাব্দী ভারতের কাছে এই প্রত্নজ্ঞান-ভাণ্ডার রুদ্ধ ছিল। তাঁরই কল্যাণে আমরা অশোক প্রমুখ মহাপুরুষদের আবিষ্কার করতে পেরেছি—এঁদের আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, এবং মানুষের জন্য তাঁরা যা ক'রে গিয়েছেন, তার ফলে ভারত অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছে বলে আজ জাতি হিসেবে গর্ব অনুভব করি।

সর্বশেষ—স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম—তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, এবং শিলালিপি উদ্ধার, পাঠ ও অর্থ নির্ণয় দ্বারা একালের ভারতবাসীর কাছে জীবন ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বপুরুষের কীর্তিকলাপের গৌরবময় ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন।

ব্রিটেন থেকে আরও যে সকল মহৎ কৃতী ব্যক্তি এসেছিলেন,—মোহরের গাছে নাড়া দিয়ে, পকেট ভর্তি করে দেশে গিয়ে নবাবের মত আয়েসে দিন কাটাতে এবং অনায়াস-লব্ধ ভারতীয় অর্থ দু'হাতে ওড়াবার জন্য নয়,—যাঁরা চেয়েছিলেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পদে নিজেদের মন ও আত্মাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে এবং ভারতবাসীর সেবা করতে,—তাঁদের সম্বন্ধেও অনুরূপ কিছু সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত ছিল।

সে-সময়ে ভারতবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান—সংহতির অভাব এবং অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদের প্রয়োজন ও হিতসাধনে অসমর্থ ছিল; আর সেই কাজ নিঃস্বার্থভাবে করে-ছিলেন কতিপয় সুপণ্ডিত ইংরেজ এবং ইউরোপীয় ভারতপ্রেমিক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন: ডঃ ফ্রীড্‌রিখ্ ম্যাক্সমূলর—বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী; ডঃ এডওঅর্ড বাইল্‌স্ কাওয়েল—সংস্কৃতজ্ঞ; রেঃ জেম্‌স্ লঙ—খ্রীষ্টীয় মিশনারি; হোরেস হেম্যান উইলসন—সংস্কৃত-বিদ্; লর্ড রিপন—ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল—যিনি ভারতবাসীকে নাগরিক অধিকার দিতে চেয়েছিলেন; এবং কয়েকজন রাজনীতিবিদ্ ও রাজনৈতিক কর্মী—যেমন, উইলিয়ম ডিগ্‌বি ও অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (হিউম ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতীয়দের মুক্তির ও অধিকার লাভের প্রকৃত পন্থা নির্দেশ করেছিলেন)। তা ছাড়াও ছিলেন রেভারেণ্ড সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ—যিনি 'দীনবন্ধু' আখ্যায়ই বেশী পরিচিত এবং ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী বিবেকা-নন্দের শিষ্যা, যিনি ভারতীয়দের মনে তাঁদের পুরাকালের দার্শনিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ ও রিক্থ সম্বন্ধে অনুরাগ ও চেতনা পুনঃসঞ্চার করেছিলেন।

মোক্ষমূলর-কাবেলৌ,
লঙ্কশ্চ বিল্‌সন স্তথা।
রিপনো ডিগ্‌বি-হ্যুমৌ চ
দীনবন্ধুর্ নিবেদিতা॥

পুণ্যশ্লোকা নবৈ তে বৈ
ভারত-জন-সেবকাঃ ॥

এমনি কোন কোন সংস্কৃত শ্লোকে এই সকল পরম বন্ধু ভারত-প্রেমিকদের স্মৃতির প্রতি বঙ্গবাসী ভারতীয়দের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আর, এই ভারতপ্রেমীদের মধ্যে ডেভিড্ হেয়ারের জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার মন্দিরে একটি বিশিষ্ট বেদী নির্দিষ্ট আছে।

উপরি-উক্ত 'পঞ্চ' ও 'নব' এবং এঁদের মত আরও অনেক ভারতসেবক আধুনিক শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীর সত্তার পূর্ণ বিকাশে কতদূর সাহায্য করেছিলেন সে কথা যাঁরা বোঝেন, এমন বাঙালীদের মনে ঐ মন্দিরের দ্বার চিরউন্মুক্ত।

ডেভিড্ হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীঃ স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪২ খ্রীঃ কলকাতায় কলেরায় মারা যান। শিক্ষা দীক্ষা বা ধার্মিকতায় তিনি 'বড় মানুষ' ছিলেন না; ধনীও ছিলেন না, যদিও ভাগ্যান্বেষণে তিনি ভারতে এসেছিলেন, তবু যথেচ্ছ 'কল্পতরুর ফল' সংগ্রহ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন ঘড়িওয়ালা; ঘড়ি তৈরি, ঘড়ি বিক্রয়, ঘড়ি-মেরামত ছিল তাঁর পেশা। এ নিতান্তই নগণ্য জীবিকা। কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ ছিল বড়। কলকাতায় তিনি বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে, যখন শহরে ইংরেজ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশী ছিল না, তখন কলকাতার সওদাগরী পাড়ার একটি রাস্তার নাম তাঁর নামেই হয়েছিল। রাস্তাটি 'লালদীঘি' বা পরবর্তীকালের ডালহৌসি স্কোয়ারের পাশে। ঐ হেয়ার স্ট্রীটে মুখ্য ইংরেজী পত্রিকা 'ইংলিশম্যান্'-এর কার্যালয় বহু বৎসর অবস্থিত ছিল। যে-সব পাদ্রি পৌত্তলিকদের উদ্ধারের জন্যে, খ্রীষ্টধর্মের জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে যাদের নরকে পুড়ে মরা ছাড়া গতি নেই, তাদের রক্ষার জন্য আসেন,—হেয়ার তাঁদের মনোভাব নিয়ে ভারতে আসেননি। ধর্মের গোঁড়ামি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এবং জীবন দর্শনেও ছিলেন উদার। সত্যকার শিশু-বৎসল মন নিয়ে তিনি যে-সব ভারতীয় ছেলেকে ভালোবেসেছিলেন, ইংরেজীর মাধ্যমে সুশিক্ষায় তাদের সহায়তা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বেশী উচ্চ লক্ষ্য তাঁর ছিল না। এই ভারতীয় শহরের কেন্দ্রে, সংস্কৃত কলেজের পশ্চিমে কলেজ স্ট্রীটের ও পাশে আর সংস্কৃত কলেজের উত্তরে অনেকটা জমি খালি ছিল। পরে এই জমিতে গোলদীঘি পুকুরটি খোঁড়া হয়; এবং এর নাম হয় কলেজ স্কোয়ার। এই অঞ্চলেই তিনি নিজের সামান্য সঙ্গতি অনুসারে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই এলাকাতেই সেদিন—১৮২৪ খ্রীঃ—গড়ে উঠেছিল একটি প্রধান শিক্ষাসত্র—তার নাম সংস্কৃত কলেজ। আরবী ফারসী শিক্ষার জন্য ওর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান—কলকাতা মাদ্রাসা—স্থাপিত হয়েছিল একই রাস্তায়, অনেকটা দক্ষিণে, আর একটা দীঘির ধারে—ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে—ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারের পাশে। ডেভিড্ হেয়ার যে স্কুল খুলেছিলেন, সেখানে ইংরেজী, বাংলা লেখা, পড়া আর অঙ্ক শেখবার জন্য অনেক বাঙালী ছেলে ভর্তি

হত। তিনি কোন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। যতটুকু সময় এবং টাকার সংস্থান করতে পারতেন, সবই ব্যয় করতেন স্কুলটির জন্যে।

ছোট ছোট ছেলেদের তিনি বাপের মত যত্ন করতেন এবং ঠাকুরদার মুখে শুনেছি,—তিনি তাঁর ছেলেবেলায় ডেভিড্ হেয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলেন,—প্রত্যেক দিন বিকেলে স্কুল ছুটির সময় ডেভিড্ হেয়ার বড় একটা গামলা, কয়েক কলসী জল, একখানা সাবান আর খানকতক তোয়ালে নিয়ে গেটের কাছে অপেক্ষা করতেন, দরকার হ'লে নিজের হাতেই জল আর সাবান দিয়ে ছাত্রদের হাত মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতেন। ছেলেরাও এই আন্তরিক স্নেহের জন্য তাঁকে ভালোবাসত। হেয়ার সাহেব সব সময়ে তাদের খবরের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকতেন, এমন কি, তাদের বাড়ীতেও যেতেন।

ডেভিড্ হেয়ারের জীবনী লেখার দুঃসাহস আমার নেই। তাঁর সময়ে কলকাতার ভারতীয় ছেলেদের ভালোবাসার ব্রতে ব্রতী ছিলেন তিনি। নানাভাবে তিনি তাদের সাহায্য করতেন। কলকাতার গরীব ছেলেদের প্রতি ভালোবাসার শেষ নিদর্শন যা তিনি রেখে গেছেন, সে হ'ল তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ, যে যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন, তখন তাঁর নশ্বর দেহ যেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির কাছেই সমাধিস্থ হয় যেখানে তিনি তাঁর দুঃস্থ ভাইদের সেবা করেই ঈশ্বরের সেবা করেছেন।

শোনা যায়, কলকাতার, জনকতক উন্নাসিক জবরদস্ত আপন সম্প্রদায়ের উপর প্রভাবশালী ইংরেজ—যাঁরা এদেশী ছেলেদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের মেলামেশা পছন্দ করতেন না,—তাঁর ধর্মবিষয়ে, উদার মনোভাবে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাই এদেশের ইউরোপীয়দের জন্য নির্দিষ্ট খ্রীষ্টানী কবরখানায় তাঁকে কবর দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা, যেন মৃত্যুর পরে সমাধিস্থ রক্ষণশীল খ্রীষ্টানদের দেহাবশেষ 'অবিশ্বাসী' অখ্রীষ্টানের সংস্পর্শে কলুষিত না হয়। বোধহয় এই ভাবেই তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, আর তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান—দুটি ঘটনার যোগ ঘটল; আর তারই ফলে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থান রচিত হ'ল সেই স্কুলের কাছে যেখানে ভারতীয় ছেলেদের কল্যাণে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

তাই আজ ডেভিড্ হেয়ারের সমাধি আর একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে গোলদীঘি বা কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণতীরে কলুটোলা মীর্জাপুর স্ট্রীটের পাশে আর তাঁর দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্তি রয়েছে হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে। তারই কাছে বর্তমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। আর, হেয়ার স্কুলের সংলগ্নই বাংলাদেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়—প্রেসিডেন্সি কলেজ। ঐ কলেজের সূত্রপাত করেছিলেন কয়েকজন দেশপ্রেমিক হিন্দু। দেশীয় বালক ও যুবকদের পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শেখাবার জন্যে নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা স্থাপন করেছিলেন 'হিন্দু কলেজ'। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই "হিন্দু কলেজ"

ছিল কলকাতার একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। অতঃপর সরকার এটিকে গ্রহণ করেন এবং এর নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ।

এমনি করে উনিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার বালকদের প্রতি অফুরন্ত স্নেহ নিয়ে ডেভিড হেয়ার যে স্কুলের পত্তন করেছিলেন, সেটি ক্ষুদ্র সূচনা থেকে ক্রমশঃ বিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বাংলার, তথা ভারতবর্ষের মনের ও আত্মার মহত্তম কল্যাণসাধক এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি আজও অব্যাহত।

* জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ১৬ই জানুয়ারি ১৯৭৬ তারিখে রচিত ইংরেজী প্রবন্ধের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অনূদিত। অনুবাদক : অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রামমোহন রায়

প্রচলিত ধারণা বনাম ঐতিহাসিক সত্য

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৭২ খ্রী. ৪ ও ৫ ফেব্রুআরি তারিখে আমি রামমোহন রায় সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটিতে দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম—ইহা পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।[১] কিন্তু ইহার পূর্ব হইতে সংবাদপত্রের রিপোর্ট পড়িয়াই রামমোহনের ভক্তগণ আমার মতের তীব্র প্রতিবাদ শুরু করেন। ইহার ফলে আমার বিরুদ্ধে একাধিক গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রিকায় অন্ততঃ ১৫।২০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় যে এই ঐতিহাসিক আলোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীগণের মধ্যে একজনও ঐতিহাসিক নাই। সুতরাং প্রতিবাদগুলি সাধারণতঃ ভক্তগণের ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। কারণ ঐতিহাসিক রচনার পদ্ধতি ও প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত রামমোহনের জীবন-চরিত সর্বপ্রথম ১৩৪৯ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতেই প্রকাশিত হয়।[২] লেখক ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ লিখিবার পর রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সেই গ্রন্থ আধুনিক যুগের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের সম্পাদকের অনুরোধে সংক্ষেপে রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেছি। যাঁহারা প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত আলোচনা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা আমার ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি পড়িতে পারেন।[৩]

১৮১৫ খ্রী.[৪] রামমোহন চাকুরী-জীবন শেষ করিয়া কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবনকে ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মোটামুটি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের অনেক ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় না এবং অনেক ভ্রান্ত ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাঁহার জন্ম ১৭৭২ অথবা ১৭৭৪ খ্রী. (আরও অনেক তারিখ আছে) ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে। তাঁহার জন্মের দুই শত বার্ষিক উৎসব কবে অনুষ্ঠিত হইবে ইহা নির্ণয়ের জন্য ভারত সরকার একটি সমিতি গঠন করেন। ইহাতে ১৭৭২ ও ১৭৭৪ দুই মতেরই সপক্ষে যুক্তি দেখান হয়, কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। শুনিয়াছি এই জন্য ঐ উৎসব ১৯৭২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৭৪ পর্যন্ত চলিবে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আমি ঐ সমিতির সদস্য

ছিলাম এবং ১৭৭৪ খ্রী. তাঁহার জন্ম হয় এই মত সমর্থন করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।[৫]

রামমোহনের একখানি 'আত্মজীবনী' প্রচলিত আছে।[৬] কিন্তু ইহা সত্য সত্যই তাঁহার নিজের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে।

রামমোহনের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি পাটনায় গিয়া আরবী ভাষা এবং কাশীতে দশ বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে। তবে তিনি যে এই দুইটি ভাষাই জানিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[৭]

প্রচলিত ধারণা এই যে তিনি ১৬ বৎসর বয়সে হিন্দুর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তিকা লেখার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া তিব্বত পযন্ত গিয়াছিলেন। এই কাহিনী আগাগোড়াই কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। রামমোহন নিজে ডাঃ কার্পেণ্টারকে (Dr. Carpenter) বলিয়াছেন যে তাঁহার দেশ ভ্রমণের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন --এবং রামমোহন যে সমুদয় স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিব্বতের উল্লেখ নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে রামমোহন ১৮১৫ খ্রীঃ শেষ ভাগে রংপুরের কালেক্টরের কর্মচারী-রূপে ভুটান গিয়াছিলেন।[৮] ভুটান রাজ্য তখন তিব্বতের অধীন ছিল—সম্ভবতঃ ইহা হইতেই রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই পত্রখানি হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে তিনি যে ১৮১৪ খ্রী. চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন—এই প্রচলিত ধারণা—যাহা ব্রজেন্দ্র বাবুও গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা ভ্রান্ত।

বস্তুতঃ রামমোহনের চাকুরীজীবন সম্বন্ধে বহু ধারণাই ভ্রান্ত। ১৮০৪ খ্রীঃ রামমোহন উডফোর্ড নামে একজন সিভিলিয়ানের অধীনে কাজ করেন। পর বৎসরে ঐ সাহেব বিলাত গেলে রামমোহন ডিগবী সাহেবের অধীনে চাকুরী করেন। প্রথমে তিনি ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং কয়েক মাসের জন্য তিনি অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ডিগবীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্থায়ীভাবে ঐ পদে রাখিতে সম্মত হন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে "নয় বৎসর (১৮১৪ পর্যন্ত) রামমোহন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করিতেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন এই কয় বৎসরের মধ্যে অতি অল্পকালই কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। বাকী সময় তিনি ডিগবীর খাস ফার্সী মুনশী ছিলেন।"[৯] কিন্তু ডিগবী ১৮১৪ খ্রীঃ চাকুরী ছাড়িয়া যাওয়ার পরেও ১৮১৫ খ্রীঃ শেষভাগে রামমোহন যে সরকারী কর্মচারী হিসাবে ভুটান গিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। অথচ ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বীয় মত সমর্থনের জন্য লিখিয়াছেন: "ডিগবী যে সময় যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭—জুন ১৮০৮) তখন

রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী মুন্শী ছিলেন এ কথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে” নূতন প্রমাণ না পাইলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু যে পদে যত দিনই চাকুরী করুন তাহার বেতন হইতে রামমোহনের ঐশ্বর্য ও সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।[১০] সে যুগে সেরিস্তাদার ও দেওয়ানের ঘুষ—সাধুভাষায় উপরি পাওনার—যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং রামমোহনও যে এইভাবে ধনী হইয়াছিলেন ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। তবে এ সম্বন্ধে সমসাময়িক কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ যদিও বলিয়াছেন সরকারী চাকরি ছাড়া রামমোহনের অন্য আয়েরও পথ ছিল—তথাপি তিনি এ সম্বন্ধে কয়েকটি অপ্রীতিকর উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। “রামমোহনের এই আর্থিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাঁদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনার্ড আবার ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহা লইতেন তাহা ঘুষ নহে—সেকালের দেওয়ানের “legal perquisites”.

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডিগবী সাহেবের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ যে রামমোহনকে তাঁহার দেওয়ানী পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে সম্মত হন নাই পূর্বে তাহা বলিয়াছি। ইহার একটি কারণ বোর্ড অব রেভিনিউর প্রেসিডেন্টের নিম্নলিখিত মন্তব্য : “রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার (রামমোহনের) সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা (unfavourable mention of his conduct) আমার কানে আসিয়াছে।”[১১] অন্য আয়ের পথের মধ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু উল্লেখ করিয়াছেন যে রামমোহন বেনিয়ানের কাজ করিতেন, কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা করিয়াছেন এবং সিবিলিয়ান প্রভৃতিকে টাকাকড়ি কর্জ দিয়াছেন।[১২] এই সময় রামমোহনের পরিবারবর্গের খুবই দুরবস্থা ছিল। কিন্তু তাঁহাদের তুলনায় রামমোহন অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন—এবং কলিকাতায় দুইখানি বড় বাড়ী ক্রয় করিয়া ধনীদের ন্যায় বাইজীর নৃত্যগীত, সাহেবদের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি বিলাস-বাসনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।[১২ক] তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন ঋণের দায়ে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। পারিবারিক অবস্থার উন্নতির জন্য রামমোহন যে অর্থব্যয় করিতেন না—তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন— “গবর্ণমেণ্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুদ-সমেত ফিরাইয়া দিবেন এই মর্মে তমসুক লিখিয়া দিবার পর রামমোহন জ্যেষ্ঠকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন।[১৩]

এই সমুদয় ঘটনার উল্লেখের কারণ রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করা নহে। সে যুগে—এবং এ যুগেও—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী—সুতরাং ইহা বিশেষ কোন নিন্দার কারণ নহে। কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথও রামমোহনের ভক্তগণের স্তুতিবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন "Rammohan belongs to the lineage of India's great seers who age after age have appeared in the arena of our history (যুগে যুগে ভারতে যে সকল ঋষি বা মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন রামমোহন তাঁহাদেরই একজন) তখন ইহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই এই সমুদয় কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। এ যুগের ঋষিতুল্য বাঙ্গালীদের—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের—সহিত এ বিষয়ে রামমোহনের প্রভেদ দেখাইবার জন্যই এত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি—এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিলেই আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

"আমাদের এখনকার কালে তাঁহার (রামমোহনের) মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'রামমোহন রায়, আহা তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে।... আমরা আত্মম্ভরি—আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও... ." জগমোহনের কথা স্মরণ করিলে রামমোহনের সম্বন্ধে "আত্মবিসর্জন" শব্দটি পরিহাসের মত কানে বাজে।

অতঃপর আমরা রামমোহনের জীবনের দ্বিতীয় যুগের (১৮১৫-১৮৩০ খ্রীঃ) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই যুগের রামমোহনের সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তগণের ধারণা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি: "বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।

...তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? ...বঙ্গ সমাজের যে কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"[১০]

এই কল্পনার উচ্ছ্বাস হইতে এবার বাস্তবে আসা যাউক।

শিক্ষা—এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন কারণ রামমোহনের ভক্তগণের মতে তিনিই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজী শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন এবং এই ইংরেজী শিক্ষা ও তাহার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারই ভারতের বর্তমান যুগের ভিত্তি গড়িয়াছে।

হিন্দু কলেজে যে ইংরেজী শিক্ষার এবং পাশ্চাত্ত্য ভাব প্রসারের প্রধান কেন্দ্র ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্যই রামমোহনের সহিত যে এই কলেজের কোন সম্বন্ধ ছিল না ইহার নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ভক্তেরা এখনও জোর গলায় বলিতেছেন যে রামমোহনই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আমি এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।[১৫] এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব। ১৮১৬ খ্রীঃ ১৪ই মে তারিখে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ঈস্ট সাহেবের (Sir Hyde East) বাড়িতে গোঁড়া হিন্দুগণ সমবেত হইয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ১৮১৭ খ্রীঃ ২০ জানুআরী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার দুই দিন পরে ১৬ই মে তারিখে ঈস্ট একখানি চিঠিতে এই সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। সুতরাং এই বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একজন রামমোহন-ভক্ত সর্বপ্রথম এই চিঠিখানি বিলাতী পার্লামেন্টের মুদ্রিত কার্যাবলীর মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত করেন। অন্ধ ভক্তি যে বিচক্ষণ পণ্ডিতদেরও কিরূপ বিভ্রান্ত করে এই চিঠিখানির প্রকাশন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

চিঠির গোড়াতেই ঈস্ট লিখিয়াছেন যে কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার পরিচিত এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে কলিকাতার গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহাদের ছেলেদের ইংরেজীভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে একটি সভা আহ্বান করিতে চান এবং এবিষয়ে তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। তাহার পর এই চিঠিতে সভার কথা এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, তাহার জন্য চাঁদা তোলা প্রভৃতির আলোচনা করেন। মেজর বামনদাস বসু যখন এই চিঠি প্রথম প্রকাশিত করেন তখন "পরিচিত ব্রাহ্মণ" এই শব্দ দুটির পাদটীকা স্বরূপ যোগ করেন 'অবশ্যই রামমোহন রায়' (Of course Rammohan Roy). ব্রজেন্দ্রবাবু যখন এই চিঠিখানি প্রকাশিত করেন তখন তিনি "পরিচিত ব্রাহ্মণ" এই শব্দ দুটির পরে ব্রাকেটের মধ্যে লেখেন 'রামমোহন রায়'। সুতরাং এই চিঠির প্রমাণে রামমোহনের ভক্তগণ প্রচার করিলেন যে তিনিই যে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সাহিত্য পরিষদে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত কারণ ঈস্ট ঐ চিঠিতেই লিখিয়াছেন যে যখন সভায় উপস্থিত একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন যে রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোন চাঁদা নেওয়া হইবে না তখন আমি বলিলাম যে আমার সহিত রামমোহনের পরিচয় নাই, সুতরাং জানিতে ইচ্ছা করি তাঁহার নিকট হইতে চাঁদা নেওয়া হইবে না কেন। চিঠির এই অংশের দিকে ব্রজেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি বলিলাম, যে অতএব চিঠির আরম্ভে যে 'পরিচিত ব্রাহ্মণের' কথা ঈস্ট সাহেব লিখিয়াছেন তিনি কখনও রামমোহন রায় হইতে পারেন না। ব্রজেন্দ্রবাবু আমার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন

যে পূর্বোক্ত পরিচিত ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তারপর আমি এই সম্বন্ধে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই সিদ্ধান্ত করি যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় কোন প্রকারেই যুক্ত ছিলেন না। সম্প্রতি (প্রায় বৎসর খানেক কি তাহার পূর্ব হইতে) এক ভদ্রলোক বহু গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্বোক্ত ঈস্ট সাহেবের চিঠিখানা কেহ জাল করিয়াছিল—উহা প্রকৃত ঈস্ট সাহেবের লেখা চিঠি নহে। শুনিয়াছি 'দেশ' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় এক সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া তিনি ঐ চিঠির কৃত্রিমতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অচিরেই প্রমাণিত হইল যে ঐ চিঠি জাল নহে। বাংলা দেশের একজন অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমদ লণ্ডনে গিয়া আর্ল অব বাকিংহামকে লিখিত ঈস্ট সাহেবের একখানি চিঠি আবিষ্কার করেন।[২৬] পূর্বোক্ত চিঠিতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ আছে এই চিঠিতেও তাহার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আরও যে কয়েকটি জোরালো প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় অথবা ডেভিড হেয়ারের কোন হাত ছিল না। তবে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার দুই তিন বৎসর পরেই ডেভিড হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত যুক্ত হইয়া ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সহিত কোন দিনই ইহার কোন প্রকার সম্বন্ধই ছিল না। আমি একখানি গ্রন্থে ও কয়েকটি প্রবন্ধে।[২৭] এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। আগ্রহশীল পাঠক তাহা পড়িলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন। এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

হিন্দু কলেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও তিনি যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তিনি ১৮২৩ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন এবং নিজে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন—তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু কলেজের সহিত তাঁহার যে কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহার একটি কারণ হিন্দুরা তাঁহার উপর বিরূপ ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে ঈস্টের বাড়ীতে প্রথম যে সভা হয় তাহাতে একজন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে রামমোহনের নিকট হইতে কোন চাঁদা নেওয়া হইবে না। তাঁহাকে ঈস্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া যদি তাঁহার চাঁদা না নেও, তাহা হইলে আমি খ্রীষ্টান বলিয়া কি আমার নিকট হইতে চাঁদা নিবেন না? ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—'আপনার চাঁদা নিশ্চয়ই লইব কিন্তু রামমোহন নিজে হিন্দু হইয়াও প্রকাশ্যে হিন্দুদের নিন্দা করিয়াছেন (reviled us) এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন।' হিন্দুদের যে মনোক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহনের একজন বন্ধু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি যেন অনর্থক প্রতিমাপূজার নিন্দা করিয়া হিন্দুদিগের সঙ্গে কলহ না করেন। ইহার উত্তরে রামমোহন প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "the worship

of idols, very often under the most shameful forms, accompanied with the foulest languge, and most indecent hymns and gestures.[১৮] অথচ যে তান্ত্রিক ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন "theories are indulged in and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of".[১৯] সেই তান্ত্রিক ধর্মকে নিন্দা করা তো দূরের কথা বেদের সমপর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন।[২০]

তীব্র হিন্দু বিদ্বেষের জন্য যে গোঁড়া হিন্দুগণ তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে রামমোহনকে দূরে রাখিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন না করিলেও তাঁহাদের মনোবৃত্তি অস্বাভাবিক বা নিন্দনীয় বলা চলে না। অপর পক্ষে রামমোহনের দিক হইতেও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব পরিহার করারও এমন একটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে যাহা তাঁহার মহত্ত্ব সূচিত করে। রামমোহনের ভক্তগণ তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তকরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র যে এ দিকটা তাঁহারা ভাবিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা কোনরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। দুইটি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। রামমোহন ঈস্ট সাহেবের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম যে সভা আহূত হয় তাহাতে যোগদান করেন নাই। এই হিন্দু কলেজের উদ্বোধন উৎসবে যে সমুদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁহাদের নামের মধ্যে রামমোহনের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে কোন বিশেষ কারণে রামমোহন এই প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে থাকিতেন। আমার অনুমান যে হিন্দু কলেজে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্মের লোক পড়িতে পারিবে না এই নিয়মটিই[২২] সেই কারণ। এই প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি হইতে তিনি যে মুক্ত ছিলেন তাহার কিছু প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গে ঈস্ট সাহেব কর্তৃক আর্ল অব বাকিংহাম সাহেবকে লিখিত হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে চিঠির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার উপসংহার হইতে কয়েক পংক্তির অনুবাদ দিতেছি :

"আমি অন্য এক উপলক্ষ্যে একজন অতিশয় বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে রামমোহনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এত প্রবল শত্রুভাব কেন? তিনি উত্তর দিলেন : রামমোহনের ন্যায় একজন পদস্থ ব্যক্তির প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করা তাঁহারা পছন্দ করেন না। তিনি নিজেও রামমোহনকে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং পরামর্শ দিয়াছেন যে যদি তিনি হিন্দুদের ধর্মের কোন গলদ আছে মনে করেন তবে তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়া সে সমুদয় দূর করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। তাহা না করিয়া তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে হিন্দু মাত্রেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে এবং পরিণামে ইহা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। হিন্দুদের অসন্তোষের বিশেষ কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করা, সর্বদা মুসলমানদের

সঙ্গে ঘোরা ফেরা, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত পান ও ভোজন করা। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি হিন্দুদের সঙ্গ এড়াইয়া চলেন এবং তাহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করেন (looks down upon)। ইহাতে হিন্দুদের প্রাণে খুবই আঘাত লাগে। তাহারা ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু রামমোহন ছাড়া আর যে কোন ব্যক্তির দ্বারা ইহা সম্পন্ন হউক ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। কিন্তু ইহা ক্রমে ক্রমে শান্তিপূর্ণ ভাবে গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় হউক ইহাই তাহারা চায়—অবশ্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে ইহা তাহারা চাহেনা। "They (Hindus) would rather be reformed by anybody else than by him (Rammohan), but they are now very generally sensible that they want reformation, and it will be well to do this gradually and quietly under the auspices of Government without its sensible interference in details."। মোটামুটি ভাবে উল্লিখিত উক্তিটি যে তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রকৃত মনোভাবের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রামমোহনের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের যে ঘনিষ্ঠতার কথা বলা হইয়াছে তাহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোড়াগুড়ি হইতেই মুসলমান ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহার প্রতি রামমোহনের উদাসীনতা এমন কি বিরোধিতা খুব অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, বরং তাঁহার অনন্যসাধারণ উদারতার পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিরূপ বিকৃত করে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ঈস্ট সাহেব যখন প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন (১৮২২ খ্রীঃ) তখন তাঁহার এক বিদায় সভায় তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা পত্র দেওয়া দেওয়া হয় তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত (founded by him) হিন্দু কলেজ দ্বারা জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। ১৮২৭ খ্রীঃ বিচারপতি রিয়ান (Sir Edward Ryan) গ্রাণ্ড জুরীকে (Grand Jury) যে ভাষণ দেন তাহাতে তিনি ঈস্টকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলেন (that institution first set on foot through the intervention of Sir Hyde East in 1816).

১৮৩০ খ্রীঃ যখন ঈস্ট সাহেবের প্রতিমূর্তি হিন্দু কলেজে স্থাপিত হয় তখন India Gazette পত্রিকার সম্পাদক লিখিলেন যে যদিও প্রধানতঃ ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় তথাপি তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সহিত হেয়ার সাহেবের যে কোন সম্বন্ধ ছিল ইহাই তাহার প্রথম উল্লেখ। অথচ হেয়ার সাহেবকে ১৮৩১ খ্রীঃ ১৭ ফেব্রুআরি তারিখে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) সম্প্রদায়ের অন্য ৫৬৪ জন সদস্য স্বাক্ষরিত যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে শিক্ষার উন্নতি ও অন্যান্য সংস্কার বিষয়ে হেয়ারের অবদানের উল্লেখ আছে

কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সহিত তাঁহার কোন প্রকার সংশ্রব ছিল ইহার কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত মাত্র নাই। ইহার অনতিকাল পূর্বেই হেয়ার সাহেবকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্যোক্তা (prime mover) বলিয়া দাবি করা সত্ত্বেও ৫৬৫ জন ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য তাহার উল্লেখ তো দূরের কথা ইঙ্গিত মাত্র করিলেন না ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অতঃপর রামমোহনের ভক্তেরা আসরে নামিলেন। প্রত্যক্ষভাবে রামমোহনের সঙ্গে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে না পারিয়া তাহারা ১৮৩২ খ্রীঃ একটি পত্রিকার (Calcutta Christian Observer) মারফৎ প্রচার করিলেন যে রামমোহন রায়ের বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া দেশের উন্নতি কিসে হইবে এই বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। রামমোহন রায় বলিলেন ধর্ম সংস্কারের জন্য ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করা হউক, হেয়ার সাহেব বলিলেন যে ইংরেজী শিখিবার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হউক। এই শেষোক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল, হেয়ারসাহেব এই প্রস্তাবিত কলেজের খসড়া (plan) একটি কাগজে লিখিয়া ঈস্ট সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ঈস্ট সাহেব ঈষৎ অদল বদল করিয়া কলেজের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে একটি সভা ডাকিলেন এবং ইহাতে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

এইভাবে হেয়ার সাহেবের নাম হিন্দু কলেজের সহিত যুক্ত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্রের মনে সম্ভবতঃ এবিষয়ে একটু সন্দেহ ছিল। তিনি হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর রাজা রাধাকান্ত দেবকে এবিষয়ে চিঠি লেখেন (৩০ অগস্ট ১৮৪৭) রাধাকান্ত দেব যে উত্তর (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭) দিলেন তাহার মর্ম এই. "কলেজের পুরাতন নথিপত্র ঘাঁটিয়া হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। যদি তাহাই হইত তবে ঈস্ট সাহেব তাঁহার বাড়ীতে প্রথমে এবিষয়ে যে সভা হয় তাহাতে ইহার উল্লেখ করিতেন এবং তাঁহার বাড়ীতে দ্বিতীয় সভায় (২১ মে ১৮১৬) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ২০ জন ভারতীয় এবং দশজন ইউরোপীয় সদস্য লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়, হেয়ার সাহেব তাহার একজন সদস্য থাকিতেন। পুরাতন দলিল ঘাঁটিয়া দেখিলাম যে ১৮১৯ খ্রী ১২ জুন তারিখে হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের পরিদর্শক (Visitor) নিযুক্ত হন। পরে তিনি এই কার্যে যে যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখান তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে, সম্ভবতঃ ১৮২৫ খ্রীঃ; কলেজের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে হেয়ার সাহেব নহে ঈস্ট সাহেবই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।"

রাধাকান্ত দেবের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে সম্প্রতি একটি নূতন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক টমসন সাহেবের (Chaplain T. T. Thompson) একখানি চিঠি। ১৮১৬ খ্রী. লিখিত এই চিঠির মর্ম এই: "কয়েকজন হিন্দু আমাকে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার খসড়া (plan) প্রস্তুত করিবার অনুরোধ করিলে আমি তাঁহাদিগকে বলি যে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড

ঈস্ট। কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু তদনুসারে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; তিনি তাঁহার বাড়ীতে একটি সভা ডাকেন এবং সেই সভায় একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। ঈস্ট সাহেবের বিবরণের সহিত ইহার সঙ্গতি আছে কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রামমোহন রায়ের বাড়ীর বৈঠকখানায় হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের এক খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ইষ্ট তাহা একটু পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করেন ইহাও সর্বৈব মিথ্যা।

একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৮৩২ সালে এবং তাহার পরও হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মাত্র ঈস্ট ও হেয়ার সাহেব এই দুই জনের নামই শোনা যায়—রামমোহনের নামে কেহ ইহার দাবি করে নাই। হেয়ার সাহেবের ভক্তগণ ঈস্টের পরিবর্তে কেবল হেয়ার সাহেবকেই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করিতেন—এবং পূর্বোক্ত কাহিনীর আরও অনেক ডালপালা গজাইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬২ খ্রী. কিশোরীচাঁদ মিত্র হেয়ার সাহেবের স্মৃতি-সভায় সর্বপ্রথম রামমোহনের নাম উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করেন যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কেবল হেয়ার সাহেবের নহে, রামমোহন রায়েরও ইহাতে অংশ আছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি রামমোহনের কৃতিত্বের উপর বেশী জোর দেন। অতঃপর হেয়ার ও রামমোহনের নামই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গৃহীত হইল—ঈস্টের নাম মুছিয়া গেল। তাহার পর ক্রমশঃ হেয়ার সাহেবের নামও ডুবিয়া গেল এবং হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় প্রধান কৃতিত্ব যে একমাত্র রামমোহনেরই এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইল। তাহার কারণ যে ব্রাহ্মণ হাইড ঈস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দু কলেজের প্রস্তাব করেন তিনি যে নিঃসন্দেহে রামমোহন রায় মেজর বামনদাস বসু ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত প্রচার করেন। আমি যখন প্রতিপন্ন করিলাম যে সেই পরিচিত ব্রাহ্মণ রামমোহন হইতে পারেন না কারণ ঈস্ট সাহেব সেই পত্রেই লিখিয়াছেন যে তিনি রামমোহন রায়কে চেনেন না—তখন আবার হেয়ার সাহেব ও রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার যুগ্ম কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছেন—সম্প্রতি (১৯৭৫ খ্রীঃ) হেয়ার সাহেবের দ্বিশত জন্ম-বার্ষিকী (Bi-centenary) স্মৃতি সভায় এই মতই বিঘোষিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমার অর্ধ শতাব্দীর অধিক ইতিহাস-চর্চার অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, যেরূপ অকাট্য প্রমাণের বলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রামমোহন বা ডেভিড হেয়ারের হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই ছিল না—খুব কম অতীত ও বিতর্কমূলক ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধেই সেরূপদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর রামমোহনের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। রামমোহনের বহু পূর্ব হইতেই সে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হইয়াছে এবং ইংরেজ সরকারও ইহা রহিত করিবার বহু নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন রায়ও এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদের জন্য যে শ্রম ও আয়াস করিয়াছিলেন তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে কয়েকটি প্রচলিত ধারণা ভ্রান্তিমূলক।

প্রথমতঃ প্রচলিত ধারণা এই যে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সহমৃতা হন, শরীরে আগুন লাগায় তিনি চিতা হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করেন—কিন্তু তাঁহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখা হয়। রামমোহন তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অসীম ক্রোধ ও অনুকম্পায় অধীর হইয়া সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করেন যে এই নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদ না করিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না।

মিস্ কলেট প্রণীত রামমোহনের জীবনীতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। মিস কলেট রাজনারায়ণ বসুর নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু গল্পটি সত্য হইতে পারে না কারণ এই ঘটনার সময় ও পরবর্তী দুই বৎসর রামমোহন সুদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন।[২৩]

দ্বিতীয়তঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রচলিত ধারণাবশতঃ লিখিয়াছেন যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁহার ভূমিকা খুব বড় না হইলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহার চেষ্টা ব্যতীত আইন দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা এত শীঘ্র নিষিদ্ধ হইত না।[২৪] প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত। কারণ বেণ্টিঙ্ক নিজেই লিখিয়াছেন[২৫] যে এ বিষয়ে আইন করার আগে তিনি রামমোহনের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন -রামমোহন আইন দ্বারা সহমরণ প্রথা বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের একখানি চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে বড়লাট হইয়া ভারতে আসিবার পূর্বেই তিনি সহমরণ প্রথা লোপ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।[২৫ক] এই দুইটি বিষয় অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে সহমরণ প্রথা রহিত করিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ বেণ্টিঙ্কের—রামমোহনের নহে।

রামমোহনের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু সহমরণ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা ছাড়া তিনি আর কোন সামাজিক সংস্কারের দাবি করিতে পারেন না। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁহার অবদানের কথা বলিয়াছি। নারীজাতির সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চধারণা ছিল সত্য কিন্তু ধারণা ও সংস্কার সাধন এক কথা নহে। মনে মনে সমাজের কোন গ্লানি সম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করা বা ভাষায় তাহা প্রকাশ করা—ইহাই সমাজ সংস্কার নহে—কিন্তু সেই সমুদয় গ্লানি দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই সমাজ সংস্কারের লক্ষণ—রামমোহন সহমরণ প্রথার জন্য এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যে আয়াস বা প্রয়াস করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহারা সমাজ সংস্কারক পদবাচ্য হইতে পারেন। কিন্তু রামমোহন হিন্দু সমাজের এরূপ আর কোন সংস্কারের জন্য প্রয়াস করিয়াছেন তাহা আমার জানা নাই। কেবল তাহাই নহে রামমোহন সমাজে যাহা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের আচরণও তাহাই সমর্থন করে। 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন। "বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার কহাইতে পারে না। কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধহিংসা সল্লোকদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য অতএব তৎপক্ষে সে

সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে।"[২৬] অর্থাৎ রামমোহনের মতে প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলাই উচিত তাহার পরিবর্তন শুধু অনাবশ্যক নহে, নিন্দনীয়। তিনি নিজেও এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেন। রামমোহনের প্রিয় বন্ধু অ্যাডাম সাহেব লিখিয়াছেন : "বর্তমান হিন্দুসমাজের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত বিধি নিষেধ তিনি মানিয়া চলিতেন। তিনি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন খাদ্য আহার করিতেন না, অহিন্দু অন্য জাতির সহিত প্রকাশ্যে একত্র ভোজন করিতেন না যদিও গোপনে প্রায়ই এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন।"[২৭] জাতিভেদ জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী—ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি জাতিভেদ দূর করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত (বিলাতে থাকিতেও) তিনি উপবীত ধারণ করিতেন এবং বিলাতে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ ও খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন এবং জাহাজে নিজের কক্ষে বসিয়া আহার করিতেন।[২৮]

ইহার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে রামমোহন লিখিয়াছেন যে খাদ্যাখাদ্য বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান—"এ সকলবিষয়ে শাস্ত্রই কেবল প্রমাণ।"[২৯] আর এই শাস্ত্র কেবল বেদ, স্মৃতি নহে, শিবোক্ত তন্ত্রমতও ইহার সমকক্ষ।[৩০] অর্থাৎ বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি যে সমুদয় সমাজ সংস্কার বিষয়ে বঙ্গদেশে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ পরবর্তীকালে পথপ্রদর্শক ছিল তাহা রামমোহনের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং রামমোহন সমাজ সংস্কারক ছিলেন—ইহা তাঁহার ভক্তেরা যত জোরেই বলুন ইহার কোন ভিত্তি নাই—সহমরণের নিষ্ঠুরতা রামমোহনের মানবিকতাকে বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যে সমাজের সংস্কারক ছিলেন এরূপ সাধারণ উক্তির ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

প্রচলিত ধারণা এই যে রামমোহন বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে তাঁহার প্রথম গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু তাহার পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'রাজাবলী' যথাক্রমে ১৮০২ ১৮০৮ ও ১৮০৮ খ্রী: প্রকাশিত হয় ইহারও পূর্বে ১৮০১ খ্রী: রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং ১৮০৪ খ্রী: রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্' প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম কেরী ১৮০১ খ্রী: বাইবেলের বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ এবং ১৮১২ খ্রী: 'ইতিহাসমালা' রচনা করেন। মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম ও রাজীবলোচন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তক রূপে লিখিত হইলেও এইগুলিতে যে বাংলা গদ্য রীতির নমুনা দেখা যায় তাহা রামমোহন রায়ের বাংলা গদ্য গ্রন্থগুলির ভাষা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।[৩১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ১৮১৩ খ্রী: রচিত হইয়াছিল—যদিও ইহা অনেক পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বর্তমান যুগে রামমোহনের ভক্তগণ যাহাই বলুন উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ যে বাংলা গদ্য-রীতির স্রষ্টা সে যুগে (১৮৩৪ খ্রী:) 'Dictionary in English and Bengalee' গ্রন্থের প্রণেতা দেওয়ান রামকমল সেন[৩২] এবং এ যুগে ডা: সুশীলকুমার দে[৩৩] এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৪] তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

আর একটি প্রচলিত ধারণা এই যে রামমোহনই বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৮২৬ খ্রী: এবং ইহার বাংলা অনুবাদ ১৮৩৪ খ্রী: প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার পূর্বে ১৮০৭ ও ১৮১১ খ্রী: মধ্যে লিখিত একখানি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক (T. P. Mukhopadhyaya তারাপদ মুখোপাধ্যায়) মনে করেন যে ইহার প্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। সুতরাং তাঁহার মতে প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব--যাহা এতদিন রামমোহনকে দেওয়া হইত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই তাহার ন্যায্য অধিকারী।

আর একটি প্রচলিত ধারণা—রামমোহন রায়ই ধ্রুপদ সঙ্গীত এ দেশে প্রবর্তন করেন—তাহাও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।[৩৫]
প্রচলিত ধারণা এই যে রামমোহন রায়ই বাঙ্গালী সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকার পথ-প্রদর্শক (pioneer of Bengali Journals edited by the Bengalis); প্রকৃত ঘটনা যতদূর জানা যায়—তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। ঐ বৎসর শ্রীরামপুর হইতে পাদরী মার্শমানের (J. C, Marshman) সম্পাদনায় এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক ও মে মাসে "সমাচার-দর্পণ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'দিগদর্শন' খুব অল্প দিন পরেই বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু 'সমাচার-দর্পণ' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। মার্শম্যান সাহেব নামে সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় পণ্ডিতেরাই ইহার সম্পাদনা করিতেন।

১৮১৮ খ্রী: 'বাঙ্গাল গেজেটি' (Bengal Gazette) নামে আর একখানি সাপ্তাহিক কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। কাহারও মতে ইহার সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র রায় আবার কাহারও মতে ইহার সম্পাদকের নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই পত্রিকার কোন সংখ্যাই এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইহার প্রথম সংখ্যা ২৩শে মে তারিখে প্রকাশিত সমাচার-দর্পণের প্রথম সংখ্যার পূর্বে কি পরে প্রকাশিত হইয়াছিল ইহা লইয়া অনেক দিন পর্যন্ত মতভেদ ছিল। কিন্তু ইহা যে সমাচার-দর্পণের অল্প কয়েক দিন পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল ইহা আমি আমি অন্যত্র প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি।[৩৫]

সুতরাং 'দিগ্‌দর্শনই' বাংলার ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। কিন্তু বর্ধমান হইতে প্রকাশিত 'দামোদর' নামক পত্রিকায় যেসম্প্রতি লেখা হইয়াছে।

'বঙ্গাল গেজেটি' পত্রিকায় সম্পাদক "গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা সংবাদপত্রের আদি প্রবর্তক—প্রথম বাঙ্গালী সাংবাদিক এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।" সুতরাং মহাসমারোহে সম্প্রতি (১৯৭৫ খ্রীঃ) তাঁহার বাস্তুভিটায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ বিরাট সভা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু আমি প্রত্যুত্তরে জানাইয়াছিলাম যে বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' 'বঙ্গাল গেজেটি' নহে। বলাবাহুল্য, উৎসবের তাহাতে কোন বাধা হয় নাই এবং অদ্যাবধি আমার চিঠিরও কোন জবাব পাই নাই। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের প্রবর্তক হিসাবে রামমোহনের দাবি অবশ্য আরও অসঙ্গত। কারণ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত 'সংবাদ কৌমুদী' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বাহির হয় তাহাতেই সর্বপ্রথম রামমোহনের লিখিত প্রবন্ধাদি বাহির হইত, কিন্তু ১৮২২ খ্রীঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়। রামমোহন ইহার সম্পাদক ছিলেন না, এবং কিছুকাল পরে যখন এই পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয় তখন ইহার সহিত রামমোহনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। সুতরাং রামমোহনকে বাংলা সাময়িক পত্রের প্রবর্তক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পূর্বোক্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হতভাগ্য' বঙ্গদেশের সমাজের যে সমুদয় বিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতিতে কেবল রামমোহনের হস্তাক্ষরই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে শিক্ষা, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্যের কথা আলোচনা করিলাম। বাকী রহিল ধর্ম ও রাজনীতি। ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের প্রধান নির্দেশ—মূর্তি পূজার অবসান—ঘটাইয়া তিনি বর্তমান বঙ্গ সমাজের ভিত্তি কত দৃঢ় ভাবে স্থাপন করিয়াছেন প্রতি বৎসর আলোক-মালায় সজ্জিত দ্বি-সহস্রাধিক দুর্গা মূর্তির পূজামণ্ডপে জলন্ত অক্ষরে তাহা লিখিত এবং শত শত ঢক্কা নিনাদে প্রতিধ্বনিত হয়। ১৯৭১ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ২৫১।

বাকি রহিল রাজনীতি। এই প্রসঙ্গে "রামমোহনের নির্মিত ভবনে আমরা বাস করিতেছি" ইহার একমাত্র সঙ্গত অর্থ হয় যে ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে (১২৯১ সালে) ভারতে যে রাজনীতিক জাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছিল তাহা রামমোহনেরই অবদান। ১৮২৩ খ্রীঃ মুদ্রাযন্ত্র আইন (Press Ordinance) এবং ১৮২৭ খ্রীঃ জুরী আইন (Jury Act) পাশ হওয়ায় রামমোহন তাহার যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সফল না হইলেও ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে ইহা যে মূল্যবান অবদান তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু উনিশ শতকের নবজাগরণে যে রাজনীতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল—যাহা হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ও ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ কবিতায় রামমোহনের জীবিতকালে এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার কোন আভাস রামমোহনের জীবনে ও কর্মে পাই না। রামমোহন একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কি একটা পাগলামি নয়? (Is not this fiery love of national independence a chimera?)" ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব

সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন : "বিজেতা যদি বিজিত অপেক্ষা অধিকতর সভ্য হয় তাহা হইলে পরাধীনতা দুর্ভাগ্য নহে—কারণ প্রথমটির সভ্যতায় দ্বিতীয়টির উন্নতি হয়। ভারতের পক্ষে আরও বহুদিন ইংরেজের অধীন থাকা দরকার নচেৎ তাহার অনেক ক্ষতি হইবে।[৩৯]" যে রামমোহন দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন দেশের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতায় আনন্দের আতিশয্যে দীপমালা জ্বালাইয়াছিলেন এবং ৬০ জন সাহেবকে ভোজ দিয়াছিলেন নিজের দেশের সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি ভারতে নবজাগরণের উপযোগী নহে—অন্ততঃ এ বিষয়ে যে আমরা উনিশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রামমোহনের নির্মিত ভবনেই বাস করিতেছিলাম' এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করা কঠিন।

আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। রামমোহনের প্রতি বিলাতে যে মর্যাদা ও সম্মান দেখান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার ভক্তগণের ধারণা—তাহা বেশ কিছু অতিরঞ্জিত এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৩১ খ্রীঃ ৪ঠা জুন তারিখে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেক্রেটারী ভারতের বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ককে লিখিয়াছিলেন : সংস্কারক রামমোহন সম্বন্ধে (বিলাতে) অনেক বাড়াবাড়ি করা হইতেছে। আমার বিশ্বাস তিনি হিন্দুদের মানদণ্ডে বিচার করিলে বেশ ভাল এবং অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য কিন্তু খুব মানসিক শক্তি সম্পন্ন নহেন। "(Rammohun Roy is a staunch reformer—he is made much of by the party. I really think he is a mild wellmeaning man of extraordinary requirements for a Hindu but not of much strength of mind) "। এই উক্তির মধ্যে '**for a Hindu**' কথাটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে তৎকালে যেরূপ ধারণা বিলাতে প্রচলিত ছিল **তাহার মাপ কাঠিতে** রামমোহন বড় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। এই মাপকাঠি তৎকালে কিরূপ ছিল দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ১৭৯২ খ্রীঃ চার্লস গ্র্যাণ্ট (Charles Grant) লিখিয়াছিলেন যে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত সম্প্রদায় অপেক্ষাও বাঙ্গালীরা নিকৃষ্ট। ১৮১৩ খ্রীঃ ভারতের বড়লাট লর্ড হেস্টিংস তাঁহার রোজনাম-চায় (diary) লিখিয়াছেন "হিন্দুরা জন্তু জানোয়ারের সামিল (The Hindoo appears a being nearly limited to mere animal functions)।" এই দুইটি উক্তিই[৪০] রাম-মোহনের সমসাময়িক হিন্দুদের বর্ণনা। এই মাপ কাঠিতে রামমোহনের সম্বন্ধে বিলাতে ধারণা যাচাই করিলে খুব উচ্ছ্বসিত হইবার কারণ নাই।

রামমোহনের নিন্দা অথবা লোকের চক্ষে তাঁহাকে খাটো করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদান—অন্ধ সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য স্থাপন করা। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার ভক্তদের অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

পাদটীকা

(পাদটীকায় নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে)

গ্রন্থ = *On Rammohan Roy,* by Ramesh Chandra Majumdar (The Asiatic Society, Calcutta, 1972)

প্রবন্ধ (১) = The Calcutta Review, New Series, Vol. III, No. 3, January-March, 1972, pp. 209-226

প্রবন্ধ (২) = Journal of the Asiatic Society, Letters Vol. XXI, pp. 39-51.

প্রবন্ধ (৩) = Asiatic Society, Monthly Bulletins, April, 1975.

প্রবন্ধ (৪) = Do September, 1975.

Rammohun = Rammohun Roy—The Man and his Work Centenary Publicity Booklet No. 1, June, 1933 Edited by Amal Hom;

ব্রজেন্দ্র = রামমোহন রায়, (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (আষাঢ় ১৩৪৯)

১। গ্রন্থ

২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—১-৬ সংখ্যা।

৩। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (১-৪)।

৪। প্রচলিত ধারণা মতে—১৮১৪

৫। গ্রন্থ ৩-১৮ পৃঃ

৬। Rammohun, p. 199.

৭। ব্রজেন্দ্র—১৩ পৃঃ।

৮। সুরেন্দ্রনাথ সেন —"প্রাচীন বাংলা পত্র সঙ্কলন"।

৯। ব্রজেন্দ্র—৩১ পৃঃ।

১০। প্রবন্ধ (১) – ২১১ পৃঃ।

১১। ব্রজেন্দ্র—৩০-৩১ পৃঃ

১২। ঐ ৩২ পৃঃ।

১২ (ক) ৩৭ পৃঃ।

১৩। ঐ ৩৩ পৃঃ।

১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী—(বিশ্বভারতী), চতুর্থ খণ্ড, ৫১৩, ৫১৫ পৃঃ।

১৫। গ্রন্থ, প্রবন্ধ (১-৪)।

১৬। *Nineteenth Century Studies,* January, 1975, pp. 138-160.

১৭। গ্রন্থ, প্রবন্ধ (১-৪)।

১৮। Potdar, Arabinda—*Renaissance in Bengal—Quest and Confrontations*, p. 70

১৯। R. L. Mitra—*Nepalese Buddhist Literature*, p. 261

২০। "তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিত যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়।" রামমোহন গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, চারি প্রশ্নের উত্তর, ১৯ পৃ. এই গ্রন্থের ১৬-২০, ১৫৪ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাময়িক পত্রে সমাজের কথা প্রথম খণ্ড, ৫২৮ পৃঃ।

২২। এই নিয়মটি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে আমি যে সময় হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলাম (১৯০৫ খ্রীঃ) অন্ততঃ সেই সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

২৩। ব্রজেন্দ্র, ৩৪-৩৫ পৃঃ।

২৪। Rammohan, p. 73

২৫। সতীদাহপ্রথার নিষেধমূলক আইন প্রণয়নের প্রস্তাবনায় বেণ্টিঙ্কের মন্তব্য।

২৫ ক। প্রবন্ধ (১)—২১৯ পৃঃ।

২৬। রামমোহন গ্রন্থাবলী, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪০ পৃঃ

২৭। Colet—*Raja Ramohun Roy*, p. 212

২৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭৬-৭৭।

২৯। রামমোহন গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) ষষ্ঠ খণ্ড ২০ পৃঃ।

৩০। ঐ ১২, ১৬, ১৯ পৃ.

৩১। তুলনার জন্য 'গ্রন্থ' ৫৩-৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩২। *Dictionary in English and Bengali*, Introduction, p. 14. Asiatic Journal, 1835, Port I, pp, 43-44, 234

৩৩। উইলিয়ম কেরী, (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), ৫৬ পৃ.।

৩৪। রামমোহন রায় (ঐ), ৭০-৭১ পৃ.।

৩৫। প্রবাসী—১৩৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৩১-৩২ পৃ.

৩৬। Calcutta Review, (New Series), Vol. I, pp 213, 519 ff.

৩৭। কবিতাটির নাম—*'To India—My Native Land'*

ইহার আরম্ভ এইরূপ

My Country ! in the days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow
And worshipped as a deity thou wast.

Where is that glory, where that reverence now ?

(Henry Louis Vivian Derozio (1808-31)

A Memorial Volume, Edited and Arranged by Mary Ann Das Gupta.

৩৮। কাশীপ্রসাদের একটি কবিতা—অতীতের স্মৃতি

Land of the Gods and lofty name ;
Land of the fair and beauty's spell,
Land of the bards of mighty fame
My Native land : for e'er fare well !

আর একটি—ভবিষ্যতের আশা

But woe me ! I shall never live to behold
That day of thy triumph, when firmly and bold,
Thou shall mount on the wings of an eagle on high
To the Region of knowledge and blest liberty.

এই সুর রামমোহনের কোন রচনায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—অথচ ইহাই উনিশ শতকের নবজাগরণের ভিত্তি।

৩৯। Patdar, Arabinda—op. cit. p. 62

৪০। ইহা এবং এই প্রকার অন্যান্য উক্তির জন্য মৎপ্রণীত *Glipses of Bengal in the 19th Century,* (pp. 8-9) দ্রষ্টব্য।

রমেশচন্দ্র ইতিহাস-চিন্তা

সুনীল সেন

কয়েক পুরুষ ধরে রামবাগানের দত্ত পরিবারে সাহেবিয়ানার প্রতি প্রবল ঝোঁক থাকলেও রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতীয় সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বদেশের ইতিহাস পড়তে পড়তে তাঁর মনে জাগে নতুন আবেগ। তিনি লিখেছেন:

"দক্ষিণ সাহবাজপুরে জলপ্লাবনান্তে যখন আমি তথায় গিয়া প্রান্তরে পট্টবাস স্থাপন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম, সে সময় আমি প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে একাকী গ্রাণ্ট ডফ্-কৃত সঞ্জীবনীসুধাপূর্ণ মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস পাঠ করিতাম এবং অনেক সময় এরূপও ঘটিত যে শিবাজীর কোন চরিত্র কাহিনী চিন্তা করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। আমি যখন ত্রিপুরা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করি তখন টড্-প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসখানা সততই আমার কাছে থাকিত। এই সময় আমি প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা লিখিয়াছিলাম"।[১]

এইভাবে রমেশচন্দ্রের ভারত আবিষ্কার। তিনি অনুভব করেন ভারতের ইতিহাস স্বাভাবিকভাবে তাঁকে রোমাঞ্চিত করে। তাঁর রক্তে ছিল ভারত। পশ্চিম ঘুরে তিনি ভারতে এসেছিলেন। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ভাবধারা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর লেখায় উদারনৈতিক ভাবধারার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল।

ভারতে প্রাচ্য জ্ঞানান্বেষণের শুরু ১৭৮৪ সালে। ঐ বছর কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। উইলিয়ম জোনস্, চার্লস উইলকিনস্, কোলব্রুক প্রভৃতি বিদেশী লেখকগণ প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারততত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, শিলালিপি এবং তাম্রশাসন থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে তাঁর প্রচেষ্টা সুবিদিত। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল বলা চলে। এই অবস্থায় রমেশচন্দ্র ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রধানতঃ একজন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক; জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লেখার নতুন ধারার তিনি অন্যতম স্রষ্টা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে শুরু করে তিনি পৌঁছেছিলেন আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে। অবশ্যই তাঁর প্রচেষ্টা ভারতের বিকাশমান জাতীয়তাবাদকে পুষ্ট করেছিল। মনে হয় উনিশ শতকের ইউরোপে জাতীয়তা-বাদের প্রসার তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ-সংহিতার বাংলা অনুবাদ ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। ঋগ্বেদের দেবগণ ও বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কে তিনি বাঙলা ভাষায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা পরে এই প্রবন্ধগুলির পরিচয় দেবো। ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রথম বড় ঐতিহাসিক কাজ, A History of Civilization in Ancient India, প্রকাশিত হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে এই বই লিখিত। ইতিহাস রচনায় তিনি সাহিত্যকে বড় উপাদান মনে করতেন. তাঁর মতে সাহিত্যের মধ্যে মানুষের ধ্যান ধারণা রীতিনীতি, ধর্মমত প্রতিফলিত। আধুনিক ঐতিহাসিক অবশ্য সাহিত্যিক উপাদানকে সব সময় নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। শুধুমাত্র সাহিত্যিক উপাদানকে ভিত্তি করে সামাজিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু বলা চলে যে মানুষের সমাজজীবন জানতে হলে অনেক সময় সাহিত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। রমেশচন্দ্রের প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস বইটিতে মৌলিক গবেষণার ছাপ চোখে পড়ে না। নিবেদিতা লিখেছেন : "It was never a work of original scholarship......this book was intended as an exposition to India and to the world of the national glory."[৭] রমেশচন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের গরিমা উদ্ধার করা। এইভাবে তিনি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র * বাঙলা ভাষায় সেকালের সাময়িক পত্রে ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাস-চিন্তা এই সব প্রবন্ধে প্রকাশিত। আমরা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের পরিচয় দেবো। "ঋগ্বেদের দেবগণ" প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বৈদিক যুগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ; এই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

"দ্যু (অর্থাৎ আকাশ) এবং পৃথিবীকে সকল দেবগণের পিতামাতা বলিয়া অর্চনা করা হইয়াছে, অদিতিও (অর্থাৎ অনন্ত আকাশ বা বিশ্বজগৎ) সকল দেবের মাতা স্বরূপা। তাঁহারই সন্তান সূর্যাদি আদিত্যগণ। ইন্দ্র আকাশ, দেব, মেঘকে হনন করিয়া বৃষ্টি দিয়া মনুষ্যের হিত করেন, এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত (অর্থাৎ স্তুতি) আছে, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই। বরুণও আবরণকারী আকাশ বা নৈশ আকাশ, মিত্র আলোক বা দিবা ; সুতরাং মিত্র ও বরুণের প্রায়ই একত্র স্তুতি করা হইয়াছে। এবং তাহাদিগের সঙ্গে অর্যমারও স্তুতি আছে। কেন না তিনি দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থ প্রাতঃ কালের সূর্য। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, অতএব অগ্নিই সকল যজ্ঞের পুরোহিত এবং

* পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (২৪ চৈত্র ১৩০১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০২ বঙ্গাব্দের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতি। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা। শ্রীমদনমোহন কুমার রচিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস, প্রথম পর্ব' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। —পত্রিকাধ্যক্ষ।

তাঁহাকে যে হব্য অর্পণ করা যায় তিনি তাহা দেবগণের নিকট লইয়া যান। বায়ু বাতাস, মরুৎগণ ঝড়ের বাতাস মহাপরাক্রান্ত, এবং ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রু বিনাশ করেন। সূর্য বা সবিতা আলোক বর্ষণ করেন। উষা প্রাচীন ঋষিদের বড় আদরের দেবী, তাঁহার সম্বন্ধে সূক্তগুলি যেরূপ কবিত্বপূর্ণ সেরূপ আর কোন দেব সম্বন্ধে দেখা যায় না। তিনি সংসারের গৃহিণীর ন্যায় প্রত্যুষে জাগ্রত হইয়া স্নেহের সহিত সকলকে জাগরিত করেন, সকলকে আপন কার্যে প্রেরণ করেন। উষার পূর্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত থাকে, তাহাই অশ্বিদ্বয়, পুরাণে তাহাদের অশ্বিনীকুমার বলে।

"......কালক্রমে যজ্ঞের ঘটা ও অনুষ্ঠান কার্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে অবশেষে ঋত্বিক বা পূজক সম্প্রদায় একটি শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইলেন। রাজপুরুষগণ ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন, সাধারণ শ্রমজীবিগণ বৈশ্য হইলেন, বিজিত বর্বর জাতিগণ শূদ্র হইলেন। এগুলি ঐতিহাসিক কথা, এখানে বলিবার এই আবশ্যক যে ঋগ্বেদ সংহিতায় এ চারি জাতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, এ জাতি বিভাগটি ঋগ্বেদের সূক্ত রচনার পর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।"[৩]

আর একটি প্রবন্ধে তিনি উনিশ শতকের নব জাগরণের পটভূমি বর্ণনা করেছেন :

"শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্য উন্নতির আলোক সহসা বঙ্গদেশে দেখা দিল। আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বলতম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত হইল,—আধুনিক উদ্যম উৎসাহ ও উন্নতি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল। ভিন্নরুচি লোকে ভিন্নপ্রকারে সে সভ্যতা গ্রহণ করিলেন। পল্লবগ্রাহিগণ ইউরোপীয় সুরাপান প্রভৃতি দোষ গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয় উৎসাহ, উদ্যম, স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বধর্ম-প্রিয়তা গ্রহণ করিলেন, দেশে মহা আন্দোলন হইল, চিন্তার লহরী বহিল, উৎসাহ ও উদ্যম উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিয়তা ও ধর্মপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা, সেই উৎসাহ সেই ধর্মপ্রিয়তা প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়ে পূর্ণ বিকাশ পাইল।

"শতাব্দীর মধ্যকালেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা বিশৃঙ্খলা হইল। বিদেশীয় আচারের অনুকরণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী কথা জানিবার ইচ্ছাও ফলবতী হইল। দুই দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া যেন সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই পরস্পর প্রতিঘাতী ঊর্মিরাশির মধ্যে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল।"[৪]

রমেশচন্দ্রের মতে ইতিহাস সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনী। তিনি মন্তব্য করেছেন, "কেবল যুদ্ধ বর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলি প্রকৃত ইতিহাস নহে।" ব্যক্তি

ইতিহাস সৃষ্টি করে না, বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় ব্যক্তি নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইতিহাস বীরের সৃষ্টি নয়, ইতিহাসই বীর সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, "সক্রেটিস কেবল নিজ জ্ঞানে জ্ঞানী নহেন, গ্রীকদিগের তৎকালিক অসামান্য চিন্তা-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ মাত্র। লুথর নিজ বলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম পরিবর্তিত করেন নাই। সেই সময় নূতন জ্ঞানালোক ইউরোপে প্রকাশিত হওয়ায় তৎকালিক আচার অনুষ্ঠানের অনিষ্টকর নিয়মগুলি ইউরোপের মহাক্রান্ত ও নব বলে বলীয়ান জাতিদের অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল,—লুথর তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া সেই নিয়মগুলি তিরোহিত করিলেন। নেপোলিয়ন কেবল নিজ তেজে পূর্ণ হইয়া জগৎ বিপর্যস্ত করেন নাই, ফরাসী বিপ্লবের অপরিসীম শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নেপোলিয়ন বিস্ময়কর ও অতুল্য তেজ জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন।

"......সময়ের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্যম নেতাকে বাছিয়া লয়, ব্যক্তিগত প্রতিভাকে অবলম্বন করে এবং ক্ষণজন্মা মহারথীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকাশ পায়।"

প্রগতি ও বিবর্তনের ভাবধারায় রমেশচন্দ্রের ছিল গভীর আস্থা। অবশ্যই তাঁর জানা ছিল সরলরেখায় প্রগতি অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে আসে বিপর্যয় এবং ভাঙন। প্রগতির পথে মানুষের যাত্রায় কখনো আসে পতনের যুগ এবং তারপর উন্নতির যুগ। প্রবহমান স্রোতের মত ইতিহাসের গতি প্রগতির দিকে। রমেশচন্দ্র প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন "উন্নতির যুগ।" তিনি লিখেছেন "মনুষ্য সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, বৎসরের পর বৎসর ক্রমশ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে, এই উন্নতির ফল যেন পাঁচ সাত শতাব্দীর পর এক একবার বিকশিত হয়।" প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সভ্যতার ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। নদীর কূলে কূলে সভ্যতার "প্রথম জ্যোতি, প্রথম স্ফুলিঙ্গ।" চীন ও ভারত, গ্রীস ও রোম প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র। সভ্যতার "পঞ্চম পর্বে" মহম্মদ আরবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। এই পর্বের প্রায় সাত, আট শত বছর পরে আর একটি উন্নতির যুগ আসে। এই যুগে আকবর ভারতের সম্রাট। ইউরোপে লুথার "খ্রীষ্টীয় ধর্মের সংস্কার করিলেন, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, কোপনিকস ও গ্যালিলিও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিলেন, বেকন ও ডের্কাট বিজ্ঞানালোচনা করিলেন, ইংলণ্ডের কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়র প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হেতু জনসমাজে জ্ঞান বিস্তারের অনেক সুবিধা হইল।" দুইশত বছর পর আসে আর একটি উন্নতির যুগ—ফরাসী বিপ্লবের যুগ। উনিশ শতকে ইউরোপে জাতীয়তার অগ্রগতির মধ্যে তিনি প্রগতির পথে মানুষের অভিযান লক্ষ্য করেছিলেন। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি লিখেছেন :

"গ্রীকগণ স্বাধীনতা লাভ করিলেন, গারিবাল্ডি ইতালী স্বাধীন করিলেন, বিসমার্ক জর্মনী একীভূত করিলেন, সমস্ত জগতে মানব-স্বাধীনতার মহামন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগল।"[৬] প্রগতির ভাবধারায় তাঁর গভীর বিশ্বাস এই প্রবন্ধে প্রতিফলিত। নৈরাশ্যবাদীর কাছে

ইতিহাস অর্থহীন ; মহান্ ঐতিহাসিক তিনি যিনি ইতিহাসের ধারার মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধান পান, ইতিহাসের মধ্যে কিছু অর্থ খুঁজে পান। মানুষের নিয়তি পতন নয়, মানুষ প্রগতির পথে ধাবমান—এই বিশ্বাসে মহান ঐতিহাসিক উদ্বুদ্ধ। নিঃসন্দেহে রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-চিন্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরিণত বয়সে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ সালে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড এবং ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে বরোদায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। এদেশে তিনি প্রথম ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। ইতিহাসের এই নতুন শাখাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং জনপ্রিয় করবার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাসের দুই খণ্ড লিখিত। চিন্তার স্বচ্ছতা এবং রচনার প্রসাদগুণ পাঠককে আকৃষ্ট করে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ দুই খণ্ডেই প্রকাশিত। উনিশ শতকে বিকাশমান জাতীয়তাবাদী চিন্তার উপর তাঁর লেখার বিপুল অপ্রতিরোধ্য প্রভাব প্রতিভাত। দুই খণ্ডেই তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় বাণিজ্য, শিল্প, আর্থিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য। যে বিষয়টি দুই খণ্ডেই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা এবং ভূমি-কর। ভারতীয় লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তই প্রথম ভূমি-ব্যবস্থা বুঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। ভূমি-করের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা কেন্দ্রীভূত ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তিনি সমর্থক।

একটি যুগের শেষে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে চিন্তার ধারা পাল্টায়। সমসাময়িক চিন্তার আলোকে বিচার করলে তাঁর কোন কোন বক্তব্য রক্ষণশীল মনে হতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর মত, সেচ বনাম রেলওয়ে বিতর্ক, ব্যয় সঙ্কোচনের প্রতি তাঁর সমর্থন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। অর্থ-নৈতিক ইতিহাসের আধুনিক ছাত্রের মনে আজ নতুন জিজ্ঞাসা। অধুনা অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষণা নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। তবু বলা চলে রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক ইতিহাস উৎসাহী পাঠকের আজও অবশ্য পাঠ্য।

পাদটীকা

১। নিখিল সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত : প্রবন্ধ সংকলন।

২। নিবেদিতার প্রবন্ধ, Modern Review, January 1910 ; রমেশচন্দ্র দত্তের এই বই তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯-৯০ সাল।

৩। রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্‌বেদের দেবগণ, নিখিল সেন, ঐ।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য, নিখিল সেন, ঐ।

৫। ঐ

৬। রমেশচন্দ্র দত্ত, উন্নতির যুগ, সাধনা, চৈত্র, ১২৯৯।

৭। লণ্ডনে ১৮৯৭ থেকে ১৯০৪ সন পর্যন্ত তিনি গবেষণায় কাজ চালিয়ে যান; ১৯০৩ সনে বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তকে তিনি লিখেছিলেন: "The great work before me is the second volume of my Economic History, and if I can finish that in the present year my life's literary work is done!" জে. এন. গুপ্ত, Life and Works of Ramesh Chandra Dutt, 1911.

৮। রমেশচন্দ্র দত্তের অর্থনৈতিক ইতিহাসের চর্চা সম্পর্কে বর্তমান লেখক আলোচনা করেছেন "রমেশচন্দ্র দত্ত" বইটিতে, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৬।

ডেভিড হেয়ার

(১৭৭৫-১৮৪২)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

যে ক'জন বিদেশী মহানুভব ও পরহিতৈষী ব্যক্তি বাঙলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রকার উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার অন্যতম। নিঃস্বার্থভাবে আমাদের দেশের হিতসাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। নিষ্কাম কর্মের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি।

তাঁর জন্ম হয়েছিল সুদূর স্কটল্যাণ্ডে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুআরি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি কলকাতায় এসে ঘড়ির ব্যবসায়ে লিপ্ত হন; কিন্তু তাঁর মন কেবল ব্যবসাতেই সীমাবদ্ধ রইল না, ধীরে ধীরে অন্যদিকেও আকৃষ্ট হল। পরে দেখা গেল তিনি তাঁর মাতৃভূমির চেয়ে আমাদের দেশকে যেন বেশী ভালবাসেন এবং এখানকার অধিবাসীদের তাঁর অপরিসীম স্নেহের এবং ভালবাসার আবেষ্টনে পরমাত্মীয়ে পরিণত করেছেন। তাই ব্যবসা থেকে অবসর নেবার পরেও তিনি এদেশেই অবশিষ্ট জীবন কাটালেন এবং এখানকার কল্যাণে তাঁর সময়, শ্রম ও অর্থ অকৃপণভাবে নিয়োজিত করলেন।

আমাদের দেশ তখন অনেক বিষয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে ছিল; ইওরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্জন্ম হয় তার প্রভাব এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রতিফলিত হয়নি। শেষোক্ত শতাব্দীতে ভারতে বিশেষতঃ বাঙলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এখানে ছিল নানারকম কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি মধ্যযুগীয় এবং শিক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎবর্তী। তখন উচ্চশিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা ছিল সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় সীমাবদ্ধ. বাঙলাভাষা ছিল ভীষণ অবহেলিত এবং বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে পরিবর্তনের সূচনা হতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিল নব জাগরণ। শিক্ষা, সাহিত্য, ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির অনেক পরিবর্তন হতে আরম্ভ হল। যাঁরা সে সময়ে প্রথমে শিক্ষার কাজে বিশেষ ভাবে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেভিড হেয়ারও এদেশে এসে কয়েক বৎসরের মধ্যে এ কাজে হাত দিলেন।

ব্যবসা সূত্রে এখানকার বহুলোকের সঙ্গে হেয়ারের পরিচয় ঘটে। অনেকের সঙ্গে

তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশে বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। তিনি নিজেই বলেছেন "এদেশে কিছুদিন থাকার পর কিছু সংখ্যক অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝতে পারলাম শিক্ষা ব্যতিরেকে হিন্দুদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য হবে না। তখন আমি ভারতের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করলাম এবং সরকারের ও সমাজের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্মতি ও সমর্থন পেয়ে শিক্ষার উন্নতি কল্পে সচেষ্ট হলাম।"

ঘড়ির ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং সেই অর্থ তিনি এখানে জনকল্যাণ-মূলক কাজে মুক্তহস্তে ব্যয় করেছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি মিঃ গ্রে-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে তিনি ঘড়ির ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২] এর পরে তিনি তাঁর অভীপ্সিত শিক্ষার উন্নতি বিধানের অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে অধিকতর সময় অতিবাহিত করতে থাকেন।

একটা কথা তাঁর সম্বন্ধে সময় সময় শোনা যায়—তিনি নাকি শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু কার-এর জনশিক্ষা-সংক্রান্ত রিপোর্টে জানা যায়—"সাধারণ বিষয় সমূহে ভালো শিক্ষা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি মোটামুটি বিস্তৃত ছিল। ...আমাদের শ্রেষ্ঠ রচনাকারদের কারো কারো লেখা তিনি পড়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত লোক হিসাবে তিনি পরিচিত হতে পারতেন কিন্তু তাঁর সারল্য ও আন্তরিকতার জন্যই তা হয়নি। এই সব গুণ ছিল তাঁর সহজাত, এদের জন্যই তিনি প্যাণ্ডিত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠিতে পেরেছিলেন"।[৩] তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন, যাঁর শিক্ষার অভাব তাঁর এই সোসাইটির সভ্য হওয়ার কথা ভাবা যায় না। এটা নিশ্চয়ই তার শিক্ষারই পরিচয় বহন করে। ১৮৩৫ সনে ৮ই জুলাই টাউন হলে বিচারে জুরি প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব আলোচনায় যে কমিটি গঠিত হয় তিনি এর কেবল সভ্যই ছিলেন না, তার জন্য উপযুক্ত আইনের খসড়া তৈরী করা কিংবা গর্ভনর-জেনারেলের কাছে আবেদন-পত্রের সঙ্গে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব পাঠানোর কাজেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এরকম নানা ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় তিনি শিক্ষিত ছিলেন।

১৮১৩ সনের ইংরেজ কোম্পানীর সনদে শিক্ষার জন্য বার্ষিক অন্যূন একলক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ থাকলেও পরের কয়েক বৎসরের মধ্যেও কোম্পানী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তেমন কিছুই করে নি। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ১৮২৩ সনে গঠিত হয় Committee of Public Instruction। এখানকার জনশিক্ষায় যখন সরকার এরূপ অমনোযোগী তখন আমরা দেখতে পাই হেয়ারকে একাজে ব্রতী।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুআরি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে এই কলেজই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এখানকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রধানতঃ এই যুবকদের ব্যক্তিত্ব,

কর্মধারা এবং কৃতিত্বে ক্রমে বাঙলায় এক নব যুগ প্রতিষ্ঠিত হয়। গতানুগতিকতার পরিবর্তে এল অনুসন্ধানী মনোভাব এবং যুক্তিপূর্ণ সমালোচকের দৃষ্টি, —সব কিছুই সঙ্গতভাবে যাচাই করে নেবার স্পৃহা। এই নব জাগরণে নিঃসন্দেহে হেয়ারের বিশেষ দান রয়েছে।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় কে বা কারা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এই নিয়ে বহুকাল যাবৎ মতবিরোধ চলছে। হেয়ার এ কলেজের উন্নতির জন্য যে অনেক কিছু করেছেন তা অনস্বীকার্য কিন্তু এর পরিকল্পক কে এই নিয়েই মত-বিরোধ। এ বিষয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, তবে একটু উল্লেখ না করলে এ লেখা অসম্পূর্ণ হয়। The Calcutta Christian Observer নামে একটি মাসিক পত্রিকায় ১৮৩২ সনের জুন ও জুলাই সংখ্যায় লেখা থেকে জানা যায় হেয়ার এ কলেজের পরিকল্পক।[৪] পরে প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রও বলেন তিনিই এর প্রথম পরিকল্পনা করেন।[৫] রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-১৮৯৯) অভিমত তিনি হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁর এই অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন ১৭৯৬ শকে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর প্রকাশিত পুস্তকে—'সে কাল আর একাল'।[৬] কিন্তু পরে আরও কতকগুলি মূল্যবান প্রামাণ্য সমসাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে উপরিউক্ত মতের পরিবর্তন সঙ্গত মনে হয়।

স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর বাসায় তাঁর সভাপতিত্বে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে যে সভা হয় তাকেই এই কলেজ সম্পর্কে প্রথম সভা ধরা হয়। এই সভার পরে এই মাসের ১৭ তারিখে স্যার হাইড ঈস্ট বোর্ড অব কণ্ট্রোল-এর সভাপতি আর্ল অব্ বাকিংহ্যামশায়ার (Earl of Buckinghamshire)-কে যে পত্র দেন তার একটি নকল (হাতে লেখা) কিছুদিন আগে বর্তমান বাঙলাদেশ রাজ্যের জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এ, এফ, সালাহ-উদ্দিন আহমদ পেয়েছেন· লণ্ডনস্থ বিদেশে গস্‌পেল প্রচারের সোসাইটির দপ্তরখানায় বহু পুরাতন দলিলপত্রের মধ্যে। এই পত্র থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় হিন্দু সম্রান্ত নেতৃবৃন্দ এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে গিয়েছিলেন।

স্যার হাইড ঈস্ট লিখছেন, "A proposition was brought to me about a fortnight ago.., signifying that many of the leading Hindoos are desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner as practised by Europeans of condition and desired me to lend my aid towards it, by having a meeting held under my sanction...... ......The meeting was held at my House on the 14th of May, at which about 50 and upwards of the most respectable Hindoo Inhabitants attended, including the principal Pundits,"

হেয়ার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ এই পত্রটিতে নেই। ১৮ই মে হ্যারিংটন সাহেবকে তাঁর লেখা চিঠিতেও হেয়ারের নাম নেই। তাঁর ২১শে মে ১৮১৬, ২৮শে মে ১৮১৭, ২৮শে এপ্রিল ১৮১৮, এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮১৮ তারিখের চিঠিতেও এই সম্বন্ধে নূতন কিছু পাওয়া যায় না।[৯]

১৮১৬ সনের ২১শে মে প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি-তেও হেয়ারের নাম নেই। তিনি পরিকল্পক হলে তাঁর নাম এর মধ্যে না থাকার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এসিয়াটিক সোসাই-টির ১৯৭৫ সনের এপ্রিল মাসের Communique-এ একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন। এটি হল ১৮১৬ সনে Chaplain T. T. Thompson-এর একটি চিঠি। এটি ১৮২৩ সনে মিঃ সার্জেন্ট (Mr. Sargent) প্রণীত Cnaplain Thompson-এর জীবনী-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—"the great subject of schools for natives has been discussed by the Europeans but at length gained the attention of the natives."

এতে দেখা যায় এ-দেশীয়দের বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় ইওরোপীয়গণই আগে আলোচনা করেছেন। তাঁরা (বাঙ্গালী হিন্দুরা) কয়েকবার তাঁকে অনুরোধ করেছেন হিন্দু-দের একটি কলেজের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করতে। তিনি এতে সম্মত না হ'য়ে প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈস্ট-এর কাছে তাঁদের যেতে বলেছেন। তাঁদের প্রস্তাবে স্যার হাইড ঈস্ট সম্মত হন ও তাঁদের একটি সভা আহ্বান করেন। কিন্তু এখানেও আমরা হেয়ারের কোন উল্লেখ পাইনা।

১৮২৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান ঐ আদালতের গ্র্যাণ্ড জুরির উদ্বোধন কালে প্রসঙ্গতঃ বলেছিলেন, "That institution (হিন্দু কলেজ) first set on foot through the intervention of Sir Hyde East."

১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ছাত্রগণের নিকট থেকে হেয়ার তাঁর জন্মদিনে যে অভি-নন্দন-পত্র পেয়েছিলেন তাতেও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতে তাঁর যুক্ত থাকার কোন কথা নেই।

হেয়ারের জীবনী-প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্রের এক পত্রের জবাবে এই কলেজের নথি-পত্র দেখে রাধাকান্ত দেব তাঁকে জানান যে এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হেয়ার যুক্ত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ তিনি পাননি। কাজেই আমরা বেশ বুঝতে পারি তিনি এ কলেজের পরিকল্পক ছিলন না।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁকে লেখা হয়েছিল, "Sir, your judgment in matters of education and friendly regard towards literary Institutions induce us to request the favour of you to become a visitor of the Hindoo

College. We shall feel infinitety obliged by your inspecting it at your convenience and communicating such hints and observations as may occur to you for its improvement."

রাধাকান্ত দেব উপরিলিখিত পত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রকে জানিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠানটি যাতে আপন লক্ষ্য সাধনে সফল হয় সে জন্য হেয়ার এর দিকে ক্রমশ তাঁর সমস্ত সময় ও মনোযোগ নিয়োজিত করেন এবং জন-সাধারণের চোখে প্রশংসনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ সনে তিনি এই কলেজের একজন ডিরেক্টর মনোনীত হন এবং আমৃত্যু তিনি ঐ পদে ছিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এর কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। হিন্দু কলেজের পরিকল্পক না হলেও এ-কলেজের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ও এ দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর আন্তরিক প্রয়াস এবং অকৃত্রিম ঐকান্তিকতা তাঁকে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কীর্তি আপন মহিমায় চির-ভাস্বর।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটী ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার উভয়ের উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮২৩ সনে স্কুল সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি স্কুল বুক সোসাইটিকে বার্ষিক একশত টাকা চাঁদা দিতেন।

কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের পরিচালনায় কলকাতার বাইরে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটীর মত যে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল তাতেও হেয়ার চাঁদা দিতেন।

কলকাতা স্কুল.সোসাইটির বিবরণীতে হেয়ারের আংশিক ও সম্পূর্ণ পরিচালনে যে তিনটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হোল সিমলা ও আরপুলি পাঠশলা এবং পটলডাঙ্গা স্কুল। সিমলা পাঠশালা ছিল তাঁর নিজের, আরপুলি পাঠশালাও তিনি নিজেই স্থাপন করেন ১৮১৮-১৮১৯ সনে। এটি ছিল দরিদ্র ছেলেদের জন্য অবৈতনিক। পটলডাঙ্গা স্কুল প্রথমে স্কুল সোসাইটি ও হেয়ার উভয়ের অর্থে চলত, পরে সোসাইটি এর পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।[১৭] সোসাইটির সর্ববিধ কাজেই হেয়ার ছিলেন এর প্রাণস্বরূপ। যে সব গরীব মেধাবী ছাত্রকে সোসাইটি নিজব্যয়ে হিন্দু কলেজে পড়াত তাদের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর উপরে ন্যস্ত হয় ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি। এ-কাজ এবং সোসাইটি পরিচালিত পরীক্ষার তত্ত্বাবধান ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোন নূতন পন্থা অবলম্বন প্রভৃতি সমস্ত দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল। এর অর্থের প্রয়োজনে প্রধানতঃ তাঁর উদ্যোগেই ১৮২৩ সনে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠান হয়। আবার, ১৮২৮ সালে এর আর্থিক দুর-বস্থার সময়ে তিনি সোসাইটিকে এককালীন ছয় হাজার টাকা দান করেন।

এখানে হেয়ারের অপর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোল দীঘির উত্তর দিকে তাঁর নিজস্ব জমিটুকু তিনি অল্প মূল্যে বিক্রি করেন সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজ ভবনের জন্য।

সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের কি রকম ঝোঁক ছিল তা বোঝা যায় ট্রেভেলিয়ানের একটি উক্তি থেকে। তিনি বলেছেন যে স্কুল বুক সোসাইটি দু'বৎসরের মধ্যে ইংরেজী বই একত্রিশ হাজারের ওপরে বিক্রি করেছে, অপর পক্ষে কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্স্ট্রাক্শন তিন বছরে যা আরবি ও সংস্কৃত বই বিক্রি করেছে তাতে তাদের ছাপান'র খরচ ওঠা তো দূরের কথা, এমন কি তাদের দু'মাসের রাখার খরচও ওঠে নি।[১৩]

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এখানকার ছাত্ররা স্বাধীনভাবে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন ও তাঁদের সৃষ্ট অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়শনে হেয়ারও অনেক সময়ে উপস্থিত থেকে তাঁদের বিতর্ক মন দিয়ে শুনতেন। শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও ছিলেন এর সভাপতি ; তাঁর পদত্যাগের পরে হেয়ার এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

হেয়ার ছিলেন অত্যন্ত ছাত্র দরদী, তাঁর স্নেহ ও মমতার অন্ত ছিল না। তাদের পড়াশুনা, নৈতিক চরিত্র গঠন, খেলা ধূলা প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল, এমন কি পলাতক ছাত্রদের গোপন আড্ডার জায়গা থেকে ধরে নিয়ে এসে তিনি সুপথে পরিচালিত করেছেন। অসুস্থ ছেলেদের কেবল বিনা মূল্যে ঔষধ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হ'তেন না তাদের রোগশয্যায় সেবা শুশ্রূষাও করেছেন। তাই ছাত্ররাও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দুঃস্থ ছাত্র ব্যতীত বহু দরিদ্র ব্যক্তিকেও তিনি অকাতরে সাহায্য দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষায় ও মহান আদর্শে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে অনেক কৃতী সন্তান বাঙলাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি হেয়ারের জন্মদিন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ঐ দিন হিন্দু কলেজ ও স্কুল সোসাইটির ছাত্ররা তাঁকে একটি সুন্দর অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। ভাষায় মনের ভাব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলার তাঁর ক্ষমতা ছিল, নীরবে কাজ করাই তিনি ভালবাসতেন এবং যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তার অগ্রগতিতে তিনি খুশী বোধ করছিলেন।

ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে তিনি যেমন জোর দিতেন তেমনি ভালভাবে বাঙলা শিক্ষার উপরেও তাঁর নজর ছিল। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই উপযুক্ত বই যাতে রচিত হয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক বাংলায় অনূদিত হয় এ সবের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। কাজের মধ্যেই তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন, কোন বাদ-বিসম্বাদে যেতেন না—এমন কি শিক্ষা নিয়ে Anglicists ও Orientalists এর মধ্যে যে বিরোধের ঢেউ উঠেছিল তাও তিনি পরিহার করে চলেছিলেন। শিক্ষার সমস্ত গঠন-মূলক কর্মে তাঁর কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত হ'ত। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার তিনি ছিলেন সম্মানিত পরিদর্শক এবং নিয়মিত ভাবে এর সভায় উপস্থিত থাকতেন। কলকাতা

মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল এবং ছাত্র সংগ্রহ ও অন্যান্য অনেক কাজে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ ব্রামলী বলেছিলেন, হেয়ারের প্রভাব ব্যতীত মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত।[১৪] তাঁরই প্রচেষ্টায় মধুসূদন গুপ্ত সর্বপ্রথম মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদের কার্যে অগ্রসর হন।[১৫] ১৮৪৭ সনে অধ্যক্ষ ব্রামলি মারা গেলে হেয়ার কলেজ কৌনিসলের সেক্রেটারী হন এবং তাঁর অনুরোধে ১৮৩৮ সনের ১লা এপ্রিল কুড়িটি শয্যা-বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা বিষয়ে তাঁর প্রয়োজন উপলব্ধি করে তাঁকে কলেজ কৌন্সিলের "অনারারী মেম্বর" করা হয়।

শুধু শিক্ষায় নয় সেকালের প্রায় সমস্ত জনকল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গে হেয়ার জড়িত ছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে তিনি নিয়মিত সাহায্য দান করতেন। ভারতীয় শ্রমিকদের মরিশাস ও বুর্বোতে পাঠানোর ব্যাপারে তাদের ওপর যে জোর-জুলুম হত তার বিরুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিচারে জুরি প্রথা প্রবর্তনের জন্য এবং প্রেস নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন রহিত করার জন্যও তাঁর বিশেষ প্রয়াস ছিল।

জনশিক্ষা সমিতির সেক্রেটারী এবং হিন্দু কলেজের পরিদর্শক জে, সি, সি সাদারল্যাণ্ডের একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে জনশিক্ষা সমিতি হিন্দু কলেজের ও সাধারণভাবে এদেশের শিক্ষার স্বার্থে হেয়ার বছরের পর বছর ধৈর্য সহকারে যে অমূল্য অবদান করেছেন তার সরকারী স্বীকৃতি দেবার জন্য গভর্নর জেনারেলের নিকটে যে অনুরোধ করে তার ফলে তাঁকে ১৮৪০ সনে কলকাতার ছোট আদালতের (Court of Requests) তৃতীয় কমিশনর পদে নিযুক্ত করা হয়।[১৬]

কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী কর্মময় জীবনের অকস্মাৎ ছেদ পড়ল কলেরা রোগে। ১৮৪২ সনের ৩১ মে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হন এবং পরদিন পরলোক গমন করেন। অগণিত কর্মের মধ্যে তিনি যেমন শান্ত ও অবিচলিত থাকতেন. মৃত্যু অনিবার্য বুঝতে পেরেও তিনি তেমনই শান্ত ও অবিচলিত ছিলেন। তিনি সর্দার বেয়ারাকে বললেন, "যাও, মিঃ গ্রে-কে বল, আমার জন্য একটি কফিন তৈরী করতে।"

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের অশ্রু বিসর্জনের মধ্যে তাঁকে সমাহিত করা হয় গোল দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, "থ্যাকারের এসমণ্ডে ক্যাস্‌ল্‌উডের মন্ত্রী মিঃ বেন্‌সন যেমন বলেছিলেন আমিও কেবল সেভাবে বলতে পারি—কর্নেল-এর ধর্মমত কি ছিল আমি তা জানি না, কিন্তু তাঁর জীবন ছিল একজন যথার্থ খ্রীষ্টানের জীবন।"[১৭]

হেয়ার এ-দেশে যে অকৃত্রিম সেবার মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন ও অনগ্রসর

মানবের মধ্যে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত করে ছিলেন তা আমাদের নিকট এখনও অম্লান রয়েছে তাঁর জন্মের দু'শত বৎসর পরেও আমরা তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের কথা স্মরণ করে নিজেদের যারপরনাই ধন্য মনে করি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একই সুরে বলতে পারি,

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

পাদটীকা

১। The Government Gazette, 21 February, 1831, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৬৯।

২। The Government Gazette (Supplementary), January 6, 1820; উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৬৮।

৩। A Biographical Sketch of David Hare, Pearychand Mittra. 1949 Edition pp. 43-44; 'ডেভিড হেয়ার' বাঙলা অনুবাদ, সম্পাদনা সুশীলকুমার দাশগুপ্ত।

৪ The Calcutra Christian Observer (Calcutta),

৫। A Biographical Sketch of David Hare (Appendix B, p. XXX) by Pearychand Mittra.

৬। রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একাল"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬।

৭। "Futham Papers 1813-27, Archives of the Society for the Propogation of the Gospel in Foreign Parts. 15, Tufton Street, London, S. W. I."—Nineteenth Century Studies, Calcutta, January, 1975, p. 145

৮। Nineteenth Century Studies, Calcutta, January, 1975, pp. 146-47

৯। Nineteenth Century Studies, pp. 152-160

১০। On Rammohan Ray, Dr. R. C. Majumdar p. 27.

১১। The India Gazette, June 14, 1830, যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৭৭-৭৮।

১২। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৭১। পটলডাঙ্গা স্কুল পরিশেষে হয় "হেয়ার'র স্কুল।"

১৩। An Advanced History of India by R. C. Majumdar, H. C. Ray Chaudhuri and K. K. Datta, p, 812.

১৪। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৯২।

১৫। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ,' পৃঃ ১৪৬।

১৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

১৭। A Biographical Sketch of David Hare by Peary Chand Mittra, p. 127.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ডেভিড হেয়ার দ্বিশতজন্মবার্ষিকী সভায় পঠিত।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীহারাধন দত্ত

হরিমোহন ও বাঙলা সাহিত্য

উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্যে 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১) পত্রিকার আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানিকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে বঙ্গবাসীর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। পরবর্তী দশকেও বঙ্গবাসীর প্রচার অব্যাহত থাকিলেও তাহার প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এবং ক্রমে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী ছাড়াও দৈনিক (১৮৮১), টেলিগ্রাফ, প্রথমে দৈনিক পরে সাপ্তাহিক (১৯০৪), হিন্দী বঙ্গবাসী, সাপ্তাহিক (১৮৯০), জন্মভূমি (মাসিক, ১৮৯০), প্রভৃতি সাময়িক পত্রসমূহ বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত। এতৎব্যতীত বঙ্গবাসীর প্রকাশন বিভাগ (শাস্ত্র-প্রকাশ) বঙ্গসাহিত্যের গৌরব। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গসাহিত্যের এই কালক্রমকে 'বঙ্গবাসী যুগ' নামে অভিহিত করা যায়। বঙ্গবাসী সংশ্লিষ্ট লেখকগণের অবদান ও কৃতিত্ব বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যথাযথ আলোচনা হয় নাই। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাসী যুগের ব্যক্তিত্বধর্মী লেখক ছিলেন।

গত শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার দেশবাসীর কাছে অবিমিশ্র কল্যাণ বহন করিয়া আনে নাই। হিন্দুর ধর্ম-দর্শন-সমাজ-সাহিত্য বিপন্ন হইয়াছিল। ইংরাজীয়ানা বা সাহেবীয়ানা নামক উৎকট নব্যতার তোষামোদ করিয়া খাঁটি বাঙালী, খাঁটি হিন্দু মেকী সাহেবে পরিণত হইয়াছিল। এই যুগসঙ্কটে 'বঙ্গবাসী' হিন্দুর মুখপত্রস্বরূপ দেশের এই অনুকরণসর্বস্ব বিলাতিয়ানার বিরুদ্ধে আত্মঘোষণা করে। নব্যপন্থীদের চোখে এই রক্ষণশীলতা নিন্দিত হইলেও বঙ্গবাসীর এই সর্বাত্মক অভিযান দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির সংরক্ষণে ও পরিবর্ধনে অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্গবাসীর এই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা মনে না রাখিলে বঙ্গসাহিত্যে হরিমোহনের যথার্থ অবদান নির্ণীত হইবে না। হরিমোহন বঙ্গবাসীর সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক ছিলেন ইহা তাঁহার যথার্থ পরিচয় নয়। বঙ্গবাসীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া ওঠে। বঙ্গবাসীর আদর্শ তাঁহার নিজেরও আদর্শ ছিল। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে

স্মরণ করিয়া তিনি তৎপুত্র বরদাপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"আপনি বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি আমার প্রতিপালক ছিলেন। আপনিও আমার প্রতিপালক। পরন্তু আপনি আমায় বড়ই ভালবাসেন ভক্তি করিয়া থাকেন। আমি আপনার বহুগুণে মুগ্ধ ; কিন্তু দরিদ্র। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদই, সম্বল। আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিয়া, আশীর্ব্বাদী স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে অর্পণ করিলাম। আমি জানি হিন্দুর দেশে হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হউক ; বিলাসস্রোত মন্দীভূত হউক, ইহা আপনার আন্তরিক ইচ্ছা। তাই পল্লীগ্রামের আধুনিক অবস্থার দর্পণ স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনার করে অর্পণ করিয়া আজ আমি অতিমাত্র তৃপ্ত ও কৃতার্থ।"[১৪]

বাঙলা সাহিত্যে হরিমোহনের সৃষ্টিশীল রচনা বেশী নহে। গদ্য-পদ্যময় রঙ্গ-রসিকতায়, শ্লেষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, রসালভাষার গাঁথুনিতে ও চুটকি বোলচালে তিনি সিদ্ধহস্ত। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায় তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা এ-যুগেও আদর্শ ও অনুকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বঙ্গবাসী পত্রিকার অন্যতম গৌরব ইন্দ্রনাথের 'পঞ্চানন্দ'। পঞ্চানন্দের শ্লেষাত্মক, বিদ্রূপাত্মক রসরচনা বহুকাল ধরিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষত্ব ছিল। "ইন্দ্রনাথ বহুকাল 'বঙ্গবাসীতে' পঞ্চানন্দ লিখিয়াছিলেন ও পরে যখন বার্দ্ধক্যবশতঃ এবং গুরুতর কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য পঞ্চানন্দ লিখিতে পারিতেন না, তখন নানা জনে পঞ্চানন্দ লিখিতেন। ইন্দ্রনাথ আর পঞ্চানন্দ লিখিতে পারিতেন না।"[১৫] বঙ্গবাসীতে পঞ্চানন্দ লিখিবার জন্য ইন্দ্রনাথ বহু শিষ্য-প্রশিষ্য গড়িয়াছিলেন। যতদিন বঙ্গবাসী প্রচারিত ছিল ইন্দ্রনাথের এই সব সাহিত্যিক শিষ্যগণ পঞ্চানন্দ লিখিতেন। হরিমোহন বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় অজস্র পঞ্চানন্দ লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সেই সমস্ত রচনা গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় নাই। রায়সাহেব বিহারীলাল সরকার হরিমোহনকে রসরচনা নিপুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬]

বঙ্গবাসী জন্মলগ্ন হইতেই কংগ্রেস-বিরোধী। হরিমোহন বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় রাজনীতি, হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ-বিষয়ক অজস্র নিবন্ধ লিখিয়া সেকালের পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। আবার সমালোচক ও নিবন্ধকার রূপে হরিমোহন বঙ্গবাসী-যুগের স্মরণীয় লেখক। হরিমোহন কবিতা-গল্প যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

গীত রচনাতে হরিমোহন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাহিত্যসেবক-জীবনের উন্মেষপর্ব হইতে তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্গবাসী, দৈনিক, প্রভৃতি পত্রে প্রায়শঃ প্রকাশ করিতেন। সঙ্গীত রচনা-ক্ষেত্রে তিনি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সমৃদ্ধ দেশজ ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। ১৩৩২-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ মধ্যে লিখিত, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত পূজা-পার্বণ-দেহতত্ত্ব-কীর্ত্তন-বাউল রামপ্রসাদী ধরনের বেশ কিছু সঙ্গীত একখানি ফাইলে রাখিয়া 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' নাম দিয়াছিলেন। এই ফাইল অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত "বাঙ্গালীর

গান" (১৩১২) গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন ধরনের ছয়খানি সঙ্গীত সঙ্কলিত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ ও বিলাতি পণ্য বর্জনের যুগেও তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন। বিলাতি পণ্য বর্জনের যুগে রচিত তাঁহার একখানি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

সইলো, শোন্‌লো হুজুগ ভারি।
বিলিতি বন্ধ হলো, সিকেয় উঠলো জারি জুরি।
মোমগড়া ফুল মোহন ফিতে
কোথায় পাবি খোঁপায় দিতে।
রাঙ্গা মুখের রুজ কোথা আর।
পমেটমের ভাইলো ভুরি ॥
খোস্‌বো ভরা খাসা সাবান।
বাজারে আর পাবে না স্থান ॥
এই বার খোল বেসমে অঙ্গ জলুস।
করতে হবে ফুল কুমারী।
এসেন্সে বিবিয়ানা মন মজানো আর হবে না,
এখন গাজিপুরেই সখের নেশা
ভাঙ্গতে হবে প্রাণের প্যারী ॥
পরী আঁকা গিল্‌টি বাহার
আইনাও সই পাবি না আর
এখন মুরগী হাটার মোটা আর্শী,
শরণ নিতে হবে তারি।
চাঁদচুড় বিলিতি চুড়ী
আর আসবে না ঝুড়ি ঝুড়ি,
এখন, যা করে সই, উড়ুতি বাজার
দিশী কামার আর শাঁখারি।
শোন্ শোন্, ওলো হাবি,
জ্যাকেট ; বডিস্ কোথায় পাবি,
এবার মুখটি বুজে, কুর্তি এঁটে
পড়তে হবে জোলার শাড়ী ॥[১৭]

কিন্তু হরিমোহনের এই সব কীর্তি বর্তমান কাল পর্যন্ত পৌঁছে নাই। তথাপি বঙ্গ সাহিত্যে দেশজ সঙ্গীতের অনুরাগী ও গীতিকার রূপে হরিমোহন স্মরণীয় থাকিবেন।

হরিমোহনের স্বদেশানুরাগ বড় প্রবল ছিল। তিনি আমৃত্যু স্বদেশ ও স্বজাতির

হিত চিন্তা করিয়াছেন। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ স্বদেশবৎসল হিন্দু। বিলাতি পণ্যবর্জনের যুগে তিনি "স্বদেশী সামগ্রী" (প্রথম সংগ্রহ) পুস্তক রচনা করিয়া বঙ্গবাসী-প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করেন। 'শিবাজীর ভবানী পূজা' নামক কাব্য-নাটকে তিনি স্বাধীন হিন্দু ভারতবর্ষের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন। উচ্চভাবুকতাপূর্ণ এই কাব্য-নাটকে হরিমোহনের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গবাসী' বঙ্গদেশে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করে তাহার সর্বগ্রাসী প্রভাব আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হয়। স্বদেশ-সাধনার এই যজ্ঞে হরিমোহন সারস্বত কর্মের দ্বারা তাহা পুষ্ট ও ঋদ্ধ করিয়া তোলেন।

হরিমোহনের সাহিত্য-সাধনার অবিসম্বাদিত কীর্তি তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থগুলি। সঙ্গীতসার সংগ্রহ, সঙ্গীত-তরঙ্গ, বঙ্গভাষার লেখক, দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও গোপাল উড়ের টপ্পা এই পাঁচখানি গ্রন্থের জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সঙ্গীত-সংগ্রহ, হরিমোহনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। উনবিংশ শতকের অন্তিম গোধূলিলগ্নে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি বাঙলার বিস্মৃত ও প্রায়-বিলুপ্ত সঙ্গীত কুসুমগুলিকেই নয়—তাঁহার সমকালীন যুগের রবীন্দ্রনাথ হইতে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ও বিহারী-লাল সরকার পর্যন্ত প্রায় একশত পনের জন কবির সঙ্গীত সঙ্কলন করিয়াছেন। সঙ্গীত রচয়িতা-গণের জীবনী সন্নিবেশিত হওয়ায় এই সঙ্কলন আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে হরিমোহনের অধ্যবসায়. নিষ্ঠা ও গবেষক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে পরবর্তীকালে দুর্গাদাস লাহিড়ীর সম্পাদনায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'বাঙ্গালীর-গান' নামক প্রামাণ্য সঙ্গীত-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নিবেদনে, গ্রন্থ-সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী পূর্বসূরী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম হইতে উনবিংশ শতকের শেষ অবধি বাঙলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার ফলে বাঙলা গানে ধ্রুপদী লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। ফলতঃ উনবিংশ শতকে কবি, হাফ-আখড়াই, শাক্তসঙ্গীত, যাত্রাগান, পাঁচালী গানেও তাহার প্রভাব পড়ে। গানের বাণীর সঙ্গে রাগিণীর সমন্বয় এ যুগের সঙ্গীত সাধনার বৈশিষ্ট্যের দিক। হরিমোহন কেবল-মাত্র প্রাচীন বাঙলা গানের বাণীতেই মুগ্ধ ছিলেন এমন নয়, বাঙলা সঙ্গীত-বিজ্ঞান বা সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। উনবিংশ শতকে সঙ্গীত-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি রচিত হয়। তিনি নিজেও সঙ্গীতশাস্ত্রনিপুণ ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার বন্যাবেগে যখন দেশীয় সাহিত্য-সঙ্গীতও অনাদৃত হইতে চলিয়াছিল সেই যুগে বঙ্গবাসীর লেখক-সম্প্রদায় হিন্দুর ঐতিহ্য সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত রাধামোহন সেনদাসের 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' বঙ্গভাষায় সঙ্গীত-বিজ্ঞান বিষয়ক একখানি বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ। রাধামোহন সেনদাসের জীবিতাবস্থায় অর্থাৎ ১২২৫ বঙ্গাব্দে 'সঙ্গীত-তরঙ্গে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রাধামোহনের মৃত্যুর পর

তাঁহার পৌত্র আদিনাথ সেনদাসের অনুমত্যানুসারে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৫৬ বঙ্গাব্দে। সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর পরে ১৩১০ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গবাসী কার্যালয়' হইতে 'সঙ্গীত-তরঙ্গের' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে গ্রন্থ-সম্পাদক রাধামোহন সেনদাসকৃত অন্যান্য সঙ্গীতও সঙ্কলন করিয়াছেন। গ্রন্থসম্পাদনার অনুসৃত রীতি এ যুগেও অনুকরণীয়। 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' সম্বন্ধে হরিমোহন যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য : "ইহাঁর অভিধা "সঙ্গীত-তরঙ্গ" হইলেও, ইহার অভিধেয় সঙ্গীতবিজ্ঞান। সঙ্গীতবিজ্ঞানে যে সমুদায় বিষয়ের পরিপাটি পর্যালোচনা—সুশৃঙ্খল সন্নিবেশ একান্ত প্রয়োজনীয়, এই সঙ্গীত-তরঙ্গগ্রন্থে তৎসমস্তই স্তরে স্তরে সুসজ্জিত; যেন বিশ্বশিল্পীর কারুকৌশলে,—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভারে সংরচিত। চলোর্ম্মিচঞ্চল সুনীল সাগরতটে অভ্রভেদী বন্ধুর বপু গিরিরাজীর সন্নিবেশ দৃশ্যে যে চিত্ত-স্তম্ভকর গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, এই সঙ্গীততরঙ্গ গ্রন্থে কোথাও বা সেইরূপ গম্ভীর ভাবরাশি, পূর্ণরূপে দেখিতে পাইবেন,—আবার মল্লিকা মালতী, গোলাপ গন্ধরাজ, যুথী-সেউতি প্রভৃতি প্রফুল্ল ফুলকুল সুবাসিত—মাধবীলতা পরিবেষ্টিত মন্দমারুত পরিসেবিত নিকুঞ্জকাননের যে চিরমধুর বাসন্তীশোভা, সে শোভা সুষমার শান্তিরসও এই সঙ্গীততরঙ্গগ্রন্থে চিত্তমোহন-রূপে প্রভাবিত। ফলে ইহা যেন সর্ব্বোপকরণ বিমণ্ডিত একখানি চারুদর্শন করণ্ডিকা। যাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে চাহেন, যাঁহারা সঙ্গীতবিজ্ঞানে অধীত-বিদ্য হইতে চাহেন, যাঁহারা—(?)র্ত্তি, প্রত্যেক রাগরাগিণীর প্রভেদতত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, যাঁহারা স্বভাবসুন্দর কান্তপদ প্রমোদিত সুমধুর সঙ্গীতরত্নে সমৃদ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে এই 'সঙ্গীততরঙ্গ' গ্রন্থ তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। প্রাণধারণ-কল্পে অন্ন এবং জল যেরূপ প্রত্যেক মানুষের একান্ত আবশ্যকীয়, সঙ্গীত রসরসিকের পক্ষে এ গ্রন্থও তদ্রূপ একান্ত অপরিহার্য্য।"[১৮] সঙ্গীততরঙ্গ সম্বন্ধে হরিমোহনের এই মন্তব্যের মূল্য একালেও এতটুকু কমে নাই। সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক বিলুপ্তপ্রায় এই অপূর্ব গ্রন্থখানির প্রচার করিয়া তিনি সে-যুগে বাঙালীর গৌরব ঋদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বাঙলার বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীত সম্পদ্ সংরক্ষণে হরিমোহনের বহুধা-কীর্তির আর এক নিদর্শন, 'গোপাল উড়ের টপ্পা' অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে হরিমোহ-নের সম্পাদনায় 'গোপাল উড়ের টপ্পা' বঙ্গবাসী কার্যালয়·হইতে প্রকাশিত হয়। সাবেক বাঙলা গান লোপ পাইতেছে, সঙ্গীতচর্চা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, ভাল গান এখন আর তৈয়ারী হইতেছে না—এমনতর আক্ষেপ সেকালের সঙ্গীতামোদী বাঙালী-জনের মুখে প্রায়শঃ শোনা যাইত। 'গোপাল উড়ে টপ্পা'র ভূমিকায় হরিমোহন আক্ষেপের সুরে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসুন্দরের গান বা গোপাল উড়ের টপ্পা আমরা বুঝি হারাইতে চলি-লাম।" বস্তুতঃপক্ষে হরিমোহনের যুগেও স্বদেশীয় সঙ্গীতচর্চা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল।

রামনিধি গুপ্ত বাঙলা টপ্পা গানের প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ। রামনিধিগুপ্ত ও বাঙলা টপ্পা গানের ঐতিহ্য-বিষয়ক মূল্যবান গবেষণা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।[১৯] রামনিধি গুপ্ত প্রবর্তিত এই টপ্পা গোপাল উড়ের যাত্রাগানে আরও সহজ ও সাবলীলভাবে অনুসৃত হইয়া বাঙলা গানের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। হরিমোহন এই গ্রন্থে 'গোপাল উড়ের' ৪৩২ খানি গান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় গোপাল উড়ের জীবন-বৃত্তান্ত পরিবেশন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া, এই গোপাল উড়ের টপ্পা লিপিবদ্ধ করিলাম। যে মল্লিকার মালা,—একদিন বাঙ্গালার পণ্ডিত মূর্খ সমভাবে কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিয়াছিলেন, সেই মালা কি আজ অনাদরে উপেক্ষিত হইবে? জঞ্জালরাশির ভিতর লুক্কায়িত থাকিবে?" বাঙলার প্রাচীন সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে হরিমোহনের আত্যন্তিক অনুরাগের ফলেই গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের গান অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

পাঁচালীকার দাশরথি রায় ছিলেন প্রাচীন কাব্যধারার শেষ সংরক্ষক। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর ঘটে। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও গীতাবলী পল্লীবাঙলার সুদূরতম, নিভৃততম কোণেও বহু প্রচলিত হইয়াছিল। দাশরথি রায়ের বাক্‌শিল্পের সজীব ও সক্রিয় অংশ তাঁহার গানগুলি। গীতসংবলিত ও সুরসংযোগে আবৃত্ত বিবৃতিমূলক আখ্যান-কাব্যকে পাঁচালী নামে অভিহিত করা হইত। ইহাতে সুরাশ্রয়ী আবৃত্তিই প্রধান, গীতাংশ গৌণ ছিল। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে সম্ভবতঃ দাশরথির অভিনব প্রয়োগ-কৌশলে পাঁচালী নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। দাশরথি রায়ের পালাসংগ্রহ কাব্য-সম্পাদন ও জীবনী রচনায় শ্রদ্ধাশীল লেখক বা সমালোচকের অভাব হয় নাই। এই সূত্রে রাজকিশোর দে, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল শীল, অরুণোদয় রায়, গৌরলাল দে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই দাশরথির পালা প্রকাশ, কাব্য-সমালোচনা এবং জীবনী প্রণয়নের দ্বারা বাঙালী পাঠকের সঙ্গে দাশরথির যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দাশরথির পালা ও সঙ্গীত সংগ্রহে, কাব্যসমালোচনায় ও জীবনী সঙ্কলনে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। দাশরথি রায়ের জীবৎকালেই ১৮৪৮ ও ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ খণ্ডে তাঁহার অনেকগুলি পালা বিন্যস্ত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র পালা ও সঙ্গীত সঙ্কলনের কৃতিত্ব হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের। ১২৮০ বঙ্গাব্দে চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত প্রণয়ন করেন। 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী'-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থমধ্যে দাশরথি রায়ের ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি জীবনী ও বংশতালিকা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্য ও সঙ্গীতাদির সংরক্ষণে বঙ্গবাসীর অবদান অসামান্য। বঙ্গবাসী প্রেসের অরুণোদয় রায় ১৩০৪ (ইং ১৮৯৭) বঙ্গাব্দে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর প্রথম খণ্ড এবং ১৩০৫ (ইং ১৮৯৮) বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৩০৯ (ইং ১৯০২) বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাসী'র সহ-সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় অতিশয় যত্ন ও নিষ্ঠাসহকারে দাশরথির ৬০ খানি পালা সংগ্রহ করিয়া দাশরথি রায়ের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ বাহির করেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে হরিমোহন পাঁচালীর পালাগুলির ব্যাখ্যা বাহির করার এক অসম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৫ (ইং ১৯১৮) বঙ্গাব্দে। এই সংস্করণে ৬৪ খানি পালা সঙ্কলিত হয়। দাশরথি রায়ের পাঁচালীর চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩১ (ইং ১৯২৪) তৃতীয় সংস্করণের উন্নততর রূপ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দাশরথি রায়ের পাঁচালীর এই চতুর্থ সংস্করণকে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সংস্করণ বলা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠান্তরসহ দাশরথি রায়ের সমগ্র পাঁচালীর প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।[২০] কিন্তু তাহাতেও হরিমোহনের গ্রন্থের মূল্য কমে নাই, বরং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থখানিকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডক্টর শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী দাশরথি রায় ও তাঁহার পাঁচালী সম্বন্ধে অতিশয় মূল্যবান্ গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া একালের বাঙালী পাঠকের সঙ্গে দাশরথিকে নূতন করিয়া পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন।[২১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা নিবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীচক্রবর্তীর এই গবেষণা বিশেষ মূল্যবান্ রূপে বিবেচিত হইবে। তৎসত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে দাশরথির অবদান নির্ণয়ে তাঁহার জীবনী-উদ্ধারে, পালা সংগ্রহে এবং পালা সমূহের প্রামাণ্যতা নির্ণয়ে হরিমোহন মুখো-পাধ্যায় গ্রন্থ সম্পাদনে যে নিষ্ঠা, শ্রম, অনুসন্ধান ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা এ-কালের পণ্ডিতম্মন্য প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকগণের কাছে অনুকরণীয় আদর্শরূপে বিরাজমান থাকিবে। তাঁহার অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা, বিষয়বস্তুর সামগ্রিক উপস্থাপনা, সর্বোপরি তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গবেষণা জগতে এক স্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিরাজ করিবে।

প্রাচীন বাঙলা গান ও গীতকারদের জীবনী সংরক্ষণের কাজে উনবিংশ শতকের রক্ষণশীল বাঙ্গালীরা প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন; অবশ্য দেশীয় কবিতা ও গান সম্পর্কে হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরও আগ্রহ কম ছিল না। দেশীয় কবিতা-গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ। 'On Bengali Works and Writers[২২] নামক নিবন্ধে কাশীপ্রসাদ ঘোষ অন্যান্য কবিদের সঙ্গে রাধামোহন সেনদাস রচিত গানের অনুবাদ এবং আলোচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাচীন গান ও প্রাচীন কবিজীবনের সংরক্ষণে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। এই সূত্রে বটতলার লেখক ও প্রকাশকগোষ্ঠীর কাছেও বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তীযুগে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়[২৩] মনোমোহন বসু[২৪] বৈষ্ণবচরণ বসাক[২৫] প্রভৃতি লেখকবৃন্দের সাহিত্যকীর্তি অনুসন্ধান করিলে এই সংরক্ষণশীলতা প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইঁহাদের পরে প্রাচীন কবি ও গীতিকারদের সম্পর্কে নিষ্ঠাসহকারে গবেষণা করিয়াছিলেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। এ বিষয়ে হরিমোহনের ব্যাপক গবেষণা ও সারস্বত কর্ম পরবর্তী যুগে বঙ্গসাহিত্যের গবেষণা-ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত-ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক।

বাঙলার সঙ্গীত-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন অথবা এতৎবিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণা কর্মে হরিমোহন তাঁহার সারস্বত সাধনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। বাঙলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারকল্পে বঙ্গীয়-লেখক সম্প্রদায়ের জীবনী সঙ্কলন ও বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের গৌরব অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি, 'বঙ্গভাষার লেখক : ১ম ভাগ' (বঙ্গবাসী ১৩১১) নামক বিপুলায়তন গ্রন্থখানির কথা স্মরণ করিতেছি। হরিমোহনের এই গ্রন্থখানি পরবর্তীকালের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ও গবেষক সমাজকে বহু অমূল্য উপকরণ যোগান দিয়াছে। হরিমোহন ৮ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া চণ্ডীদাস হইতে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ২১২ জন বঙ্গ সাহিত্যসেবীর প্রামাণ্য জীবনেতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এত নিষ্ঠাসহকারে বঙ্গভাষার লেখক-সমাজের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু হরিমোহনের পরিকল্পনা ছিল 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ন। তাঁহার সে আশা পরিপূর্ণ হয় নাই। ফলতঃ বঙ্গসাহিত্যের বহু লেখকের জীবন-সাধনা ও কীর্তির কথা আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। তিনি প্রথম ভাগের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "যাঁহাদের জীবনী প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইল না, তাঁহারা বুঝিবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহা প্রকাশিত হইবে। কেবল মাত্র গ্রন্থকারের জীবনী নহে, দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন এবং অধুনাতন সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং তত্তৎ সম্পাদকের জীবনীও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গালা সাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক কথা দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইতেছে।"[২৩] 'বঙ্গভাষার লেখক' বঙ্গ সাহিত্যের কালানুক্রমিক ইতিহাস নহে। হরিমোহনের পূর্বেই মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গভাষার ইতিহাস : প্রথম ভাগ, সংবৎ ১৯২৮)। রমেশচন্দ্র দত্ত (The Literature of Bengal, 1874)। রামগতি ন্যায়রত্ন (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১ম ভাগ, ১৮৭২, ঐ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে, ১৮৭৩), রাজনারায়ণ বসু (বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, ১৮৭৮), কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (বাঙ্গালা সাহিত্য, ১২৯২) প্রভৃতি অনেকেই বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যথার্থ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইতে আরও বিলম্ব ঘটে। হরিমোহনের 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থখানি প্রকাশের অন্ততঃ ৮ বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

প্রকাশিত হয়। বাঙলাসাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন দীনেশচন্দ্র সেন। হরিমোহনের 'বঙ্গভাষার লেখক' তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃত্য। বঙ্গের প্রাচীন কবি ও লেখকবৃন্দের জীবনী সঙ্কলনে তিনি যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন, গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার আভাস আছে। বঙ্গসাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থখানির মূল্য আজিও এতটুকু কমে নাই। বিপিনবিহারী গুপ্ত দুইটি পর্যায়ে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১৩২০, ১৩৩০) এবং 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', দুইটি খণ্ড (১৩২১, ১৩২৪) প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়াছেন। হরিমোহন 'বঙ্গভাষার-লেখক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এইরূপ স্মৃতিকথা রচনার প্রবর্তন করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া জীবনবৃত্তান্ত পরিবেশন করেন। এতৎব্যতীত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ন, বিহারীলাল সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক লিখিত জীবনবৃত্তান্ত 'বঙ্গভাষার লেখক'-এ প্রকাশিত হয়। এদিক হইতে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বিপিনবিহারী গুপ্তের পূর্বসূরী ছিলেন।

জন্মাবধি দরিদ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মন-প্রাণ দিয়া সাহিত্যসেবার সুযোগ পান নাই। বঙ্গবাসী কার্যালয়ে পত্রিকা সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালন এবং অন্যতর বহুবিধ কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারস্বত চর্চার যে ফসল তিনি বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে উপহার দিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য অপরিসীম। হরিমোহন এ যুগে প্রায়-বিস্মৃত। তাঁহার পুস্তক ও গ্রন্থাদি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ৭১ বৎসর পরেও গ্রন্থখানির দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় নাই। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে বিস্মৃতির করালগ্রাস হইতে তাঁহাকে মুক্ত করা যাইবে। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত বিবিধ বিষয়ের অনেকগুলি রচনা, কবিতা ও গান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার যে তালিকা প্রণয়ন করিয়াছি বর্তমান নিবন্ধের সহিত তাহা যুক্ত করি নাই।*

১৪ নকুড়বাবু (১৩১৬), আশীর্বাদী
ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী (বঙ্গবাসী ১৩৩২)
বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১) পৃ. ৯২৪
১৭ দুর্গাদাস লাহিড়ী। বাঙ্গালীর গান (১৩১২)
১৮ সঙ্গীত তরঙ্গ (১৩১০)। গ্রন্থের পরিচয়। পৃ. ১-২
১৯ রমাকান্ত চক্রবর্তী। বিস্মৃত দর্পণ (১৩৭৮)
২০ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী (১৯৬২)।
২১ শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী। দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী (১৩৬৭)।
২২ Literary Gazette. 6. Feb. 1830.
২৩ ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী। ১ম ভাগ ২য় সং (১৮৮৬)
ঐ ২য় ভাগ (১৮৮৬)
২৪ মনোমোহন গীতাবলী (১২৯৩)
২৫ বিশ্বসঙ্গীত (১২৯৯) দোহাবলী (১৩০৫), গীতাবলী, ২য় সং (১৩০৩)
২৬। বঙ্গভাষার লেখক (বঙ্গবাসী ১৩১১) ভূমিকা, ৶০

* এই নিবন্ধ রচনায় হরিমোহনের একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীকালীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় বর্তমান লেখককে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শ্রীকালীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিগত ৩১।১২।৭৪ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে

(১৭৫২-১৮২৫)

শ্রীমদনমোহন কুমার

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকার স্মিথসোনিআন ইনস্টিটিউশন (Smithsonian Institution) কলিকাতার রামদুলাল দে (সরকার) মহাশয়ের একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য ইউনাইটেড স্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস (United States Information Service) মারফৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ৬৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত একখানি পুস্তক হইতে রামদুলাল সরকারের একখানি ছবি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ করেন এবং ইউ. এস. আই. এস. ঐ ছবিখানির কয়েকটি আলোকচিত্র লইয়া আমেরিকায় প্রেরণ করেন। কয়েক মাস পরে পরিষৎ-সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রাচীন-গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে পরিষৎ-সদস্য শ্রীসুব্রত কুমার রামদুলালের আর একখানি ছবি খুঁজিয়া বাহির করেন। ইউ. এস. আই. এস. ঐ গ্রন্থখানি লইয়া গিয়া তাহা হইতেও রামদুলালের কয়েকটি আলোকচিত্র প্রস্তুত করাইয়া আমেরিকায় প্রেরণ করেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ 'স্প্যান' SPAN পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্টীফেন এস্পী (Mr. Stephen Espie) কলিকাতায় আসিয়া পরিষৎ-সম্পাদকের বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন এবং রামদুলাল সরকার সম্বন্ধে আলোচনার পর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া ৫ সেপ্টেম্বর পরিষৎ-সম্পাদককে রামদুলাল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ SPAN পত্রিকার জন্য লিখিতে অনুরোধ করেন। ১৯৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে SPAN পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কের সূত্রপাত ঐ প্রবন্ধটিতে আলোচিত হইয়াছে।

রামদুলাল সম্বন্ধে যে-সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মাতৃভাষায় প্রকাশের জন্য পরিষৎ-সভাপতি জাতীয় আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দেন।

শিল্প ও বাণিজ্য জাতির সংস্কৃতির অঙ্গ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্বীপময় ভারতে, দূর প্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রসৃত হয়। দুই শত বৎসর পূর্বে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

রামদুলাল দে

(১৭৫২ - ১৮২৫)

[পুরাতন উড্ এনগ্রেভিং হইতে]

পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এবং গত দুই শত বৎসরের ইতিহাসে সেই সম্পর্ক ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রসারিত হয়।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে সমুদ্রপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে পোর্তুগীজদের আগমনের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসিস্, আরমেনিয়ান, য়ীহুদী প্রভৃতি জাতির বণিকদের হাতে ভারতের বহির্বাণিজ্য চলিয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বঙ্গের নৌবাণিজ্য কিভাবে বিদেশী বণিকদের আক্রমণে ও অত্যাচারে সপ্তদশ শতকে বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহার বাস্তবাশ্রিত সাহিত্যিক রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে।

সমুদ্রপথে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের করতলগত হওয়ার পর ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান্ মশলা, রেশম, সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র, মসলিন, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, নীল, চা, সোরা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে। চীন ও ভারতবর্ষ হইতে প্রধানত এই সামগ্রীগুলি ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে ও ইউরোপে নীত হইত।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিনে, ৩১ ডিসেম্বর, ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর বৎসর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার অবলুপ্তি (liquidation)। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি ঐতিহাসিক যোগ আছে।

মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্পেন অনেকগুলি সম্পন্ন উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। স্পেনের সহিত ইংলণ্ডের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা সুবিদিত। আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলির সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক অগ্রগতি ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ভার্জিনিয়া অঞ্চলে জেমস্‌টাউনে প্রথম ব্রিটিশ বাণিজ্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভার্জিনিয়া অঞ্চলে তামাকের চাষ ও সেখান হইতে তামাক রপ্তানিতে ইংরেজ বণিকরা বিশেষ লাভবান্ হয়। বহু ইংরেজ আমেরিকায় ভাগ্যান্বেষণে যায়। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশ হইতে তামাক, চাউল ও নীল ইংলণ্ডে আসিতে থাকে এবং বিদেশে রপ্তানি হইতে থাকে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি প্রচুর গম উৎপাদন করে—ন্যু ইয়র্ক হইতে এক বৎসরে ৮০,০০০ বুশেল ময়দা (১ বুশেল = ২২১৯·৩৬ কিউবিক ইঞ্চি) ইংরেজরা রপ্তানি করে। আমেরিকার আদিম অরণ্য হইতে জাহাজ-নির্মাণের উপযোগী মূল্যবান্ সুদৃঢ় কাঠ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হয় এবং আমেরিকার কয়েকটি ব্রিটিশ উপনিবেশ জাহাজ-নির্মাণে অগ্রসর হয়। ফলে ন্যু ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধ বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাণিজ্যের প্রসার দ্রুতগতিতে ঘটিতে থাকে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীর এক-তৃতীয়াংশই ছিল আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশে নির্মিত।

মার্কিন বাণিজ্যতরীর নাবিকেরা দক্ষ ও চতুর ব্যবসায়ীরূপে খ্যাতি অর্জন করে।

স্পেন ও ফরাসী-অধিকৃত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমেরিকার বাণিজ্যতরী আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। মার্কিন উপনিবেশ হইতে আলকাতরা, পিচ, রজন প্রভৃতি জাহাজ-নির্মাণের দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড হইতে ভারতে ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতে থাকে।

ডাচ্ বণিকদের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করেন যে, আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি কেবলমাত্র ব্রিটিশ বাণিজ্য-তরণীতে তাহাদের মাল পাঠাইতে পারিবে ও ব্রিটেন হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ব্রিটিশ বাণিজ্য-তরণীতেই আমদানি করিতে পারিবে। মার্কিন উপনিবেশ-গুলি এই আদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে, আইন অমান্য করে। ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল—উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য তাহাদের উৎপন্ন পণ্য মাতৃভূমিতে প্রেরণ করিবে ও সেখান হইতে বহির্বিশ্বে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে এবং গ্রেট ব্রিটেনের সংগৃহীত ও উৎপন্ন পণ্য মার্কিন উপনিবেশগুলি আমদানি করিবে। অপর পক্ষে মার্কিন উপনিবেশগুলির ক্রমবর্ধমান জনমত ছিল যে, তাহাদের অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বাণিজ্য-আইন (Mercantile Laws) অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা ইংরেজ বণিকদের মাধ্যম ছাড়াই আমেরিকায় উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে খুশি রপ্তানি করিবে, যে কোনও দেশ হইতে সরাসরি পণ্য আমদানি করিবে, আমেরিকার কাঁচামাল হইতে পণ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিবে এবং সেই উৎপন্ন সামগ্রী তাহারা যেখানে খুশি ও যাহাকে খুশি সর্বোচ্চ লাভে বিক্রয় করিবে। ফলে, মার্কিন বণিক ও নাবিকেরা ব্রিটিশ সরকারের আইন লঙ্ঘন করিয়া অবাধে সুদূর-প্রসারী গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। সংক্ষেপে, ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় ছিল মার্কিন উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে না এবং মার্কিন বণিকদের দাবি ছিল স্বাধীন উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে তাহাদের অধিকার খর্ব করা চলিবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বৎসরে, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, আইরিশ অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ্ (Adam Smith)-এর *Wealth of Nations* গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, ঐ গ্রন্থে তিনি অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন উদ্যোগের সমর্থন করেন; মার্কিন বিপ্লবের অন্যতম নায়ক Jefferson ঐ গ্রন্থখানিকে "greatest book on political economy extant" বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রন্থখানি মার্কিন বিপ্লবের চিন্তানায়কদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

মার্কিন বিপ্লবের পূর্বেই বহু মার্কিন নাবিক আমেরিকায় নির্মিত ব্রিটিশ বাণিজ্য-তরীতে কলিকাতা বন্দরে আসিত কিন্তু ভারতের সহিত সরাসরি বাণিজ্যিক লেন-দেনের সুযোগ মার্কিন বণিকদের ছিল না। কলিকাতার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাঙ্গালী 'বেনিয়ান' (Banian) ও শিপ সরকারেরা (Ship Sircar) এই সকল মার্কিন নাবিকদের

সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আঠারো উনিশ বৎসর বয়সের এমনই একজন শিপ্ সরকার রামদুলাল দে (১৭৫২-১৮২৫ খ্রীঃ) মার্কিন বিপ্লবের কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা বন্দরে মার্কিন নাবিকদের সহিত পরিচিত হন এবং কালে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ হন। ছয় বৎসর বয়সে পিতৃ মাতৃহীন, নিঃস্ব রামদুলাল কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া প্রথমে ৫৲ বেতনে তাঁহার বিল-সরকার ও পরে ১০৲ বেতনে শিপ-সরকারের কাজে নিযুক্ত হন। নিমতলার দত্ত পরিবারের মদনমোহন দত্ত তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Export Warehouse-এর দেওয়ান ছিলেন এবং ঐশ্বর্য্যে তিনি রবার্ট ক্লাইবের দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ ও ফরাসী বণিকদের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য-সামগ্রী মার্কিন উপনিবেশগুলিতে নীত হয়। পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পরে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দারুণ সংকট দেখা দেয়—কোম্পানির পতন ঘটিবার উপক্রম হয়। ১৭,০০০,০০০ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) পাউণ্ড ওজনের মজুদ অবিক্রীত চা কোম্পানিকে প্রায় দেউলিয়া করিয়া তোলে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেউলিয়া হইলে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব ও ট্যাকস বাবদ বিপুল ক্ষতির অনিবার্য্য সম্ভাবনা এড়াইবার জন্ম ব্রিটিশ সরকার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রক্ষার জন্য মার্কিন উপনিবেশগুলিতে কয়েকটি শর্তে কোম্পানিকে চা বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার দিলেন। শর্তগুলি কোম্পানির পক্ষে এমনই অনুকূল ছিল যে, কোম্পানি তাহাদের মজুদ অবিক্রীত চা আমেরিকার খরিদ্দারদের প্রদত্ত তিন পেনি চা-কর ('three-pence tea tax') সত্ত্বেও পূর্বাপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইল, কিন্তু মার্কিন জনগণের নিকট পণ্য-মূল্য অপেক্ষা বাণিজ্য-নীতি অধিক গুরুত্ব লাভ করিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অতি দ্রুত কয়েক হাজার পেটি চা আমেরিকায় প্রেরণ করিল, কিন্তু এক পেটি চা-ও গ্রাহকদের হাতে পৌছাইল না। মেরীল্যাণ্ডে Maryland-এ চায়ের পেটি-সমেত জাহাজ ভস্মীভূত হইল। ১৬ ডিসেম্বর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বস্টন বন্দরে ৩৪২ পেটি 'অভিশপ্ত পাতা' ('Cursed weed') সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া মার্কিন বিপ্লব ত্বরান্বিত করিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কয়েকটি দমনমূলক আইন প্রণয়ন করিলেন, মার্কিন জনগণ প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ পণ্য সম্পূর্ণ বর্জন (boycott) করিলেন: অসহযোগ (non-cooperation), রপ্তানি বন্ধ (non-exportation) এবং ব্রিটিশ পণ্যের ব্যবহার বর্জন (non-consumption)—তিনটি প্রতিজ্ঞা মার্কিন জনগণ গ্রহণ করিলেন। এপ্রিল ১৭৭৫ হইতে জুলাই ১৭৭৬ ঘটনা-প্রবাহ যুদ্ধের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্ব-ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করিল। ভার্জিনিয়ার উপকূলে ইয়র্কটাউনে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সম্মিলিত মার্কিন সৈন্যবাহিনীর নিকট ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিশ পরাজিত হইয়া ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭৮১ আত্মসমর্পণ করিলেন এবং এই সংবাদ লণ্ডনে পৌছিলে হাউস অফ্

কমন্স যুদ্ধ অবসানের প্রস্তাব পাস করিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিলেন।

মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে ও পরবর্তী কয়েক বৎসরে মার্কিন উপনিবেশ-গুলিতে সুদূর-প্রসারী অর্থনৈতিক পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘটিতেছিল—যাহার ফলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আমেরিকা কালে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক হইয়া উঠিল। পূর্বে ইংলণ্ড হইতে ও ইংলণ্ডের মাধ্যমে আমেরিকা যে সমস্ত পণ্য আমদানি করিত সেগুলি এই কয় বৎসরে তাহারা স্বদেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ও কারখানায় উৎপাদন করিতে সক্ষম হইল এবং ইংরেজ বণিকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেরাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাধীন আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইল। বহির্বাণিজ্যের বিরাট পথ মার্কিন উপনিবেশগুলির নিকট উন্মুক্ত হইল। আমেরিকার বাণিজ্য-পোত বল্টিক সমুদ্রে ও চীন সমুদ্রে লাভজনক ব্যবসায়ে সফল হইল। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'Empress of China' জাহাজখানি বহু মূল্যবান্ পণ্য-সামগ্রী দূর প্রাচ্যে বহন করিল এবং এশিয়ার বাজারে আমেরিকা প্রবেশ করিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর মন্দা ১৭৮১ হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় সংকটের সৃষ্টি করিল। ব্রিটেনের বিপুল মজুদ মালে আমেরিকার বাজার ছাইয়া গেল এবং নবজাত মার্কিন শিল্প-গুলি প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইল। ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৭ পর্যন্ত ইংরেজরা যেখানেই পারিল সেখানেই আমেরিকার বাণিজ্য-প্রসার প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করে এবং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই মার্কিন পণ্যে পূর্ণ আমেরিকার প্রথম বাণিজ্যতরী ভারতবর্ষে—কলিকাতা বন্দরে—সর্বপ্রথম আসিয়া পৌঁছাইল। কলিকাতার ব্রিটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি মার্কিন পণ্য-সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইল না। ভারতে মার্কিন বাণিজ্য যাহাতে প্রসার লাভ না করে সেজন্য ব্রিটিশ বণিকেরা পরোক্ষে চেষ্টা করিল। এই সংকট-সন্ধিক্ষণে স্বাধীন ব্যবসায়ে স্বপ্রতিষ্ঠ রামদুলাল দে মার্কিন বণিকদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দরিদ্র রামদুলাল আপন সততা অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তখন কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বণিকরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং দেশী-বিদেশী বাণিজ্যে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকারের পরেও বেশ কিছুকাল ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ওয়াশিংটন কলিকাতায় বেঞ্জামিন জয় (Benjamin Joy)-কে ভারতে আমেরিকার প্রথম কন্সাল রূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁহার কনস্যুলার পদমর্যাদা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কলিকাতায় এক বৎসর বসবাসের পর বেঞ্জামিন জয় তাঁহার পদ ত্যাগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে তৎকালীন সম্পর্ক ভারতে আমেরিকার বাণিজ্য-প্রসারের অনুকূল ছিল না।1

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আগত স্বাধীন আমেরিকার প্রথম বাণিজ্য-পোতের নাবিক

ও অন্যান্য কর্মচারীদের আনীত মার্কিন পণ্য রামদুলাল বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকট এবং তাঁহার নিজের কর্মচারী ও দালাল মারফৎ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করাইয়া দেন। রামদুলালের সততা, বিশ্বস্ততা, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও সৌজন্যে মার্কিন নাবিক ও কাপ্তেনরা মুগ্ধ হন। ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে রামদুলাল তখন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি। রামদুলাল মার্কিন নাবিক ও কাপ্তেনদের তাঁহার নির্বাচিত ভারতীয় পণ্য বিভিন্ন বাজার হইতে ন্যায্য মূল্যে কিনিয়া দেন এবং তাঁহাদের অনেককে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার জন্য মুক্ত হস্তে ঋণ দেন। বহু মূল্যবান্ ভারতীয় পণ্যে পূর্ণ মার্কিন বাণিজ্য-পোত যখন আমেরিকায় ফিরিয়া গেল তখন এই সকল অখ্যাত নাবিক, কাপ্তেন, কার্গো সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (Superintendent of Cargoes) ও নৌ-কর্মচারীগণ উচ্চমূল্যে ভারতীয় পণ্য আমেরিকার বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান্ ও ধনাঢ্য হইয়া উঠিলেন। এই সকল মার্কিন বণিক রামদুলালের অসাধারণ সততা ও ব্যবসায়িক দূরদর্শিতায় এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সরাসরি আমেরিকা হইতে রামদুলালের নিকট মার্কিন জাহাজে পণ্যদ্রব্য পাঠাইতেন এবং তাঁহার মারফৎ তাঁহারই নির্বাচিত ভারতীয় পণ্য আমেরিকায় আমদানি করিতেন। ফলে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন বন্দর হইতে বঙ্গোপসাগরের কূলে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য রামদুলালকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রসারিত হইল। মার্কিন বণিকমহলে রামদুলাল ভারতীয় বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ বিশারদ বা কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি—authority—রূপে খ্যাত হইলেন। রামদুলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ সালেম, বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও মার্বেলহেডের ৩৫ জন মার্কিন বণিক স্বেচ্ছায় অর্থ দান করিয়া জর্জ ওয়াশিংটনের (১৭৩২-১৭৯৯) জীবদ্দশায় তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পী গিলবার্ট স্টুয়ার্ট (১৭৫৫-১৮২৮)-কে দিয়া অঙ্কন করাইয়া রামদুলালকে উপহার পাঠান। এই অপূর্ব তৈলচিত্রখানি দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট ও প্রস্থে ৬ ফুট। বহুমূল্য সুদৃশ্য গিল্ট (guilt) ফ্রেমে তৈলচিত্রখানি মণ্ডিত। ওয়াশিংটনের শেষ জীবনে স্টুয়ার্ট-কর্তৃক অঙ্কিত এই তৈলচিত্রখানি (life portrait) মার্কিন জাহাজে, ওয়াশিংটনের মৃত্যুর এক বৎসর পরে, ভারতবর্ষে পৌঁছায় এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রামদুলালের হস্তে অর্পিত হয়।* রামদুলাল তাঁহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে

---

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ডের শেষে সম্পাদকীয় অংশে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত; ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭, পৃ. ৪২৬) ১৮৫৬ সনের ২১ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে রামদুলাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন: "...ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন।"

রামদুলালের মৃত্যুর ৩১ বৎসর পরে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত এই সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক নহে; ওয়াশিংটনের তৈলচিত্রখানি রামদুলালের গুণমুগ্ধ মার্কিন বণিকদের যৌথ উপহার— ফিলাডেলফিয়া নগরের এক বণিকের উপহার নহে।

১৪ মার্চ ১৮৬৮ হুগলী কলেজ হলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (Grish Chunder Ghose) 'Ram Doolal Dey, the Bengalee Millionaire' বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়। ওয়াশিংটনের তৈলচিত্রখানি 'Ashootosh Deb & Nephew's' ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। রামদুলালের দৌহিত্র শ্যামচাঁদ মিত্র, অনুপচাঁদ মিত্র, অতুলচাঁদ মিত্র তখন ঐ ফার্মের অংশীদাররূপে মার্কিন বণিকদের সহিত ব্যবসায় চালাইতেন।

Dr. John T. Reid প্রণীত *'Bridges of Understanding'* গ্রন্থের 'A Calcutta Merchant' প্রবন্ধে মার্কিন বণিকদের যৌথ উপহার রূপে প্রদত্ত এই তৈলচিত্রের উল্লেখ আছে।

সযত্নে এই চিত্রখানি রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরও বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার পুত্র ও দৌহিত্রগণ কর্তৃক তাঁহার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে এই দুর্লভ চিত্রখানি সগৌরবে রক্ষিত ছিল। পরবর্তী কালে এই তৈলচিত্রখানি রামদুলালের উত্তরাধিকারীগণ রামবাগানের দয়ালচাঁদ মিত্রকে বিক্রয় করেন, পরে দয়ালচাঁদের উত্তরাধিকারীগণ উহা পটল-ডাঙ্গার মল্লিকদের নিকট বিক্রয় করেন। এই তৈলচিত্রখানি হেমচন্দ্র বসু মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাসভবনে রক্ষিত ছিল। স্যর চার্লস ইলিয়ট বাঙলার ছোটলাট থাকাকালে ওয়াশিংটনের ঐ তৈলচিত্রখানি আশী হাজার টাকায় ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। স্টুয়ার্টের অঙ্কিত ওয়াশিংটনের চিত্রগুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—বিভিন্ন আমেরিকান আর্ট অ্যালবামে এগুলি দেখা যায়। কিন্তু রামদুলালকে উপহৃত ওয়াশিংটনের এই তৈলচিত্রখানি ঐগুলি হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। ওয়াশিংটনের অপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক অভিজাত মূর্তি—তাঁহার বাম কর তরবারির কোষের শীর্ষদেশে স্থাপিত এবং দক্ষিণ বাহু বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে প্রসারিত সেনাপতির প্রশস্ত কপাল, প্রতিজ্ঞা-দৃঢ় মুখমণ্ডলে আবেগের তীব্র উচ্ছ্বাস এবং তাহার মস্তকের যথাযথ বাস্তব প্রতিকৃতি গিলবার্ট স্টুয়ার্টের অঙ্কিত ওয়াশিংটনের অন্যান্য প্রতিকৃতি—যেগুলিতে সাধারণত ওয়াশিংটনের প্রশান্ত মুখচ্ছবি প্রতিফলিত সেগুলি—হইতে ইহাকে এক অভিনবত্ব দান করিয়াছে। এই তৈলচিত্রের একখানি ফটোগ্রাফ দেখার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সম্প্রতি রামদুলালের জনৈক বংশধরের নিকট অবগত হইলাম যে, এই অপূর্বসুন্দর মূল তৈল-চিত্রখানি তাহার অবিকৃত মূল্যবান সুদৃশ্য গিল্ট ফ্রেম সহ জনৈক আমেরিকান পর্যটক নব্বই হাজার টাকায় কিনিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছেন। এই চিত্রখানি এখন প্রকৃতপক্ষে কোথায় আছে তাহা জানিতে পারি নাই। তবে বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকেও যে ইহা কলিকাতায় ছিল তাহা নিশ্চিত।

রামদুলালের প্রতি আমেরিকানদের শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে জনৈক ধনী মার্কিন বণিক তাঁহার নবনির্মিত বাণিজ্য-জাহাজের নামকরণ করিয়াছিলেন 'রামদুলাল'। এই জাহাজখানি রামদুলালের জীবদ্দশায় কলিকাতা বন্দরে তিনবার রামদুলালের নিকট প্রেরিত পণ্যসামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল। 'রামদুলাল' নামটি সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক বলিয়া এই বিদেশী বণিক মনে করিয়াছিলেন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, তরুণ রামদুলাল যখন মাসিক ১০৲ বেতনে শিপ-সরকারের চাকরি করিতেন তখন একদিন তাঁহার মনিব ও আশ্রয়দাতা মদনমোহন দত্ত কলিকাতার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে 'টুলো অ্যাণ্ড কোম্পানি' (Tulloh & Company)-র অফিসে কতকগুলি পণ্য নীলামে খরিদ করার জন্য নগদ টাকা দিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করেন। রামদুলালের কিছু বিলম্ব হওয়ায় 'টুলো অ্যাণ্ড কোম্পানি'র অফিসে তিনি পৌঁছাইবার পূর্বেই ঐ পণ্যগুলি নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। রামদুলাল ক্ষুণ্ণ মনে অন্যান্য সামগ্রীর নীলাম দেখিতে থাকেন। ডায়মণ্ড হারবারের নিকটে নিমজ্জিত একখানি জাহাজ পণ্যসহ নীলামে বিক্রয়ের জন্য ওঠে। রামদুলালকে চাকার-

সূত্রে নদীপথে দেশী নৌকায় প্রায়ই ডায়মণ্ড হারবারে যাইতে হইত এবং নদীপথে বিভিন্ন বিদেশী পণ্যে পূর্ণ জাহাজের পণ্যসামগ্রীর আনুমানিক দাম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সহকর্মীদের সহিত আলোচনা করিতেন। এজন্য তাঁহার সহকর্মীরা অনেক সময়ে তাঁহাকে উপহাস করিতেন, 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে' তাঁহারা পরিহাস করিতেন। রামদুলাল কয়েক দিন পূর্বে গঙ্গার মোহানায় নিমজ্জিত এই জাহাজখানির পণ্যসামগ্রীর একটা হিসাব মনে মনে করিয়াছিলেন। সেই জাহাজখানিই নীলামে বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া তিনি কৌতূহলের সহিত নীলামের ডাক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন অতি সামান্য মূল্যে পণ্যসমেত ঐ জাহাজখানি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে তখন তিনি উহার জন্য চৌদ্দ হাজার টাকা দাম হাঁকিলেন। ঐ দরের উপরে আর কেহ নীলাম ডাকিতে সাহসী না হওয়ায় চৌদ্দ হাজার টাকা দামে রামদুলালের নামে নীলাম বহাল হইল। রামদুলাল নগদ চৌদ্দ হাজার টাকা জমা দিয়া টুলো কোম্পানির বিশ্রাম-কক্ষে—তামাক খাওয়ার ঘরে—গিয়া কাগজপত্রাদি সই সাবুদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে একজন ইংরেজ বণিক দ্রুতপদে নীলাম-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঐ নিমজ্জিত জাহাজ খরিদের জন্য আসেন। ঐ জাহাজ একজন বাঙ্গালী 'বাবু' চৌদ্দ হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হন। ঐ খরিদদারটি বিশ্রাম-কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন জানিয়া তিনি রামদুলালের নিকট আসেন এবং অল্প কিছু লাভ লইয়া জাহাজটি ছাড়িয়া দিতে বলেন। রামদুলাল অসম্মত হইলে 'নেটিব' খরিদ্দারকে ইংরেজ বণিকপুঙ্গব তর্জন-গর্জন ও ভীতি প্রদর্শন করেন। রামদুলাল বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার ক্রীত জাহাজ বিক্রয় করিতে অসম্মত হন। ভীতি প্রদর্শন ব্যর্থ হইলে ইংরেজ বণিকটি অনুনয়-বিনয়ের পথ গ্রহণ করিলেন। তীক্ষ্ন ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্পন্ন তরুণ রামদুলাল দর-দস্তুরের পর তাঁহার প্রদত্ত মূল্য চৌদ্দ হাজার টাকা, তদুপরি এক লক্ষ টাকা মুনাফা লইয়া তাঁহার ক্রীত জাহাজ ইংরেজ বণিকটিকে ছাড়িয়া দেন। রামদুলাল নগ্ন পদে যুক্ত করে মদনমোহন দত্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য, নীলামে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য, সমাধা করিতে না পারায় এবং মনিবের আদিষ্ট পণ্যসামগ্রী খরিদ করিতে না পারায় তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন এবং মদনমোহনের পদপ্রান্তে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা নগদ অর্পণ করেন। দরিদ্র ও সৎ রামদুলালের নিকট এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকাই তাঁহার মনিবের টাকা, কারণ মনিবের প্রদত্ত অর্থেই তিনি নিজ নামে নীলাম ডাকিয়াছিলেন, উহার এক কপর্দকেও তাঁহার অধিকার নাই। বিস্মিত মদনমোহন সাশ্রুনয়নে রামদুলালকে আশীর্বাদ করেন এবং রামদুলালকে এক লক্ষ টাকা দিয়া স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করিতে উপদেশ দেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে—আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঠিক এক বৎসর পূর্বে—রামদুলাল এই অর্থ লইয়া স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করেন এবং সততা, পরিশ্রম, তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের শিখরে ওঠেন। মদনমোহন

দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন রামদুলাল সরকার ততদিন প্রতি মাসের বেতনের তারিখে নগ্নপদে দত্ত মহাশয়ের আপিসে উপস্থিত হইয়া মাহিনার খাতায় সই করিয়া তাঁহার দশ টাকা বেতন গ্রহণ করিতেন—আশ্রয়দাতা মদনমোহনকে তিনি সারাজীবন আপন মনিব রূপেই সম্পদের শিখরে উঠিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসবে অনুষ্ঠানে ধনী রামদুলাল বরাবর নগ্নপদে মদনমোহন দত্তের গৃহে যাইতেন।

স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করার পর যে বিদেশী বণিকের সহিত বাণিজ্যিক লেন-দেনে রামদুলাল প্রথম লাভবান্ হন তিনি ছিলেন একজন পোর্তুগীজ, তাঁহার নাম কাপ্তেন হ্যানা (Captain Hannah)। কাপ্তেন হ্যানার প্রতি চিরকৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রামদুলাল প্রতি বৎসর হালখাতার সময় ক্যাপ্টেন হ্যানার নামে মহরতের টাকা ও লাভের অঙ্ক জমা করিতেন এবং হ্যানার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবাকে ও কন্যাদের রামদুলাল সারাজীবন মাসিক পেন্সন দিতেন। রামদুলাল ছিলেন কৃতজ্ঞতার মূর্ত প্রতীক। তাঁহার মাতামহের দারুণ অর্থসঙ্কটের সময় কিশোর রামদুলাল একবার অতি সামান্য টাকা ঋণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর একজন দোকানদার দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে সামান্য টাকা ঋণ দেন, এ-ঋণ ফেরৎ পাওয়া যাইবে না জানিয়াই তিনি ঋণ দিয়াছিলেন। সম্পন্ন রামদুলাল পরবর্তীকালে এই ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তিনি পরলোকগত জানিয়া তাঁহার পুত্রদের যাবজ্জীবন মাসিক পনের-টাকা পেন্সন দেন—দুঃসময়ে তাঁহার ঋণের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি স্বরূপ।

রামদুলাল বৈদেশিক বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী বণিকদের শীর্ষস্থানীয়—তাঁহার নিজস্ব চারখানি জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে সাগরপারের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্য বহন করিত এবং বিদেশ হইতে কলিকাতা বন্দরে পণ্য আনয়ন করিত। তাঁহার প্রথম জাহাজখানির নাম ছিল 'কমলা'—সাত বৎসর বয়সে মৃত তাঁহার জন্মান্ধ প্রথমা কন্যা কমলার নামে তিনি জাহাজের নামকরণ করেন। দ্বিতীয় জাহাজখানির নাম ছিল 'বিমলা'—তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত প্রিয়তমা কন্যা বিমলার নামে * তৃতীয় জাহাজখানির নাম ছিল 'ডেভিড ক্লার্ক' (David Clarke)—কলিকাতার বিখ্যাত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ফেয়ার্লি ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রধান অংশীদার ও রামদুলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডেভিড ক্লার্কের নামে; এই ডেভিড ক্লার্কের অনুরোধেই স্বাধীন ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত রামদুলাল ফেয়ার্লি ফার্গুসন কোম্পানির বেনিয়ান-পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রসারে সহায়তা করেন। চতুর্থ জাহাজখানির নাম 'রামদুলাল'—তাঁহার নিজ নামে। রামদুলালের এই চারখানি জাহাজ আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন, মাল্টা, মরিসাস্, যবদ্বীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ, ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত। কলিকাতা বাজারে রামদুলালের মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার

* ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ কার্ত্তিক (১৮২৬ খ্রীঃ) বিমলার যেদিন মৃত্যু হয় ঠিক সেইদিন ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে 'বিমলা' জাহাজখানি সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। একজন মার্কিন ক্যাপ্টেন 'বিমলা' জাহাজখানির একটি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবকে পাঠান, বেলঘরিয়ার বাগানবাড়ীতে দীর্ঘকাল ঐ তৈলচিত্রখানি ছিল, পরে যোড়াসাঁকোর হরচন্দ্র ঘোষ উহা ক্রয় করেন।

পণ্য ধারে কেনা-বেচা হইত। ডেভিড ক্লার্ক রামদুলালের পশার-প্রতিপত্তি-সততায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ফেয়ার্লি ফার্গুসন কোম্পানির বেনিয়ান পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং রামদুলাল তাঁহার নিজস্ব ব্যবসায় দেখাশোনা করিয়াও ফেয়ার্লি ফার্গুসন কোম্পানির বাণিজ্য-প্রসারে সহায়তা করেন, ফলে ঐ কোম্পানি তৎকালে ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠে। ডেভিড ক্লার্কের সহিত রামদুলালের সারাজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা ছিল একবার মুমূর্ষু রামদুলাল গঙ্গাযাত্রা করিয়া যখন গঙ্গাতীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তখন ডেভিড ক্লার্ক সংবাদ পাইয়া প্রখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক ডাক্তার নিকলসন (Dr. Nicholson)-কে লইয়া গঙ্গাতীরে ছুটিয়া আসেন এবং গঙ্গাতীরে তাঁহার চিকিৎসায় রামদুলাল আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন ও আরোগ্য লাভ করেন।

বিদেশী বণিকদের সহিত রামদুলালের বাণিজ্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্র অভিনব বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। রামদুলাল বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান নাই, ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ হইতেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন, বাল্যকালে নিঃস্ব রামদুলালের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে নাই। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমানে কলিকাতার বিমান-বন্দর দমদমের নিকট, "রেকজানি" গ্রামে অতি দরিদ্র এক কায়স্থ-পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা বলরাম সরকার গ্রামের পাঠশালায় দরিদ্র চাষা-ভূষার সন্তানদের বাঙ্‌লা ভাষা, বাঙ্‌লা হাতের লেখা ও অঙ্ক শিখাইতেন। ছাত্রদের কাহারও বেতন দিবার সামর্থ্য ছিল না। ধান, চাল, খড়, কলাই ইত্যাদি তাহারা গুরুদক্ষিণা দিত। বলরাম চাষীদের কাহারও বলদ ধার করিয়া উদ্বৃত্ত শস্য ও খড় বলদের পিঠে সপ্তাহে একদিন কলিকাতার হাটে আসিয়া বিক্রয় করিয়া নুন, তেল ইত্যাদি কিনিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্বে মারাঠী বর্গীরা কলিকাতার সন্নিহিত গ্রামগুলি লুণ্ঠন করে। রেকজানি ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। বলরাম পূর্ণগর্ভা স্ত্রীকে লইয়া গ্রাম ত্যাগ করেন, পথে উন্মুক্ত প্রান্তরে একটি ঝোপের ধারে রামদুলালের জন্ম হয়। নিকটবর্তী গ্রামে একটি চাষীর পরিত্যক্ত কুটিরে রামদুলালের মাতাপিতা নবজাত শিশুসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ কুটিরে রামদুলালের ৬ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, দুই মাস পরে পিতাও ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর একটি অনুজ ভ্রাতা ও একটি অনুজা ভগ্নী সহ রামদুলাল তাঁহার মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের আশ্রয়ে কলিকাতার সিমুলিয়ায় আসেন। রামসুন্দরের জীবিকা ছিল ভিক্ষা—সেকালে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থের পক্ষে ভিক্ষা দ্বারা সংসার প্রতিপালন সমাজ অবজ্ঞা বা ঘৃণার চোখে দেখিত না। ভিক্ষান্নে সংসার প্রতিপালন করিয়া রামদুলালের মাতামহী প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নানের সময় উদ্বৃত্ত চাউল ভিক্ষুকদের এক মুষ্টি করিয়া বিতরণ করিতেন। মাতামহ ও মাতামহী সাদরে ও সস্নেহে নাবালক দৌহিত্র-দৌহিত্রী তিনটিকে গ্রহণ করিলেন। অতিরিক্ত তিনটি মুখের অন্ন যোগাইবার জন্য মাতামহী

পাড়ার গৃহস্থদের বাড়ীতে ধান ভানিতেন ও চিঁড়া কুটিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই মাতামহী কায়স্থ মদনমোহন দত্তের গৃহে পাচিকারূপে নিযুক্ত হইলেন এবং রামদুলাল মাতামহীর সহিত সেখানে আশ্রয় পাইলেন। মদনমোহন দত্ত তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বাড়ীর পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট রামদুলালের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রামদুলালের হাতের লেখার জন্ত তালপাতা ও কলাপাতা কেনার পয়সা মাতামহীর ছিল না। ধনী মদনমোহনের বাড়ির ছেলেরা যে কলাপাতায় খানিকটা লিখিয়া ফেলিয়া দিত রামদুলাল তাহা কুড়াইয়া লইয়া নিমতলার গঙ্গার ঘাটে ধুইয়া আনিয়া হাতের লেখা লিখিতেন। এই ভাবে বাঙ্‌লা পড়া লেখা ও অঙ্কে কিছু জ্ঞান-অর্জন করিয়া রামদুলাল মদনমোহন দত্তের আমদানি-রপ্তানি কারবারে প্রথমে সংবাদবাহক, পরে পাঁচ টাকা বেতনে বিল সরকার ও কর্মদক্ষতার গুণে ক্রমে দশ টাকা বেতনে শিপসরকার নিযুক্ত হন এবং ইংরেজী ভাষা শুনিয়া শুনিয়া রপ্ত করেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ইংরেজী বলিতে পারিলেও ইংরেজী লিখিতে পারিতেন না, কারণ ইংরেজী বানানের বাধা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। রামদুলাল বিদেশী বণিকদের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারে যে সব পত্রালাপ করিতেন, সেগুলি সহজ সরল স্পষ্ট, সেগুলির মধ্যে কোন চাতুর্য্য বা কূট-কৌশল থাকিত না। ইংরেজী লিখিতে না পারিলেও রামদুলাল কিন্তু এই সব পত্র নিজ হাতে রচনা করিতেন। সারা দিনের কাজকর্মের পর রামদুলাল গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্বহস্তে বাঙ্‌লা হরফে ইংরাজী ভাষায় প্রত্যেকটি পত্র লিখিতেন, সহজ স্পষ্ট ভাষায় বাণিজ্যিক লেনদেন, বাজারের সংবাদ ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত তথ্যাদি জানাইতেন। পরদিন তাঁহার কর্মচারীরা বাঙ্‌লা হরফে ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রগুলি কেবলমাত্র রোমান হরফে লিপ্যন্তর করিতেন। উনবিংশ শতকে রোমান হরফে বাঙ্‌লা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা লিখিবার যে রীতি প্রবর্তন হইয়াছে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে রামদুলাল ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, তাঁহার উদ্ভাবনী কল্পনায়, ইংরেজী বানান ও লেখার বাধা অতিক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে রামদুলাল কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইয়া ওঠেন। নিরন্নকে অন্নদান, অনাথ-আতুরদের জন্য সদাব্রত, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে প্রভূত অর্থসাহায্য, সমাজকল্যাণে ও শিক্ষাবিস্তারকল্পে অর্থদান, সংস্কৃত চর্চার জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন ও অধ্যাপক পণ্ডিতদের নিয়মিত বৃত্তিদান, ধর্মকর্ম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও রামদুলাল এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সম্পদ এবং কাশী, কলিকাতা, মূলাজোড় ও বিভিন্ন স্থানে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অট্টালিকা তাঁহার উত্তরাধিকারীরা লাভ করেন। রেকজানি গ্রামে পৈতৃক ভিটায় বাস করার সুযোগ রামদুলালের না হইলেও পল্লীজীবনের সহিত তাঁহার যোগ ও পল্লীগ্রামের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় পাই মূলাজোড় গ্রামে তাঁহার ক্ষেতখামার ও গোশালা স্থাপনে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বহু দায়-দায়িত্ব বহন করিয়া ও কলিকাতার সামাজিক

জীবনের নানা কর্তব্য পালন করিয়াও গোপালন ও কৃষিকর্মের—ডেয়ারি ও ফার্মিং-এর প্রতি তাঁহার আগ্রহ তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনে রামদুলাল ত্রিশ হাজার টাকা নগদ দান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় টাউন হলের সভায় তিনি নগদ এক লক্ষ টাকা সভাস্থলেই দান করেন। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জের (বরিশালে) জলপ্লাবনে তিনি কলিকাতার এক সভায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দুই শত টাকা দান করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর কলিকাতার টাউন হলে এক জনসভায় আয়ার্ল্যাণ্ডের দারুণ দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য রামদুলাল ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তি যোগ দেন এবং ঐ সভায় চাল্লশ হাজার তিন শত পঁয়ষট্টি টাকা চাঁদা তোলেন।

হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতা স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট-এর বিলাত প্রত্যাগমনের পূর্বে ২১ ডিসেম্বর ১৮২১ কলিকাতার এক সভায় রামদুলাল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ চাঁদা তুলিয়া ঈস্ট-এর প্রতিমূর্তি স্থাপনের ও তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দানের প্রস্তাব করেন। ফার্সী, বাঙলা ও ইংরেজী—তিন ভাষায় লিখিত যে অভিনন্দন-পত্র—চতুর্দিকে স্বর্ণ-মণ্ডিত মূল্যবান্ চর্মে লিখিত, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের স্বাক্ষরিত অভিনন্দনপত্র *—মঙ্গলবার ১৫ জানুয়ারি ১৮২২ (৩ মাঘ, ১২২৮) স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট-এর বিদায়-সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব পাঠ করেন, সেই অনুষ্ঠান ও বহুমূল্যবান্ অভিনন্দন-পত্র প্রস্তুতের জন্য রামদুলাল ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি চাঁদা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের স্বাক্ষরিত ঐ অভিনন্দন-পত্রে স্যর্ হাইড ঈস্টের নানাবিধ সৎকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে: "মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে"।

বেলগাছিয়ায় রামদুলাল ৮৫ বিঘা জমি কিনিয়া 'অতিথিশালা-বাগান' নির্মাণ করেন—জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক হাজার লোক প্রতিদিন চাল, ডাল, আলু, ঘি, জ্বালানী কাঠ সেখানে পাইত; ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলেই যাহাতে নিজ নিজ আচার রক্ষা করিয়া অন্ন পাইতে পারে সেই জন্য রান্না-করা খাবার বিতরণ না করিয়া তাহাদের আহার্য্য উপকরণ দান করা হইত, প্রশস্ত বাগানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পাক করিয়া খাইত। এতদ্ব্যতীত সিমুলিয়ার বাসভবনে তিনি প্রতিদিন বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন দান করিতেন এবং বাড়ীতে সমাগত ভিক্ষার্থীরা যে যত পরিমাণ চাউল বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহাকে সেই পরিমাণ চাউল দেওয়া হইত—যেন পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাহাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে না হয় সেই জন্য। ভিক্ষার্থীকে রামদুলাল কোনও দিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। মৃত্যুকালে তিনি দুই লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া যান, সেই অর্থের উপস্বত্ব হইতে দরিদ্র ব্যক্তিদের নিয়মিত সাহায্য করার জন্য।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে মানস সরোবরের তীরে জমি কিনিয়া দুই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে তিনি ত্রয়োদশটি শিবমন্দির নির্মাণ, শিবপ্রতিষ্ঠা ও নিত্য সেবার

* "চতুরস্র স্বর্ণচিত্রিত বৃতি নির্ম্মিত পত্রে সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গালা পারসী ভাষাত্রয় সুরচিত সৎকীর্ত্তিপত্র" —সমাচার দর্পণ, ১৯ মাঘ ১২২৮, ২৬ জানুয়ারি ১৮২২।

ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার দানশীলা সহধর্মিণী—প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুর্গামণি—তুলাপুরুষ ব্রত উদ্‌যাপন করেন, তুলাদণ্ডে স্বর্ণ-রৌপ্য-রত্নাদিতে তাঁহার সহধর্মিণীকে ওজন করিয়া লক্ষ টাকা মূল্যের সেই স্বর্ণ-রৌপ্য-রত্নাদি বারাণসীর পণ্ডিতদের দান করা হয়। রামদুলাল এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত হন নাই ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী নারায়ণীর গর্ভজাত—আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) মাতৃসমা, অপুত্রক বিমাতাকে বারাণসীতে লইয়া গিয়া এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান। এই উপলক্ষ্যে কাশীতে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ও অসংখ্য দরিদ্র-নারায়ণকে পাঁচ দিন ধরিয়া অন্ন বিতরণ করা হয়।

হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ধর্মান্তরিত হইয়াছেন, শাস্ত্রীয় বিধান গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের হিন্দু ধর্মে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে এতদ্দেশীয় লোকেদের জ্ঞানোপার্জন ও বিদ্যা-বিষয়ক উন্নতির জন্য হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'গৌড়ীয় সমাজ' স্থাপনে তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন।

তাঁহার আপিসে প্রতিদিন যে সব দরিদ্র প্রার্থী উপস্থিত হইত তাহাদের জন্য তিনি দৈনিক সত্তর টাকা সাহায্য পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিতেন। মাতামহ প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষান্নে তাঁহাদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন, রামদুলাল সেকথা বিস্মৃত হন নাই—চারি শত দরিদ্র প্রতিবেশী ও গৃহস্থকে তিনি দৈনিক বাজার, চাউল ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যাদির জন্য নিয়মিত মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায় ও বিভিন্ন আপদ্-বিপদে দুঃস্থ ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত সাহায্য করা তিনি কর্তব্য জ্ঞান করিতেন। বিভিন্ন প্রার্থী ও উমেদারের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লোক পাঠাইয়া সন্ধান লইয়া গোপনে তাহাদের সাহায্য করিতেন অথবা খামে মুড়িয়া তাহাদের বাড়িতে ৫০ টাকা অথবা ১০০ টাকার ব্যাঙ্ক-নোট † পাঠাইয়া দিতেন। দরিদ্র প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের গৃহে গিয়া

† ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ইংরেজ এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি এদেশে ব্যাঙ্কিং-এর কাজ আরম্ভ করে ও ব্যাঙ্ক নোটের প্রচলন করে। ১৭৭০ খ্রী: কলিকাতায় ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক 'হিন্দুস্তান ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুস্তান ব্যাঙ্কের নোট legal tender না হইলেও বাজারে বেশ চালু ছিল। ১৭৮৫ খ্রী: 'বেঙ্গল ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। কেয়ার্লি ফার্গুসন কোং-র অংশীদার ফার্গুসন সাহেব বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ছিলেন। রামদুলালের জীবদ্দশায় 'হিন্দুস্তান ব্যাঙ্ক', 'বেঙ্গল ব্যাঙ্ক' ছাড়াও 'শ্রীরামপুর ব্যাঙ্ক', 'কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক', 'ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ! শ্রীরামপুর ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ছিলেন রেভারেণ্ড উইলিঅম কেরি, যোশুআ মার্সম্যান, উইলিঅম ওআর্ড, জন মার্সম্যান—১লা মার্চ ১৮১৯ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। "যে ব্যক্তিরা এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা ব্যাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা যে এই ব্যাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।" শ্রীরামপুর ব্যাঙ্ক ন্যস্ত টাকা কোম্পানির কাগজে, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে বা অন্য কুঠিতে রাখিত এবং কোম্পানির কাগজের সুদের অপেক্ষা কম সুদ দিত না ও অনধিক শতকরা নয় টাকা পর্যন্ত সুদ দিত। কলিকাতার আলেকজাণ্ডার কোম্পানিতে শ্রীরামপুর ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়া যাইত। ১ মে ১৮১৯ ম্যাকিণ্টস্ কোং 'কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন—যোসেফ ব্যারেটো এণ্ড সন্স, ম্যাকিণ্টস কোং, জন মেলভিল ও গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকুমার ঠাকুর উহার অংশীদার ছিলেন। ৫ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক নোট্ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক "প্রমিসারি নোট অন্ ডিম্যাণ্ড" ইস্যু করিতেন—যোসেফ ব্যারেটো অথবা জন উইলিঅম ফুলটনের স্বাক্ষর ও খাজাঞ্চি সূর্যকুমার ঠাকুরের স্বাক্ষরে। ২ আগষ্ট ১৮২৪ পামার এণ্ড কোং ৬১নং ওল্ড কোর্ট স্ট্রীটে 'ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক' খোলেন—জন পামার, জন ব্রোন রিগ, হেনরী হবহাউস, এডওআর্ড অগষ্টাস নিউটন, এফ.টি. হল, সি.বি. পামার, উইলিঅম প্রিন্সেপ, রঘুরাম গোস্বামী এই ব্যাঙ্কের অংশীদার ছিলেন। আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং, ম্যাকিণ্টস্ এণ্ড কোং, পামার এণ্ড কোং প্রভৃতির সহিত রামদুলালের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও প্রচুর লেনদেন ছিল।

তাহাদের অভাব-অনটনের সংবাদ আনার জন্য তিনি একজন পৃথক্ সরকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিন জন বেতনভোগী চিকিৎসককে তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কার্য ছিল পীড়িত ব্যক্তিদের গৃহে গিয়া বিনা ব্যয়ে রোগী দেখা ও রামদুলালের ব্যয়ে রোগীদের ঔষধপত্র ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করা। প্রতি রবিবার রামদুলাল তাঁহার পরিচিত ও বিশ্বস্ত প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্র ব্যক্তি সমভিব্যাহারে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দুঃস্থ ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়া তাঁহাদের সংবাদ লইতেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতেন।

বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের রামদুলাল নিয়মিত মাসিক পেনসন দিতেন, কর্মচারীদের বেতন ও পেনসন বাবদ তৎকালে তাঁহার মাসিক ব্যয় ছিল ১৫ হাজার টাকা।

কোটিপতি রামদুলালের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধা। ঐশ্বর্যের শিখরে উঠিয়াও তাঁহার আহার ও বেশভূষার মধ্যে জাঁকজমক ছিল না। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন—ভাতে-ভাত অর্থাৎ ভাত ও ভাতের সহিত সিদ্ধ তরকারী, দুধ ও দু'একটি মিষ্টান্ন তাঁহার মধ্যাহ্নের আহার; রাতে ভাতের বদলে আটার রুটি বা চাপাটি। আহারের সময় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের—নিজের ও আশ্রিতদের ছেলেমেয়েদের—লইয়া খাইতে বসিতেন, তাহাদের এবং গৃহপালিত পশুপাখীদের প্রত্যেককে নিজ হাতে কিছু কিছু আহার্য বণ্টন করিয়া দিতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক—অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার বাঙালী বেনিয়ান—পরণে সাধারণ ধুতি, গায়ে ফ্লানেলের বেনিয়ান, কাঁধে প্রশস্ত সূতী চাদর ও মাথায় একগজী কাপড়ের একটি ছোট পাগড়ি। পাল্কীতেই তিনি যাতায়াত করিতেন, ১৪ বিঘা জমির উপর নির্মিত তাঁহার সিমুলিয়ার বাড়িতে পাল্কী-বেহারাদের ঘর ছিল, তাহারা মনিবের পরিবারভুক্ত লোক হিসাবেই থাকিত। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন বা ব্যবসায়ীরা কেহ তাঁহাকে দামী ঘোড়ার গাড়ী কেনার কথা বলিলে বলিতেন "দরিদ্র মানুষের অন্ন জোগানোর চেয়ে পুণ্যকর্ম আর নাই, দামী ঘোড়ার খাদ্য জোগানোর চেয়ে গরীব পাল্কী-বেহারাদের অন্ন সংস্থান করা ভাল।" বন্ধু ও হিতার্থীদের উপরোধে, পরে পরিণত বয়সে, তিনি গাড়ী ও ঘোড়া কিনিলেও কোচম্যানকে কোচবাক্সে বসিয়া সগর্বে গাড়ী হাঁকাইতে দিতেন না পাছে দরিদ্র পথচারী কেহ ঘোড়ার খুরের আঘাতে আহত হয়, কোচম্যান পায়ে হাঁটিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া কলিকাতার রাজপথে তাঁহার গাড়ী চালাইত। জীবজন্তুর প্রতি রামদুলালের গভীর মমতা ছিল। একবার সিমুলিয়ার বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময় বলির ছাগশিশু ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলে আশ্রয় লয়, রামদুলাল তখন হইতে তাঁহার গৃহে দুর্গোৎসবে পশুবলি বন্ধ করিয়া দেন, স্মার্ত পণ্ডিতদের বিধান লইয়া তখন হইতে তাঁহার বাড়ীতে দুর্গোৎসবে কুষ্মাণ্ড বলি প্রবর্তিত হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওআলিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের পর বাঙ্লার ধনী-সম্প্রদায় ও বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে জমিদারি কেনার প্রবণতা বাড়িয়া যায়। বহু বাঙালী

ব্যবসায়ী পরিবার ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ধন উপার্জন অপেক্ষা অভিজাত জমিদার হইয়া মধ্য-স্বত্ব ও ভূমির উপস্বত্ব ভোগের দিকে আকৃষ্ট হন এবং মধ্যস্বত্ব প্রথা বাঙলার সমাজ-জীবনে শিকড় গাড়িয়া বসে। রামদুলাল এই মোহ হইতে মুক্ত ছিলেন—পরশ্রমজীবী অপেক্ষা পরিশ্রমজীবী হওয়াই রামদুলালের সারা জীবনের আদর্শ ছিল। একবার তাঁহার নিকট বন্ধক রাখা মল্লিকদের একটি জমিদারি মল্লিকেরা মেয়াদ অন্তে টাকা শোধ করিয়া ছাড়াইতে পারিলেন না। রামদুলাল কোনও কারণেই আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। উপকৃত মল্লিকেরা তাঁহার ঋণ শোধ করার অন্য উপায় না থাকায় তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহার নামে জমিদারি লিখিয়া দিলেন। মল্লিকদের নায়েব গোমস্তারাই জমিদারি দেখাশোনা করিত। কিছুকাল পরে একদল দরিদ্র প্রজা নায়েবদের জুলুমের ফলে কলিকাতায় তাঁহার সিমুলিয়ার বাড়িতে দুঃখ জ্ঞাপন করিতে আসে ; তাহাদের বুভুক্ষু শীর্ণ দেহ, জীর্ণ কটি-বস্ত্র দেখিয়া রামদুলাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন, তাহাদের কর ও আবওয়াব মকুব করিয়া তাহাদের তেল মাখিয়া পুকুরে স্নান করিয়া আসিতে বলেন, স্নানান্তে প্রত্যেককে একখানি করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দেন এবং সিমুলিয়ার বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় দেন এবং পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই জমিদারি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে কর্মচারী ও দালালদের আদেশ দেন। সেইদিনই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া জলের দামে রামদুলাল জমিদারি বেচিয়া দেন এবং তাঁহার বংশে কেহ যেন জমিদারি না কেনে এই নির্দেশ দেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ (রামদুলালের মৃত্যুর বৎসর) পর্যন্ত শত শত আমেরিকান্ জাহাজ সালেম, মাসাচুসেট্স্, বস্টন, ন্যু ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, নিউবেরী ও মার্বল্‌হেড বন্দর হইতে মার্কিন পণ্য ভারতীয় বন্দরে বহন করিত, ফলে এই দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বন্দরে এই চারি দশক ধরিয়া বহু মার্কিন বাণিজ্য-তরণী চা, চিনি, নীল, আদা, চটের থলি, লঙ্কা, সোরা, রেশমী ও সূতী কাপড়, শৌখিন পাথরের কণ্ঠহার (নেকলেস), অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন এবং কখনও কখনও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ আমেরিকায় লইয়া যাইত। এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থের কিছু কিছু ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছায় এবং আমেরিকার প্রথম সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত এডওআর্ড এল্‌ব্রিজ স্যালিসবেরি (Edward Elbridge Salisbury) পরবর্তীকালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চা ও গবেষণার পথ প্রস্তুত করেন। এই চারি দশকে আমেরিকার সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে রামদুলাল ঐশ্বর্যের শিখরে ওঠেন এবং মার্কিন বণিকরা সরাসরি তাঁহার নিকট ড্রাফ্‌ট্ (draft) পাঠাইয়া তাঁহারই পছন্দমত ভারতীয় পণ্য খরিদ করিয়া পাঠাইবার বরাত দিতেন।

রামদুলালের মৃত্যুর পর মার্কিন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত এই ব্যবসায়-সম্পর্ক বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয়—আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) ও প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) —ও পরে রামদুলালের দৌহিত্রগণ রক্ষা করিয়াছিলেন। রামদুলালের মৃত্যুর আট বৎসর

পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন জাহাজে বস্টন বন্দর হইতে একটি অভিনব ও আশ্চর্য্য পণ্য—উত্তর-পূর্ব আট্‌লান্টিকের মেইন্, নিউ হ্যাম্পসায়ার, ভার্মণ্ট, ম্যাসাচুসেটস্, রোড আইল্যাণ্ড ও কনেক্‌টিকাটের হ্রদ ও পুকুর হইতে কাটিয়া তোলা শত শত টন বরফ—কলিকাতা বন্দরে প্রেরিত হয়। পনের হাজার মাইলের এই বিরাট দূরত্ব বরফ-বোঝাই জাহাজগুলিকে অতিক্রম করিতে হইত; বিভিন্ন উষ্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া বাহিত এই বরফ যাহাতে গলিয়া না যায় সেজন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইত। সূক্ষ্ম সুগন্ধি করাত-গুঁড়ার ঘন আস্তরণে এই বৃহদায়তন বরফ-খণ্ডগুলি ঢাকা থাকিত, এবং ১৫,০০০ মাইল দীর্ঘ পথের কোথাও জাহাজের খোলের কবাট খোলা হইত না। এই অভিনব উপায়ে এক মহাদেশ হইতে আর এক মহাদেশে বরফ রপ্তানি মার্কিন বণিকদের ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'টাস্‌কানি' ('Tuscany') জাহাজ সর্বপ্রথম ১৮০ টন বরফ কলিকাতা বন্দরে লইয়া আসে। রামদুলালের পুত্রগণ—'লণ্ডন টাইমস্' *(London Times)* পত্রিকা তাঁহাদের বাঙ্‌লার রথ্‌চাইল্ড ('Rothschilds of Bengal') বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—মার্কিন বণিকদের সহিত নব নব পণ্যের লেন-দেনে লাভবান্ হইয়াছিলেন।

৬৯ বৎসর বয়সে মুমূর্ষু রামদুলাল গঙ্গাযাত্রা করেন এবং ডাক্তার নিকলসনের চিকিৎসায় আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সিমুলিয়ার গৃহে ফিরিয়া আসেন, সেকথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ৭১ বৎসর বয়সে গুরুতর পীড়িত হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার গঙ্গাযাত্রা করেন এবং এবারও তিনি সুস্থ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন। ৭৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে রামদুলাল তৃতীয়বার গঙ্গাযাত্রা করেন। কাশীপুরে গঙ্গার কোলে 'বিবি কেটির বাগান' নামে বিখ্যাত একটি উদ্যান রামদুলাল ক্রয় করিয়াছিলেন, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে পীড়িত রামদুলাল সেখানে গঙ্গাযাত্রা করেন। ১লা এপ্রিল ১৮২৫— ২০শে চৈত্র ১২৩২—শুক্রবার, বেলা আড়াই প্রহরের সময়, রামদুলাল কাশীপুরে গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন।

১২৩২ বঙ্গাব্দের ২০শে বৈশাখ কলিকাতায় রামদুলালের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বঙ্গদেশ ছাড়াও কাশী, কাশ্মীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, কাঞ্চী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি নানা দিগ্‌দেশ হইতে আমন্ত্রিত প্রায় আট হাজার অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্মিত তৈজস ও হস্তী, নৌকা, পাল্কী, গাড়ী প্রভৃতি দান করা হয়। দানসামগ্রী ব্যতীত প্রধান অধ্যাপকগণের প্রত্যেককে ১০১ রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে মর্যাদা অনুসারে ৭০, ৬০, ৫১, ৪০, ৩২, ২৫ রৌপ্যমুদ্রা দক্ষিণা দেওয়া হয়; লক্ষাধিক কাঙ্গালী বিদায়ে প্রত্যেককে একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা দান করা হয়, গর্ভবতী রমণীকে দুইটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হয়, পালিত পশু বা পাখী সঙ্গে লইয়া আসিলে সেই প্রার্থীকেও দুইটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হয়। এই শ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রামদুলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার ১২৩২ বঙ্গাব্দের হিসাবের খতিয়ানে

যে সকল মার্কিন বণিক ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের রামদুলাল 'সোল এজেন্ট' (Sole Agent) ছিলেন তাঁহাদের নামের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়:

॥ বস্টনের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ॥

মেসার্স বি. রিক্ অ্যাণ্ড সন্ (B. Rich & Son) ; ঈ. রোড্‌স (E. Rhodes) ; এফ. ডব্লু. এভারিট (F. W. Everitt) ; জি. আর. মিনট্ (G. R. Minot) ; জি. ওয়ারেন্ (G. Warren) ; এইচ. আরভিঙ্ (H. Irving) ; এইচ. লী (H. Lee) ; জে. জে. বাউডিচ (J. J. Bowditch) ; জে. এস. এমোরি (J. S. Amory) ; জে. টি. কোলরিজ (J. T. Coleridge) ; জে. ইয়ং (J. Young) ; ম্যাকি অ্যাণ্ড কোলরিজ (Mackie & Coleridge) ; ও. গডউইন (O. Godwin) ; টি. উইগল্‌স্‌ওআর্থ (T. Wigglesworth) ; থ্যুরিং অ্যাণ্ড পারকিন্‌স (Theuring & Perkins) ; ডব্লু. গডার্ড (W. Godard)।

॥ ন্যু ইয়র্কের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ॥

মেসার্স বেরিং ব্রাদার্স (Baring Brothers) ; সি. অ্যাণ্ড ডি. স্কিনার (C. & D. Skinner) ; এ. বেকার জুনিয়র (A. Baker Junior) ; ঈ. বি. ক্রকার (E. B. Crocker) ; ঈ. ডেভিস (E. Davies) ; জি. ব্রাউন (G. Brown) ; জি. এস. হিগিন্‌সন্ (G. S. Higginson) ; জে. জে. ডিক্সওয়েল (J. J. Dixwell) ; লেনক্স অ্যাণ্ড সন্ (Lennox & Son) ; এম. কর্টিস (M. Curtis) ; এস. অস্টিন জুনিয়র (S. Austin Junior) ; সিঙ্গল্‌টন অ্যাণ্ড মেজিক (Singleton & Mezick) ; টি. সি. বেকন (T. C. Bacon) ; ডব্লু. এ. ব্রাউন (W, A. Brown) ; ডব্লু সি. অ্যাপল্‌টন (W. C. Appleton)।

॥ ফিলাডেলফিয়ার বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥

মেসার্স গ্র্যান্ট অ্যাণ্ড স্টোন (Grant & Stone)।

॥ সালেমের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥

মেসার্স পিকারিং ডজ (Pickering Dodge) ; ডব্লু. ল্যান্‌ডর (W. Landor)।

॥ নিউবেরীর বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥

দি অনারেবল ঈ. এস. র‍্যান্ট (The Hon'ble E. S. Rant) ; জে. এইচ. টেলকম্ব (J. H. Telcombe)।

॥ মার্বল্‌হেডের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ॥

মেসার্স জে. হুপার (J. Hooper)।

মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ ও অগ্রদূত যাঁহারা আমেরিকার ব্যবসায় ও বৈদেশিক

বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বর্তমান যুগের আমেরিকায় তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত ও বিস্মৃত। 'Nation's Business' নামক মার্কিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক স্টার্লিং জি. স্ল্যাপী (Sterling G. Slappey) *"Pioneers of American Business"* পুস্তকের ভূমিকায় আক্ষেপ করিয়াছেন যে প্রথম যুগের মার্কিন বাণিজ্যের ইতিহাস ও মার্কিন বণিকদের জীবন-কথা কেবল আমেরিকার জনসাধারণের অজ্ঞাত নহে, আমেরিকার বণিক-সঙ্ঘ ও বাণিজ্য-বিষয়ক বিত্তায়তনের অধ্যাপকগণেরও অবিদিত। আমেরিকার ছাত্র ও গবেষকগণ উপরি-উক্ত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তি, বিকাশ ও ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে মার্কিন বাণিজ্যের ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায়ের উপরে নূতন আলোকপাত ঘটিবে ও বহু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর দুইটি সুদূর দেশের মধ্যে যে মিলনের সেতুবন্ধ রচিত হইয়াছিল এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নবীন আমেরিকা পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছিল তাহা কোনও বিখ্যাত দার্শনিক, ধর্মনেতা, চিন্তাশীল লেখক বা রাজনীতিবিদের চেষ্টায় ঘটে নাই, একজন সাধারণ মানুষের—পথের ধূলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সততা ও আত্ম-শক্তির দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া মর্মর প্রাসাদে যিনি অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করিতেন ও আর্ত পীড়িত বিপন্ন নিরন্ন মানুষের দুঃখকষ্ট মোচনে যিনি সদা তৎপর ছিলেন তাঁহার—সততা, বিশ্বস্ততা, মানবপ্রীতি, বন্ধুত্ব, দূরদর্শিতা ও সহযোগিতার ফলেই ঘটিয়াছিল একথা স্মরণীয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবর্ষে ও বঙ্গদেশে রামদুলাল দে একটি প্রায়-বিস্মৃত নাম। কিন্তু ভারতীয় চরিত্রের ও বাঙ্গালী চরিত্রের—বিশ্বমানবতার—একটি চিরস্মরণীয় রূপ তাঁহার জীবন ও চরিত্রের মধ্য দিয়া ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে একথা অনস্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষলগ্নে যখন বণিকের মানদণ্ড অমানিশার অন্তরালে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইতেছিল তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দীপ্ত কলিকাতার নাগরিক জীবনে ধন ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার মধ্যে মনুষ্যত্বের ও চারিত্রশক্তির বিকাশ দুর্লভ ; সরলতা, সততা ও মানবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতা, কুটিলতা, ধনগর্ব, অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য যখন অবক্ষয়ের দিকে জাতীয় চরিত্রকে অবনমিত করিতেছিল সেই যুগে রামদুলালের ন্যায় চরিত্র বাঙ্গলার সমাজ-জীবনে ঋজু আদর্শ, আত্মনির্ভরতা, মহত্ত্ব, কর্তব্যবোধ ও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ॥

গ্রন্থ- ও নিবন্ধ-পঞ্জী

1. *Ram Doolal Dey, the Bengalee Millionaire,* (A lecture delivered at the Hall of the Hooghly College on March 14, 1868) By Grish Chunder Ghose. Reprinted in *Selections from The Writings of Grish Chunder Ghose, The Founder and First*

Editor of "The Hindoo Patriot" and *"The Bengalee".* Edited By His Grandson Manmathanath Ghose, M. A. (Calcutta : The Indian Daily News Press, 19 British Indian Street, 1912).

2. *The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zaminders &c., Part II : The Native Aristocracy and Gentry.* By Lokenath Ghose, Calcutta. (J. N. Ghose & Co., Presidency Press, 8 Chitpore Road, Corner of Lall Bazar, 1881).

3. *Bridges of Understanding* By Dr. John T. Reid, (American Civilization Series, Number Five) : article *'A Calcutta Merchant'*.

4. *An Outline of American History*—The United States Information Service, (Prepared in consultation with Dr. Wood Gray, Professor of American History, The George Washington University, Washington, D. C. ; and Dr. Richard Hofstadter, Professor of History, Columbia University, New York).

5. *The American Pageant, A History of the Republic*—Thomas A. Bailey (D. C. Heath & Company, Massachussets, U.S.A., 1971).

6. *Banking in India*—Dr. S. G. Panandikar, (London, 1934. Third Edition, 1940.)

7. *Indo-American Relations* : *Past and Present.* (An address by U. S. Ambassador Kenneth B. Keating delivered on November 11, 1970 at the Academy of Fine Arts, Calcutta).

8. U.S.A. Commercial Newsletter, Vol. 8 No. 9, August 1975.

৯। রামদুলাল সরকার—দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, কলিকাতা ও ময়মনসিংহ, ১৩২৫)।

১০। বংশপরিচয় : ষষ্ঠবিংশ খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত (কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৫৬)।

১১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা : প্রথম খণ্ড ১৮১৮-১৮৩০—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭)।

১২। বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

১৩। সমাচার দর্পণ :

২২ চৈত্র, ১২২৫ ; ৩ এপ্রিল, ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬ ; ৮ মে ১৮১৯। ১৩ আষাঢ় ১২২৬ ; ২৬ জুন ১৮১৯। ১৬ আষাঢ়, ১২২৯ ;২৯ জুন, ১৮২২। ২৭ আশ্বিন, ১২২৯ ; ১২ অক্টোবর, ১৮২২। ২৩ পৌষ, ১২২৮ ; ৫ জানুআরি, ১৮২২। ৭ মাঘ, ১২২৮ ; ১৯ জানুআরি, ১৮২২। ১৪ মাঘ, ১২২৮ ; ২৬ জানুআরি, ১৮২২। ২৬ ফাল্গুন, ১২২৯ ; ৮ মার্চ, ১৮২৩। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১ ; ১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ২৮ চৈত্র, ১২৩১ ; ৯ এপ্রিল, ১৮২৫।

১৪। সংবাদ-কৌমুদী : ২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৩২ ; ১৪ মে, ১৮২৫। ১১ বৈশাখ ১২৩৩ ; ২২ এপ্রিল, ১৮২৬।

১৫। সমাচার-চন্দ্রিকা : ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৩২ ; ২৪ মে, ১৮২৫। ৫ চৈত্র, ১২৪৪ ; ১৭ মার্চ, ১৮৩৮।

১৬। "শতবর্ষ পূর্বের কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিচয়"—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি., বি. লিট্. ("ভারত সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত" "ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের উদ্যোগে সঙ্কলিত সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বিস্তৃত তালিকা ও বংশ পরিচয়" হইতে গৃহীত), ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৭।

১৭। 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', ষোড়শ পরিচ্ছেদ—হরিহর শেঠ ; ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৮।

১৮। 'রামদুলাল দে'—শ্রীমদনমোহন কুমার, (১৯৭৬), Voice of America কর্তৃক প্রচারিত।

১৯। 'ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম মার্কিন সংস্কৃতবিদ্ এডওআর্ড এলব্রিজ স্যালিস্‌বেরি'—শ্রীমদনমোহন কুমার, (১৯৭৬), Voice of America কর্তৃক প্রচারিত।

'অবধূত' শব্দের অর্থ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

A Trilingual Dictionary published under the auspices of the Govt. of West Bengal. Calcutta Sanskrit College Research Series no. XLVII Lexicon no. I, 1966, p. 40-তে 'অবধূত' শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :

"**অবধূত** ত্রি° (অব+ধূ–ক্ত) তিরস্কৃত, ত্যক্ত, নিরস্ত, অভিভূত, কম্পিত। Despised, insulted, shaken." ইহাতে শব্দটীর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হইল না। ফলে 'অবধূত নিত্যানন্দ' যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা মনে করিবেন নিত্যানন্দ একজন সমাজে তিরস্কৃত ও ত্যক্ত ব্যক্তি ছিলেন। ফলে বঙ্গদেশে যে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করা হয়—

"গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌশন্দৌ তমোনুদৌ" অর্থাৎ গৌড়বঙ্গের উদয়াচলে যুগপৎ চন্দ্র সূর্য উদয়ের মত এক বৃন্তে উদিত যুগল জ্যোতিষ্কের মত যাঁহারা জনগণের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়াছিলেন সেই যুগলের একটি প্রভু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণা অ-বাঙালী পাঠক লাভ করিবেন।

'শব্দসার', ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত, অষ্টম সংস্করণ, ইং ১৯১১, পৃ. ৫৭-৫৮তে লিখিত হইয়াছে :

"অবধূত, ত্রি. তিরস্কৃত, অনাদৃত, ত্যক্ত, অভিভূত, কাম্পিত। পু. বর্ণাশ্রম ধর্মত্যাগী সন্ন্যাসী বিশেষ।

'যো বিলঙ্ঘ্যা শ্রমান্ বর্ণান আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে ॥'
'অক্ষরত্বাদ্ বরেণ্যত্বাৎ ধূত সংসারবন্ধনাৎ,
তত্ত্বমস্যর্থ সিদ্ধত্বাৎ অবধূতোঽভিধীয়তে ॥' "

স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে *Govt. Trilingual Dictionary*-তে শব্দসার হইতে 'অবধূত' হইতে 'নিরস্ত' পর্যন্ত অংশটুকুমাত্র গৃহীত বা উদ্ধৃত হইয়াছে, বাকী অংশটুকু বর্জিত হইয়াছে। তাহার ফলেই 'অবধূত' শব্দের অর্থ অসম্পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার প্রয়োগের অর্থও বিকৃত হইয়া পড়িতেছে।

'শব্দস্তোম মহানিধিঃ' (তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ৩য় সংস্করণ, ইং ১৮৯৩)-তেও শব্দসারের মত উভয় অর্থই প্রদত্ত হইয়াছে।

অভিধান ব্যতীতও ভাগবত পুরাণ ১১শ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে নব যোগীন্দ্র সংবাদ

বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবধূত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন gymnosophist, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ দিগম্বর বেশে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সর্বত্র ছিল তাঁহাদের অবাধ গতি। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৮।২৮ যতি ধর্ম নির্ণয় প্রসঙ্গে এইরূপ অবধূতের কথা,—যাঁহারা বেদবিধি ও বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশাসনের বহির্ভূত ছিলেন—আছে :

'জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥'

এইরূপ একজন দিগম্বর gymnosophist অবধূতকে Alexander ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যান। তাঁহার নাম ছিল Kalanus. Plutarch's *Lives of Alexander & Cæsar*-এ তাঁহার কথা বর্ণিত আছে। তিনি স্বেচ্ছায় একদিন আলেকজ্যাণ্ডারকে জানাইয়া তাঁহার সাহায্যে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া সেই বহ্নিমান্ চিতায় পুষ্পাস্তীর্ণ শয্যার মত শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদেহমুক্তি লাভ করেন। চিতায় প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি সকলের নিকট হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠক ইহা মূল গ্রন্থটিতে পাঠ করিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেণ্ট্রাল) রুলস-এর ৮ ধারা অনুযায়ী 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল :

১। প্রকাশস্থান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

২। প্রকাশকাল—ত্রৈমাসিক

৩। মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত, ভারতীয় নাগরিক
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪। প্রকাশক—শ্রীমদনমোহন কুমার, ভারতীয় নাগরিক
সম্পাদক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদক—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ভারতীয় নাগরিক
পত্রিকাধ্যক্ষ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

৬। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের বা এক শতাংশের অধিক
মূলধনের মালিক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

আমি, শ্রীমদনমোহন কুমার, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

শ্রীমদনমোহন কুমার
প্রকাশক
সম্পাদক : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ॥

তারিখ : ৩১ মার্চ ১৯৭৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

দ্ব্যশীতিতম বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতির অভিভাষণ

২৬ পৌষ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ॥ ১১ জনুআরি ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

মানবিকী-বিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিগত ৮ই শ্রাবণ তাহার ৮২ বৎসর পূরা করিয়া ত্রিরাশীতম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত মহাদেশের অন্য বিভিন্ন রাজ্যের বা প্রদেশের অধিবাসী ১১ কোটির অধিক বাঙ্গলাভাষীর মাতৃভাষা, পৃথিবীর আটটি সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষার মধ্যে অন্যতম আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষা—ইহার সংরক্ষণ ও বিবর্ধন, ইহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, এবং নিজ মহিমায় ও অধিকারে ইহার গৌরবময় অবস্থিতি, এই সমস্ত কার্য্যে আত্মনিয়োজিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিগত চার কুড়ি বৎসর—সাধারণ মানুষের প্রায় পূর্ণ আয়ুষ্কাল-ধরিয়া—বাঙ্গালী জনগণের সেবা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গভাষী জনের মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ শিক্ষিত অংশ, গৌড়-বঙ্গের এই বাঙ্গলা ভাষার উদ্ভবের দুই এক শত বৎসরের মধ্যেই, নিজ মাতৃভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে পূর্ণ-জ্ঞানে সচেতন হইয়াছিল, তাহার সূত্রপাতের প্রমাণ, গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা পাইয়াছি। নিজ জাতির চিন্তা ও সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক জাতির মাতৃভাষা লইয়া গৌরব অনুভব করিবার মত মনোবৃত্তি—তদুপযোগী জ্ঞান ও মনীষা—সব সময়ে সকল জাতির মানবের সৌভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বঙ্গভাষী শিক্ষিত জনের মন অতি প্রাচীনকালেই এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী মনে হয় একটু উদার এবং সর্বগ্রাহী ছিল, সেই জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে তাহার মনে অসহিষ্ণুতা বা গোঁড়ামি দেখা দেয় নাই। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে বাঙ্গালী গীতিকার রামনিধি বসু (নিধুবাবু) গাহিয়াছিলেন বটে, যে "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা। বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা॥"—

তাহা ছিল মাতৃভাষা সম্বন্ধে সহজবোধগম্যতা এবং প্রীতির কথা। কিন্তু তাঁহার শত বৎসর পূর্বে সাহিত্যিক-বিচারশীল বিদগ্ধ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছিলেন—"যে হৌক, সে হৌক ভাষা, কাব্য রস লয়্যা।" এবং সেই কারণে রসজ্ঞ ও রসিক কবি, কেবল রসের প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় শুদ্ধ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল খাঁটি বাঙ্গলা না লিখিয়া, বর্ণণীয় প্রসঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্বেচ্ছায় আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করিয়া, "যবনী-মিশাল" ভাষা ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

প্রাচীন ভারতে এবং মধ্যকালীন ভারতে, ভাষাগত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আধুনিক যুগের ভারতের মত এত অধিক পরিমাণে দেখা দেয় নাই। মৌলিক বিভিন্ন চারিটি ভাষাগোষ্ঠী, যথা—আর্য্য, দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাত (ইংরেজিতে যথাক্রমে Indo-Aryan বা Aryan, Dravidian বা Dra-mizha, Austric বা Kol, এবং Indo-Mongoloid)—বিদ্যমান থাকিলেও, এইগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশ-প্রভাব কার্য্যকর ছিল। আর্য্য ও দ্রাবিড় এবং নিষাদের মধ্যে ভাষাগত শাব্দিক ও অন্যবিধ আদান-প্রদান বা লেন-দেন হইত। ইহারই ফলে ভাষাগত পার্থক্য ভারতীয় জনগণকে পরস্পরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য হইতে ততটা দূরে রাখিতে পারে নাই। মৌলিক ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সেই পার্থক্যকে অতিক্রম করিয়া এক মুখ্য আদর্শ সর্বত্র কার্য্যকর ছিল, এবং সেই আদর্শের জন্য ভারতে এমন একটি সংহতি-শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, যেটির দ্বারায় এই-সব নানা জাতি, মৌলিক ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথক্ থাকা সত্ত্বেও—এই মহাদেশে, অতি প্রাচীন কালেই, এখন হইতে কম পক্ষে তিন হাজার বছর আগে হইতেই, এই খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতে, মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায়, "এক-ধর্ম-রাজ্য-পাশে" বাঁধা পড়িয়া একটি Single Nation-এ বা এক জাতিতে পরিণত হইবার পথে প্রথম পদক্ষেপ করে। সেই আদর্শ বা বন্ধন অথবা গ্রন্থন-রজ্জু হইতেছে "ধর্ম"—অর্থাৎ যাহা সব কিছুকে ধরিয়া আছে,—আধিভৌতিক, আধিমানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত কিছুর ধারণ-পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ-কারক শক্তি। প্রচলিত অর্থে "ধর্ম" শব্দ বহ্বর্থ-বাচক ইংরেজি Religion শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু "ধর্ম" আরও গভীর, আরও তত্ত্ববিচারপূর্ণ সংজ্ঞা। এই শক্তি বা ধর্ম একাধারে হইতেছে "ঋত,

সত্য” এবং “রস”, অর্থাৎ সর্ব-নিয়ামক পন্থা বা অমোঘ বিধান, একমাত্র সদ্-বস্তু বা অস্তিত্ব, এবং সেই বিধান বা অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত রভসানন্দ যাহা অস্তিত্ব বা শাশ্বতসত্তার চরম কাম্য এবং লক্ষ্য, যাহার উপলব্ধি বা প্রাপ্তির জন্যই সমগ্র বিশ্বময় সৃষ্টির সর্ববিধ কর্ম-চেষ্টা, ব্যক্ত বা অব্যক্ত আগ্রহ বা আকূতি। “ধর্ম” শব্দটি সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত ভাবধারাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শব্দটি আর্য্য-জাতির ভাষা বৈদিক বা সংস্কৃত হইতে গৃহীত, এবং ভারতের প্রায় সর্বত্রই, সব ভাষায় নিজ মর্য্যাদার এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের বিশিষ্ট “ধর্ম”-ভিত্তিক সংস্কৃতি ও সমাজের গঠনে ও স্থাপনে যাহাদের আহৃত উপাদান ও প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইয়াছিল, ভারতের সেই আর্য্যজনের চিন্তাশীল, দার্শনিক-বোধবিচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর্য্যভাষী বর্ণের পক্ষ হইতে ভারত এবং বিশ্বের ভাবজগতে, এই “ধর্ম”-সম্বন্ধে বোধ হইতেছে এক অন্যতম প্রধান দান। এই ধর্ম, যাহা অশরীরী অথচ মানব-সমাজে ওতপ্রোত বিদ্যমান ভাববস্তু এবং ভারতের জনজীবনে সদাক্রিয়াশীল, তাহাকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ করিয়া “আর্য্যধর্ম” আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল-- ইহা “মানব-ধর্ম”-র অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বঙ্কর “মানব-ধর্ম”-র এক বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র। এবং ভারতের আর্য্য দ্রমিড় নিষাদ কিরাত নির্বিশেষে সমস্ত জাতির মানুষ এই “আর্য্য-ধর্ম”কেই আশ্রয় করিয়া, ভারতীয় সংজ্ঞায় “আর্য্য” এবং ইরানীয় সংজ্ঞায় “হিন্দু” জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের সকলেই - মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ধর্মের আগমনের পূর্বে— সর্ব বিষয়ে এক “আর্য্য” বা “হিন্দু” জাতির-ই অংশ, এইরূপ বোধ, বিচার বা আস্থা সকলেরই মধ্যে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট রূপে ছিল এবং এখনও আছে। এই হেতু, সংস্কৃতিগত বিরোধ না থাকায়, ভাষাগত বিরোধের অবকাশ দেখা দেয় নাই। তবে কোনও-কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা জনের মধ্যে নিজ মাতৃভাষায় সৃষ্ট বা সৃজ্যমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে গৌরব-বোধ জাগরিত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে মাতৃভাষার সম্বন্ধে সচেতনতা ও প্রীতি মধ্যযুগ হইতেই কিছুটা আত্মপ্রকাশ করে। তবে তাহা উদগ্র এবং অন্য-বিরোধী রূপে নহে। প্রাচীন ভারতে রসসৃষ্টির জন্য নাটকাদি সুকুমার সাহিত্যে, বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখে একাধিক বিভিন্ন প্রান্তের প্রাকৃতের ব্যবহার অতি সহজভাবেই হইত।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভব এবং সাহিত্যে সেগুলির প্রভূত প্রয়োগের পরেও, এই-সমস্ত নব-সৃষ্ট বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষার সাহিত্যে অল্পস্বল্প বোধগম্য হইলে অন্য প্রান্তের আধুনিক ভাষার প্রয়োগ-ও হইত, এবং উচ্চকোটির ধার্মিক বা দার্শনিক গ্রন্থ একটি আধুনিক ভাষায় লিখিত হইলে তাহা অবলীলাক্রমে অন্য ভাষার অঞ্চল বা প্রদেশেও পঠিত হইত, সেগুলি হইতে উদ্ধৃতিও হইত। যেমন পূর্বভারতে মধ্যযুগের বাঙ্গলায় রচিত "গোরখ-বোধ" প্রভৃতি গ্রন্থে নাথপন্থী সাহিত্য সুদূর রাজস্থানে ও পাঞ্জাবেও অনুলিখিত এবং পঠিত হইত, উত্তর-ভারতে বৈষ্ণব কবি রামানন্দের পদ, নির্গুণ-ব্রহ্ম-বাদী কবি ও সাধক কবীরের ও মারাঠী কবি নামদেবের পদ-ও, শিখগুরু অর্জ্জুনদেব কর্তৃক সংকলিত "গুরুগ্রন্থ" (বা "আদিগ্রন্থ") মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল; ভক্তকবি তুলসীদাসের "রামচরিত-মানস" বঙ্গদেশেও পঠিত হইত—এবং ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর আবশ্যক মত তাঁহার বাঙ্গলা মহাকাব্য "অন্নদামঙ্গল" গ্রন্থে পশ্চিমা ভাটের মুখে পশ্চিমী হিন্দী ব্রজভাষায় রচিত পদও দিয়াছেন; অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশে রচিত "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ"-এ বাঙ্গালী কবি, মুসলমান পীরের মুখে শুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁহার উক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতের প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা সমূহের মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সহযোগিতা বিরল ছিল না, এখনও অনেকটা নাই। এইরূপ আদান-প্রদানের ফলে, কোথাও-কোথাও কিছুটা ভাষা-মিশ্রণ ঘটে, এবং তাহার পরিণামে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নূতন ধরণের একাধিক "মিশ্র" সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি এবং বহুল প্রচারও হয়। যেমন মৈথিল ও বাঙ্গলার মিশ্রণে জাত বাঙ্গলা বৈষ্ণব পদসাহিত্যের "ব্রজবুলী" ভাষা, অসম-প্রদেশে অসমিয়া ও মৈথিলের সংমিশ্রণে সৃষ্ট অসমিয়া অঙ্কিয়া নাটকের "ব্রজাবলী" ভাষা, নানাপ্রকার প্রান্তিক মৌখিক ভাষা—যথা ভোজপুরী, অবধী, ব্রজভাষা, জানপদ হিন্দুস্থানী, পূর্বী পাঞ্জাবী, বুন্দেলী প্রভৃতির মিশ্রণে সৃষ্ট, কবীর ও অন্যান্য সন্ত ও সাধুদের রচনা-মধ্যে প্রচলিত "সাধুক্কড়" বোলী, ভারতীয় এই সাধুক্কড় বোলীর সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দ মিলাইয়া "রেখ্‌তী" ভাষা, যাহাকে ভারতের অন্যতম প্রধান মিশ্রভাষা "উর্দূ"-র প্রাথমিক রূপ বলা যায়; সিনেমার পাত্র-পাত্রীদের মুখে ব্যাকরণ-বিষয়ে নিরঙ্কুশ এক প্রকারের মিশ্র

"ঠেট-হিন্দী" যাহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এখনও হইতে পারে নাই; —রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-বিহীন সহজ সমন্বয়-জাত এইরূপ নানা প্রকারের মিশ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিক এবং কচিৎ মৌখিক ভাষা।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সংস্কৃতি ও ভাষাগত সমন্বয় এবং সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে জাতি বা ভাষা বিষয়ে নিজের প্রাধান্য-কামী কোনও বিশেষ জনসমূহের উৎকণ্ঠা, আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া ভারতের স্বাধীনতোত্তর কালে, এই শতকপাদ ধরিয়া, ভারতের Unity and Integration অর্থাৎ ঐক্য ও সংহতির নামে তিন হাজার বছর ধরিয়া যে একতা-বোধ বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এক অবোধ মনোভাব দেখা দিয়াছে। এই মৌলিক একতা-বোধের স্বরূপটি না বুঝিয়া, "ধর্ম"-আধারিত ভারত-রাষ্ট্রের আভ্যন্তর প্রকৃতির বিরোধী, নূতন ধরণের সর্বন্ধর সর্বগ্রাসী Monolithic অর্থাৎ যেন "একশিলা-নিহিত" রাষ্ট্রচেতনায় ভারত প্রতিষ্ঠিত হউক,—এইরূপ চিন্তা এখন জাতির মধ্যে পূর্ণ ঐক্য লাভের প্রকটিত আকাঙ্ক্ষা (এবং অন্য অপ্রকটিত আকাঙ্ক্ষার) দ্বারা চালিত নানা মতের রাষ্ট্রচালনেচ্ছুদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারত তাহার বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধিকে জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী বলিয়া বর্জন করিয়া, এক বিচিত্রতাহীন জড়-পিণ্ডবৎ অবস্থাতে উপনীত হউক, ইহার জন্য চেষ্টা কোনও-কোনও প্রভাবশালী রাষ্ট্র-পরিচালক-মণ্ডলীতে বিশেষ করিয়া কার্য্যকর হইতেছে। ভারত এখন বহু আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা স্বার্থত্যাগ আত্মবলিদানের ফলে এক পূর্ণ স্বাধীন সর্ব-শক্তিময় রাষ্ট্রীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের জনসমূহ বিভিন্ন জাতি বর্ণ সংস্কৃতি ভাষা ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম সত্ত্বেও যে একমাত্র Sovereign Nation বা স্বাধিকারযুক্ত **মহাজাতি**, সে বোধ ও বিশ্বাস তাহার মধ্যে বিদ্যমান। এখন কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে এই চিন্তা, এই তিন হাজার বছরের ইতিহাসের পরেও, ইউরোপের Nationhood বা জাতীয়তা-বিকাশের প্রভাবে, এক অস্বস্তির ভাব আনিয়া দিয়াছে যে, আমাদের একটি সর্বন্ধর "জাতীয় ভাষা" চাই, নহিলে আমাদের মান-মর্য্যাদা আর থাকে না। ভারতের জনসমূহ ঠিক ইউরোপের বিভিন্ন Nation-এর মত একটি "জাতি" মাত্র নহে। ভারতের

জনসমূহ, রবীন্দ্রনাথের কথায় একটি "মহাজাতি"—ইউরোপীয় ভাষায় ইহার সংজ্ঞা বা প্রতিশব্দ নাই বা অপ্রচলিত। এই মহাজাতিকে—অর্থাৎ ইহার সংখ্যাভূয়িষ্ঠ অংশকে—বাঁধিয়া রাখিয়াছে ইহার "ধর্ম"-বোধ। ভাষার বাঁধনও আছে—কিন্তু তাহা মুখ্য বা প্রধানতম নহে, তাহা কতকটা গৌণ। অধিকন্তু সেই ভাষার বাঁধন মাত্র একটি ভাষার সাহায্যে কোনও কালে ছিল না। সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত—বিশেষতঃ সারা উত্তর-ভারতে প্রসৃত, প্রায় সমস্ত জনগণের অল্পবিস্তর বোধ্য এক প্রকার প্রাকৃত ও পরে তাহার পরিবর্তিত রূপে "অপভ্রংশ" ও "অবহট্‌ঠ" (অপভ্রষ্ট), ও পরে সংস্কৃতের সঙ্গে-সঙ্গে এই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ও অপভ্রষ্টের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ এক প্রকারের "ভাষা" যাহার বিকাশে গঠিত হইল সর্বগ্রাহী "পশ্চিমা হিন্দী"। এই "ভাষা" বা "পশ্চিমা হিন্দী"-র সঙ্গে ব্রজভাষা, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, অবধী, ভোজপুরী, মৈথিল প্রভৃতির মিশ্রণ ছিল। এই বহুরূপী "ভাষা"র নাম দেওয়া হয়, ফারসীতে "হিন্দবী, হিন্দ্বী" পরে "হিন্দী", এবং "হিন্দুস্থানী" ও "জবান-এ-উর্দূ" এবং মুসলমান রাজ-সরকারের (বিশেষ করিয়া মোগল যুগে) বহুল প্রচলিত রাজভাষা ও সাংস্কৃতিক ভাষা ফারসীর পাশে ইহা দাঁড়াইয়া যায়।—এ-সমস্তের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে একটু জটিলতা দেখা দিলেও, আমাদের সকল প্রকারের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম এই "ভাষা"-য় অনায়াসে চলিয়া যাইতেছিল। কেবল ব্রিটিশ আমলে আসিল ইংরেজি। এবং ইংরেজের স্থাপিত "রাজভাষা" বলিয়া নহে, নূতন যুগে ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক শিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন, আধিভৌতিক, আধিমানসিক, ও এমন কি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অপরিহার্য্য সাধন বলিয়া, ইহার গৌরব ও অবশ্য-পাঠ্যতা অভিজাত-সমাজে সহজেই স্বীকৃত হইয়া গেল। ব্রিটেন ও আমেরিকার সাম্রাজ্য-শক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাধান্যের জন্যই ইংরেজি ভাষা এখন বিশ্ব-সভ্যতার ভাষা,—সমগ্র মানবজাতির মিলনের ও জ্ঞান-সাধনের মুখ্যতম ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে যে নূতন জগৎ ও নূতন সমাজের উপযোগী জ্ঞান-পিপাসা ইংরেজ আমলেই দেখা দিল, সেই পিপাসা মিটাইবার জন্য ইংরেজি ভিন্ন আরও কোনও ভাষা ও সাহিত্যের যোগ্যতা ও শক্তি ছিল না। এই জ্ঞানচর্চার আহ্বানেই ইংরেজি ভাষা ভারতে

তাহার স্থান করিয়া লইল—কেবল ইংরেজি-শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়গণের ইংরেজ রাজসরকারের ও ইংরেজ প্রভুদের সেবা করিয়া, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্বার্থপর তাগিদের জন্যই ইংরেজির চাহিদা ঘটে নাই। কিন্তু ভারতের বহু প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত (সকলেই নহে)—বিশেষ করিয়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ী এবং আরবী-ফারসী-ব্যবসায়ী ধর্মনেতৃগণ ইংরেজির মূল্য বুঝিতে পারিলেন না, এবং যাঁহারা ইংরেজি শিখিলেন না ইংরেজির সাহায্যে আধুনিক জ্ঞান ও বিদ্যা, মানসিক আধুনিকতা যাঁহাদের নিকট পহুছিতে পারিল না, তাঁহাদের কাছে ইংরেজির সাহায্যেই সহজলভ্য এই আধুনিকতা অজ্ঞাত এবং বহু স্থলে সামাজিক ভীতির আকর হইয়া দাঁড়াইল। অন্ধ এবং অজ্ঞ, বোধবিচারহীন, সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় চিন্তাধারার বিরোধী, প্রাচীন ধরণের এক প্রকার জাতীয়তাবাদ,—যে অজ্ঞ, বিচারবিহীন, ঐতিহাসিক-দৃষ্টি-বিহীন জাতীয়তাবাদ সত্যকার দেশাত্মবোধকে সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিবার উপযোগী মনোবৃত্তি ও মানসিক শক্তির অধিকারী নহে—সেই অজ্ঞ জাতীয়তাবাদ আসিয়া, আধুনিক যুগের পক্ষে অপরিহার্য্য শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বাহন বলিয়া ইংরেজি ভাষাকে ভারতের শিক্ষা ও জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র হইতে বর্জন করিতে চাহে। সঙ্গে-সঙ্গে এইভাবে প্রকট ইংরেজি-বর্জন-নীতির সহায়ক হইয়া দাঁড়াইল, সমাজ বা সম্প্রদায়-বিশেষের তথাকথিত শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিতদের অনেকের মধ্যে স্বভাষাভাষীদের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্যের জন্য আগ্রহ। এই আগ্রহ, সহজ-বোধ্য এবং সুপরিব্যক্ত না থাকিলেও, ভারতের প্রকৃতিগত মৌলিক সংহতির সংরক্ষণের পক্ষে কম হানিকর হয় নাই। পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গলা দেশ ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত, এবং গুজরাট ও মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারতের বিবিধ কথ্য বা মৌখিক ভাষা, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তাহাদের সাহিত্যিক রূপ হিসাবে, ক্রমে-ক্রমে যেগুলি দিল্লী-অঞ্চলের ভাষা খাড়ী-বুলী হিন্দুস্থানীকে (খড়ী বোলী হিন্দোস্তানী) "উর্দূ" ও "হিন্দী" এই দুই নামে প্রতিষ্ঠিত (একই ভাষার আধারে সৃষ্ট দুইটি ভাষা) মোগল অধিকারের অবসানের সময়ে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্র গৃহীত হইল, তাহা লইয়া নিজেদের এক বিশাল "হিন্দী সংসার"-এর (বা হিন্দী-হিন্দুস্থানী ব্যবহারকারী রাষ্ট্রের) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইল। ইহার, ফলে এই-সমস্ত তথা-কথিত হিন্দী

(বা হিন্দুস্থানী) এক বিরাট Hindi-speaking হিন্দী-ভাষী রাজ্যের সংখ্যাধিক্যের মর্য্যাদা, গৌরব, শক্তি ও অধিকারের বলে বলীয়ান্ এইরূপ *বিশ্বাস, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।* ইহা অবশ্য সত্য যে "হিন্দী-উর্দূ" বা "হিন্দুস্থানী" নামে পরিচিত এই নবীন ভারতীয় ভাষার একটা বিশেষ লক্ষণীয় সর্বজনস্বীকৃত মহত্ত্ব ও শক্তি আছে, যাহাতে ইহা সহজেই আর্য্যভাষী উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে, সকলের কাছে বিনা আয়াসে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে, দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ভাষীদের বড় বড় নগরের বাজারেও যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং এই সব কারণে ইহা আধুনিক ভারতের Representative Language বা "প্রতিভূ ভাষা", এমন কি "রাষ্ট্রভাষা"র উপযোগী স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই ভাষা যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অনেকেই মনে করেন, এই ভাষার জোরেই তাঁহারা হইয়াছেন ভারতের মুখ্য জাতি,—তাঁহাদের ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা, অন্যান্য সমস্ত জাতির ভাষা ভারতের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে গৌণ স্থানেরই যোগ্য, মুখ্যভাষা রাষ্ট্র-ভাষার পাশে সেগুলির স্থান নিম্নে। এই ভাষার জোরেই, তাঁহারা যেন ইংরেজ আমলে রাজভাষা ইংরেজি যাহারা বলিত সেই ইংরেজদের মতই,—স্বাধীন ভারতে তাঁহারাই সব বিষয়ে সেই ইংরেজদের উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন বা দাঁড়াইবেন, অথবা তাঁহাদেরই সেই মর্য্যাদা প্রাপ্য। যদিও সাহিত্যিক বা অন্যবিধ গুণ বা গৌরবে, এই "হিন্দী-উর্দূ হিন্দুস্থানী"র আধুনিক সংস্কৃত শব্দবহুল সাহিত্যিক রূপ হিন্দীর স্বকীয় নবীন সাহিত্য, অন্য সমস্ত নবীন ভারতীয় ভাষা যথা বাঙ্গালা, অসমিয়া, মৈথিল, উড়িয়া, অবধী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী, কোঙ্কণী সাহিত্য অপেক্ষা অর্বাচীন এবং যদিও ইহা অবধী, মৈথিল, ব্রজভাষা, রাজস্থানী, প্রাচীন পাঞ্জাবী, তথা গাড়োয়ালী, কুমাউনী, পশ্চিমা পাহাড়ী প্রভৃতি অন্য সমস্ত বুলি বা মৌখিক ভাষার সাহিত্যকে আত্মসাৎ করিতেছে, আধুনিক "সাধু হিন্দী"-র সাহিত্য প্রসারে, গভীরতায় ও স্বকীয় বিশেষ গুণে, ভারতের প্রমুখ আধুনিক ভাষা বাঙ্গালা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, কানাড়ী ও তমিল প্রভৃতির চেয়ে প্রৌঢ় বা সমৃদ্ধ নহে। কেবল সংখ্যাধিক্য এবং বোধগম্যতা, এই দুইটিই ইহার প্রধান গুণ বা আকর্ষণ। এই জন্যই পরলোকগত জবাহরলাল নেহ্রু স্পষ্টই বলিয়া

দিয়াছিলেন যে, কেবল এই হিন্দী (সঙ্গে-সঙ্গে উর্দূ-হিন্দুস্থানী) নহে, ভারতের নাগরিকবৃন্দের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত ভাষাই ভারতের National Language বা জাতীয় ভাষা; এবং সকল ভাষাকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে তুল্য মর্য্যাদা দিতে হইবে।

কিন্তু ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়, জবাহরলালের এই সুচিন্তিত সৎ-পরামর্শ পালিত হইতেছে না। হিন্দীভাষী প্রদেশ বা রাজ্যগুলিতে, যথা—বিহারে, উত্তর-প্রদেশে, রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে, পাঞ্জাবে—এই-সব রাজ্যে, এবং ইহাদের দেখাদেখি অসমে, মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্র-প্রদেশে, কর্ণাটকে, তামিল-নাড়ুতে, কেরলে-ও, সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যভাষাভাষী অধিবাসিগণ, মাতৃভাষার অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিষয়ে নিজ-নিজ ন্যায্য, ভারত-সংবিধান-কর্তৃক প্রদত্ত জন্মগত অধিকার পাইতেছে না। এবং এ বিষয়ে যে অবিচার, অনাচার ও হৃদয়হীন অত্যাচার বহুস্থলে চলিতেছে, নিত্য জীবনের প্রায় সমস্ত বিভাগেই; নিবেদন আবেদন করিয়াও কেন্দ্রীয় ভারত সরকার হইতে তাহার প্রতিকার হইতেছে না, কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে নীরব দর্শক-মাত্র। এই অন্যায়, অশোভন, এবং ভারতীয় সংহতির পরিপন্থী ব্যাপার লইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকে অনেক প্রতিবাদ করিয়া, অনুকম্পা ও সুবুদ্ধির সহিত রাজ্য পরিচালনার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল তো হয়ই নাই, অধিকন্তু নানাভাবে নূতন-নূতন পথ ধরিয়া এই "হিন্দী-ভাষা" ভারতের সর্বত্রই এবং তাহার বাহিরেও, যাহাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিকগণকে হিন্দীর আওতায় আনিতে পারা যায় এবং ইংরেজিকে যাহাতে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা যায়, ছলে বলে কৌশলে সে বিষয়ে অপচেষ্টার অন্ত নাই। বাঙ্গালা ভাষার ও বঙ্গভাষী জন-গণের মর্য্যাদা ও অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-ও বহুবার চেষ্টিত হইয়াছেন। ভারতের, ভারত-ধর্মের, ভারত-সংস্কৃতির আলোচনা কালে এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তাহার মুদ্রিত প্রমাণ আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে পিষ্টপেষণের চেষ্টা অবান্তর হইবে; তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে আর একবার মাতৃভাষার প্রতি এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সংহতি ও সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গভূমির অধিবাসী যাঁহাদের দরদ আছে, সেই-সব বঙ্গভাষীকে আহ্বান করিয়া, এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আর

একবার আকর্ষণ করিতে চাহি। কেবল বাঙ্গলা ও অন্য সমস্ত ভারতীয় জাতীয় ভাষায় যে আসন্ন এবং বিশেষ ক্ষতিকারক বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুইটি সতর্কতা-বাণী আবার সকলের গোচরে আনিতে চাহি। *রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য : (১)* "রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বইকি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ—দেশের চিত্তকে সবল, সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয়না। দেউড়ীতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে, ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।" এবং (২) "অতএব বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে, তবেই হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ধাঁচে বাংলা লিখিতে থাকে, তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোন হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, তবে ইহা মরিতে চাহিবে না, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা, অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।' সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম—তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা—বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকে মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।"

বাঙ্গলা সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্কটের কথা কিছু বলিলাম। এই সঙ্কট একেবারে অনাশঙ্কিত নহে। মোহিতলাল মজুমদার ও অন্য অনেকে, এমন কি রবীন্দ্রনাথও, ইহা লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাঁটা বনের মধ্যে মিষ্ট ফলও দুই চারিটি আছে, তাহাতেই জীবন একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা

পাইতেছে।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুই-একটি সুসংবাদ জানাইয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। আমার প্রাক্তন ছাত্র, আরবী, ফারসী ও বাঙ্গলা ভাষার অভিজ্ঞ পণ্ডিত, অনুজকল্প অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ এনামুল হক (এখন ইনি বাংলাদেশে ঢাকায় জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ), কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় আরব্ধ তাঁহার মুখ্য গবেষণার কার্য্য এখন এই বৎসরে ছাপাইয়া বাহির করিতে সমর্থ হইলেন। বইখানি ইংরেজিতে লিখিত—A History of Sufiism in Bengal; ইহা মৌলিক অনুসন্ধান এবং গভীর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক বোধ ও বিচারের আকর—সূফী বিচার-ধারার মাধ্যমে মুসলিম আধ্যাত্মিক ও অন্যবিধ সংস্কৃতি বাঙ্গালীর জীবনে কি করিয়া বিশেষভাবে স্থান করিয়া লইল, এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কি করিয়া তাহা বাঙ্গালী জীবনের এক অচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য্য অংশ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে। বাঙ্গলা দেশের গবেষণা সংস্থা বাংলা একাডেমি সম্প্রতি একখানি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন সেটি হইতেছে ঢাকার ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মোহম্মদ হবিবুর রহমানের কৃতি "যথা শব্দ", এই বইখানি বাঙ্গলা ভাষায় একটি বড় অভাব বহুলভাবে পূরণ করিল। বাঙ্গলা ভাষা, শব্দকোষ, সাহিত্য প্রভৃতি সব দিকেই বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা হইয়াছে, ভাল অভিধানও বাহির হইয়াছে এবং আরও হইতেছে। কিন্তু ইংরেজি Roget's Thesaurus-এর মত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারশৈলী অনুসারে, বিভিন্ন প্রকারের দ্যোতনার শব্দের বিশেষ কার্য্যকর অভিধান ছিল না। বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকের পক্ষে "যথা শব্দ" অভিধানখানি এইরূপ একখানি অপরিহার্য্য পুস্তক-রূপে এখন দেখা দিল।

বঙ্গভাষী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া রোমান কাথলিক মতের খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও সাধারণ আস্থাশীল গৃহস্থদের মধ্যে, খ্রীষ্টানধর্মের মহাগ্রন্থ যিহুদীদের পুরাণ ও শাস্ত্র "প্রাচীন প্রমাণ" (অর্থাৎ ইংরেজিতে Old Testament) এবং যীশু খ্রীষ্টের জীবনকথা ও উপদেশ-মূলক গ্রন্থ "নবীন প্রমাণ" বা "সুসমাচার" (New Testament বা Gospel) যাহাতে শুদ্ধ মূলানুসারী সুপাঠ্য ও প্রসাদগুণযুক্ত বাঙ্গালা ভাষায় নূতন করিয়া অনূদিত হয়, সে বিষয়ে

বেশ আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা দিয়াছে। পরলোকগত বেলজিয়ম-দেশীয় পাদ্রি দঁতেন (Father Dontaine) এ বিষয়ে অন্যতম আগ্রহী ছিলেন। সম্প্রতি অল্প কয়েকদিন হইল, বাঙ্গলা-ভাষায় যাঁহার অসাধারণ অধিকার, বাঙ্গলার সুলেখক বেলজিয়ম-দেশীর পাদ্রি দ্যতিয়েন (Father Detienne)-এর তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত অমলকান্তি ভট্টাচার্য্য রোমান কাথলিক ধর্মসংস্থার অনুমোদিত "প্রাচীন প্রমাণ" গ্রন্থের Psalms বা গীতি-সংহিতার ১৫০টি সূক্তের একটি সুন্দর সুখপাঠ্য বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বইখানি বাহির হওয়ায়, এতদিন পরে বাঙ্গলা ভাষা, যিহুদী ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রের একটি প্রধান সম্পদ, আমাদের "গীতাঞ্জলি"র দরের দেবারাধনা-পুস্তকের সুন্দর অনুবাদ পাইল; বিশ্বসাহিত্যের এই বইখানি এখন নূতন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অনুবাদের নামকরণ হইয়াছে "সাম-সংহিতা", ইংরেজি Book of Psalms-এর অনুকরণে। ইংরেজি Psalms, মূল গ্রীকে Psalmoi 'প্সাল্‌মই' ঠিক আমাদের সামবেদের "সাম" নহে—Psalmos মানে harp বা বীণার সঙ্গে গীত গান; "সঙ্গীত-সংহিতা" অথবা "স্তব, স্তুতি, বা স্তোত্র-সংহিতা" হইলেই বোধহয় মূল হিব্রুর শব্দ Tehellim "তেহেল্লীম" ও তাহার অনুবাদ গ্রীকের শব্দ Psalmoi (Psalms)-এর কাছাকাছি হইত।

বিগত ডিসেম্বর মাসের ৮।৯।১০।১১।১২ তারিখে দিল্লীতে, ভারত সরকারের শিক্ষা-জনকল্যাণ-সংস্কৃতি-মন্ত্রক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য একাডেমির সম্মিলিত প্রযত্নে ও ভারত সরকারের পুরা অর্থানুকুল্যে, একটি অভিনব 'আন্তর্জাতিক রামায়ণ-বিচার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের আদিকবি বাল্মীকির রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা,—কে, বা কাহারা, কবে, কি-ভাবে, কোথায়, মূল রামায়ণের রচনার পত্তন করিলেন। কি-ভাবে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপাদান বা কথাবস্তুর Synthesis অর্থাৎ সংশ্লেষ বা সংযোজনের ফলে, বাল্মীকির হাতে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ 'রামকথা' মহাকাব্যের রূপ পাইল; এবং সেই-সমস্ত বিচ্ছিন্ন উপাদান তথা কথাবস্তুর Analysis অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিয়া এই রামায়ণের কলেবর গঠিত হইল, তাহার বিচার; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণের স্থান ও ইতিহাস, রামায়ণের বিকাশ, রামকথার প্রসার, রামকাহিনীর উৎস; প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিভিন্ন ভারতীয়

ভাষায় রামকথা ; ভারতের বাহিরে—ভারত-চীনে ও দ্বীপময় ভারতে এবং বহি-র্ভারতের অন্যান্য দেশে—রামকথার শাখা ও পল্লবিত বিকাশ ; বিশ্বসাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণের প্রভাব, এই প্রভাবের কারণ নির্দেশ ; বিভিন্ন ভাষায় রামকথার নানা সংস্করণ ;—প্রভৃতি বিষয় লইয়া, গবেষকদের আলোচনার জন্য এই সভা আহূত হয়। বিদেশ হইতে ১৫।১৬ জন প্রখ্যাত নামী রামকথাবিৎ লেখক ও পণ্ডিত ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন, ভারতের নানা অঞ্চল হইতে প্রায় ৪০ জন পণ্ডিত আসেন। ইংরেজিতে অনেকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়—এগুলি যথাকালে প্রকাশিত হইবে। এই রামায়ণ-অনুশীলন-সম্মেলনের একটা বিশেষ মূল্য বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাতেও যে আছে, তাহা বলা বাহুল্য, কারণ অন্য নানা ভাষার সাহিত্যের মত বাঙ্গলা সাহিত্যে-ও রাম-কথার একটি বিশেষ স্থান আছে, এবং এই হেতুই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে দিল্লীর এই সম্মেলনের উল্লেখ করিতে হয়।

সম্প্রতি বৃন্দাবনে একটি Research Institute বা অনুশীলন-সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এই Institute সম্বন্ধে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কৃতী গবেষক, বহু বৎসর ধরিয়া যিনি লণ্ডনে School of Oriental and African Studies-এ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেছেন, প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদ ও মধ্যযুগের তথা আধুনিক বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যিনি নানাদিক হইতে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, সেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বৃন্দাবন হইতে আমাকে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পত্র হইতে একটু অংশ উল্লেখ করিয়া আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত করিতেছি। "বৃন্দাবন" দিনাঙ্ক ১৫।১২।১৯৭৫ : "আমি গত সপ্তাহে এখানে এসেছি। মাস তিন চারেক থাক্‌তে হবে। এখানকার রাধা-দামোদর মন্দিরের এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের কাছ থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে বাঙলা পুঁথি আনুমানিক তিন হাজার। অধিকাংশ পুঁথিই চৈতন্য-সম্প্রদায়ের জীবনী, পদ-সংগ্রহ এবং নিবন্ধের পুঁথি। সংস্কৃত পুঁথিরও অধিকাংশ বাঙলা অক্ষরে লেখা। বাঙলা ভাষার পুঁথিগুলির একটি বিবরণাত্মক তালিকা প্রস্তুত করার দায়িত্ব

আমার।" অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলিকাতায় কয়দিন পূর্বে আমার এ বিষয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁহার কাছে যাহা শুনিলাম, তাহাতে মনে হয়, এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বাঙ্গলা পুঁথি যাহা বৃন্দাবনের গবেষণা-কেন্দ্রে সংগৃহীত হইতেছে, সেগুলির তালিকা এবং আলোচনা হইলে মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞাত নূতন তথ্য বাহির হইতে পারিবে। বৃন্দাবনে গিয়া এই সমস্ত পুঁথি দেখিয়া আসিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে সাদর আমন্ত্রণ পাইয়াছি। যাহাতে পুঁথিগুলির মধ্যে কিছু অংশ দেখিয়া আসিবার সৌভাগ্য হয়, সেই আশায় আছি। এইরূপে কোথা হইতে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাজের উপযোগী কি নূতন তথ্যসম্ভার আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, সেদিকেও আমাদের সকলেরই অতন্দ্র দৃষ্টি থাকা উচিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গভাষী জনগণের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি ও কৃপা দৃষ্টি লাভ করিয়া, যথাশক্তি নিজ কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টিত। পারিবারিক ও অন্যবিধ নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, এবং শারীরিক ব্যাধি ও অপটুতাকে উপেক্ষা করিয়া, পরিষদের সম্পাদক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত মদনমোহন কুমার প্রশংসনীয় একনিষ্ঠতার সহিত পরিষৎ-পরিচালনার গুরুভার বহন করিয়া যাইতেছেন। পরিষদের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য ব্যতিরেকে, গবেষণা ও রচনার কার্য্য হইতেও তিনি বিরত নহেন। যাঁহারা পরিষদের আভ্যন্তর অবস্থার কথা জানেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সাধুবাদ করিবেন ও তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, আর্থিক দুরবস্থা মোচনের জন্য ও পরিষদের সম্প্রসারণ ও নবগৃহ-নির্মাণের জন্য, এক কথায় পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য, তিনি পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষের নিকট কয়েকটি পরিকল্পনা পেশ করিয়া সেগুলির রূপায়ণের জন্য, নানা বাধা বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যে নিরলস চেষ্টা করিতেছেন; এবং সেগুলির কয়েকটিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার সম্ভাবনার আভাসও পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্থনি লান্সলট দিয়াস্ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা

গান্ধী মহোদয়াও সকল সময়েই নানাভাবে পরিষদের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য পরিষদ্ ও বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। সম্প্রতি দিল্লীর সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আবাসিক এবং নিবাসিক বহু প্রকার উন্নতি ও পরিবর্ধনের জন্য, তথা সুব্যবস্থার জন্য, কি-ভাবে সাহায্য করিতে পারেন, তাহার পূর্ণ অনুশীলনের জন্য এবং তদ্বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে, দিল্লীর একজন মুখ্য রাজকর্মচারী, প্রাপ্তাবসর আই-সী-এস্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ও ভারতের সুসন্তান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ, মনীষী স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও কয়েকবার কলিকাতায় আসিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া সব দিক্ হইতে পরিষদের অবস্থার, অভাব অনটন অভিযোগের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকর প্রস্তাবও তিনি দিতেছেন। ইহাতে পরিষদের নব-কলেবর গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার যে পুনরুজ্জীবন হইতে পারিবে এমন আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরম হিতৈষী, বাঙ্গলা ভাষার অন্যতম অদ্বিতীয় লেখক, নানা বিদ্যায় পথিকৃৎ, পণ্ডিতপ্রবর পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম স্মরণ করিয়া, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়কেও আমরা পরিষদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি॥

॥ বঙ্গভাষার জয় হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বঙ্গ-সংস্কৃতির, বঙ্গভাষার ও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া ধন্য হউক॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৮২তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮২তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে সশ্রদ্ধ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের মধ্যে যে সকল সাহিত্যসেবী ও দেশের কৃতী সন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন সর্বাগ্রে তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-এর পরলোক গমনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গভীর মর্মাহত। দীর্ঘকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি পরিষৎ-মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

পরিষদের অন্যতম ন্যাসরক্ষক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে পরিষৎ আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টির সময় হইতেই সাহিত্য পরিষদের সহিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের যে নিবিড় যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল, সৌম্যেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে সেই যোগ ছিন্ন হইল। পরিষদের উন্নয়ন ও সংস্কারকল্পে তিনি অসুস্থ শরীরে, চিকিৎসকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতলে আসিয়া পরিষৎ-সেবকদের সহিত মিলিত হইয়া উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিতেন—সে কথা বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের পরলোক গমনে রবীন্দ্র-যুগের বিশিষ্ট কবি ও বঙ্গসাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচকের তিরোধান ঘটিল। তাঁহার জীবন, মধুর ব্যবহার ও সাহিত্য-সাধনার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। পরিষদের আজীবন সদস্য লালগোলার রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাপতি জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বিজয়েন্দু নারায়ণ রায়, ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র মজুমদার, ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ডক্টর তারাচাঁদ, ডক্টর মতিচন্দ্র, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত, সীতা দেবী, মসিহুল্লা খাঁ, সুচেতা কৃপালনী, রজনী পাম দত্ত, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিভুরঞ্জন গুহ, ইলা পালচৌধুরী, দেশসেবী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত, কথাসাহিত্যিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত-সাধক সত্যেন্দ্র ঘোষাল, ওস্তাদ রহিমুদ্দিন খাঁ ডাগর, শচীনদেব বর্মণ, অনাথনাথ বসু, পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধন, তারাপদ চক্রবর্ত্তী, কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,

নলিনীকুমার ভদ্র, অমল হোম, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ডি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, প্রিয়বালা রায়, আর্নল্ড টয়েনবি, ভাস্কর দেবীপ্রসাদ-রায়চৌধুরী, বিজ্ঞানী পূর্ণেন্দু রায়, কার্টুনিস্ট পি, সি, এল, (প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী), অজয় দাশগুপ্ত, 'রঞ্জন' (নিরঞ্জন মজুমদার), যতীন্দ্রমোহন দত্ত (যম দত্ত), প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার শ্যামাদাস বসু উর্দু কবি সিকন্দর আবু জাফর, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

আর্থিক সহায়তা

আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কর্মচারী-নিয়োগ খাতে ১৩,৫০০ টাকা, পুস্তক-প্রকাশ খাতে ১,২০০ টাকা, পত্রিকা প্রকাশ খাতে ২,০০০ টাকা, পৌনঃপুনিক অনুদান ১১,০০০ টাকা এবং মাননীয় রাজ্যপালের দান ১০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ খাতে ১০,০০০ টাকা এবং পরিষদ্-মন্দিরের ছাদ মেরামত ও বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় খাতে ১১৮৬০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী. শিক্ষামহাধ্যক্ষ ও শিক্ষাসচিব এবং অর্থসচিবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিষদের প্রতি আনুকূল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিষদের উন্নয়নকল্পে মেসার্স এম. এস. প্রোডাকসন্সের পক্ষে 'বসুশ্রী' সিনেমার সত্বাধিকারী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ সম্পাদকের হস্তে ১,৫০১ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য শ্রীযুক্ত বসুকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাই। আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের হস্তে তাঁহার সহপাঠী অধ্যাপক শ্রীযোগীলাল হালদার মহাশয় "রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মৃতি-বক্তৃতা"র জন্য ৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখা হইয়াছে এবং তাহার সুদ হইতে প্রতি বর্ষে পরিষদ্-মন্দিরে বঙ্গভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হইবে। অধ্যাপক শ্রীযোগীলাল হালদার মহাশয়কে এজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহার রচনাবলী, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন, পরিষদ্-মন্দিরে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা এবং একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য পরিষৎ আয়োজন করিতেছেন। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী,

তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি 'ন্যায়দর্শন" পাঁচ খণ্ডে প্রকাশের জন্য পরিষৎ আয়োজন করিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত পত্রাদি. পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির জন্য পরিষৎ সম্পাদক তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমনে সেই কার্যে সাময়িক বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। "ন্যায়দর্শন" পাঁচ খণ্ডে প্রকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা ও সুলভ মূল্যে কাগজ সরবরাহের জন্য পরিষৎ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্য আমরা আশা করি।

গৃহ সংস্কার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের দ্বিতলের ছাদ মেরামত করা হইয়াছে এবং চিত্রশালা ও পুথিশালায় নূতন ভাবে আলোকসজ্জা করা হইয়াছে। চিত্রশালার অনেকগুলি পুরাতন জানালা মেরামত করা হইয়াছে এবং প্রবেশদ্বারে কোলাপসিব্‌ল গেট বসানো হইয়াছে।

পরিষদের গৃহসংস্কারের জন্য ১৩৮০ বঙ্গাব্দে একটি তহবিল খোলা হয়। ঐ তহবিলে গৃহসংস্কারের জন্য পরিষদ্-হিতৈষিগণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করা হইতেছে। এজন্য যাঁহারা অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

কার্য্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য কার্য্যনির্বাহক সমিতির ১০টি অধিবেশন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট 'ক'-এ প্রদত্ত হইল।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়:

১ম মাসিক অধিবেশন : ৫ই মাঘ ১৩৮১, রবিবার
সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
নিবন্ধ পাঠ শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত।
বিষয় : এল. লিওটার্ড

২য় মাসিক অধিবেশন : ২২শে চৈত্র ১৩৮১, শনিবার।
সভাপতি : শ্রীত্রিদিব নাথ রায়।
বিষয় : চারিজন ভোট পরীক্ষক নির্বাচন।

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বিগত ২৪ ফাল্গুন ১৩৮১ (৯ মার্চ ১৯৭৫) রবিবার পরিষদ মন্দিরে, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে পরিষদ সদস্যগণের এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল সাধারণ সদস্য চাঁদা ও আজীবন সদস্য চাঁদা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদন। কর্মচারিগণের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সরবরাহের হারবৃদ্ধি, কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই, দপ্তর সরঞ্জাম প্রভৃতি সর্ববিধ ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধির কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া চাঁদাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সাধারণ সদস্যগণের নিকট আবেদন করা হয় এবং সে আবেদন অনুমোদিত হয়। এই বিষয়ে পরিষদের নিয়মাবলীর ১০ ধারা ও ১১ (গ), ১১ (ঘ) ও ১১ (ঙ) ধারা সংস্কারসাধন করিয়া আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা ৫০০৲ (পাঁচশত) টাকা, সাধারণ সদস্যের বার্ষিক চাঁদা ১৮৲ টাকা, অর্ধ বৎসরের ৯৲ (নয়) টাকা, এবং কলিকাতার ডাক এলাকার বাহিরে যে সকল সদস্য থাকেন অথচ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা ১০৲ (দশ) টাকা ধার্য করা হয়।

সভাসমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

১। ৮২তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব : ৮ই শ্রাবণ ১৩৮১

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রধান অতিথি : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীআন্তনি ল্যান্সলট্ দিয়াস

বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষামন্ত্রী); শ্রীমদনমোহন কুমার।

২। একাশীতিতম বর্ষিক অধিবেশন : ৮ই শ্রাবণ ১৩৮১

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমদনমোহন কুমার।

৩। রজনীকান্ত সেনগুপ্ত (১২৫৬-১৩০৭ বঙ্গাব্দ) ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন : ২৯শে ভাদ্র ১৩৮১

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন সঙ্গীত : শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়

বক্তা : শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীপুলকেশ দে-সরকার শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীজ্যোৎস্না সিংহরায়।

৪। অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা উৎসব : ২৯শে মাঘ ১৩৮১
সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রধান অতিথি : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীআন্তনি লন্সলট দিয়াস
বক্তা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমদনমোহন-কুমার, মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্তনি লন্সলট্ দিয়াস্।

৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষ পূর্তি উৎসব : ২৯শে চৈত্র ১৩৮১
সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বক্তা : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীঅশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সদস্য

বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ'-এ প্রদত্ত হইল।

ভারতকোষ

বিগত বৎসরে ভারতকোষের ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতকোষে যে সকল প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে মুদ্রিত হয় নাই, সেই প্রসঙ্গগুলি লইয়া ভারত-কোষের একখানি পরিপূরক খণ্ড যাহাতে প্রকাশ করা যায় তাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুদানের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহৃদয় আনুকূল্য আমরা প্রত্যাশা করিতেছি।

পুস্তক মুদ্রণ

আলোচ্য বর্ষে কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকাশ বিলম্বিত হইতেছে।

'পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা' বিষয়ক একখানি সচিত্র তথ্যমূলক পুস্তিকা ২৯শে মাঘ, ১৩৮১ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের প্রথম কপি মাননীয় রাজ্যপালকে পরিষৎ সভাপতি উপহার দেন। ৮ই শ্রাবণ ১৩৮২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্র্যশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মানবিকী বিদ্যায় ভারতের জাতীয় আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত 'সভাপতির অভিভাষণ' পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) রচিত পরিষৎ সংস্করণ 'আলালের ঘরের দুলাল' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ডের অবশিষ্ট অংশের ছাপা শীঘ্রই শেষ হইবে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি যন্ত্রস্থ আছে :

১। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু

২। বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩। ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪। *রামেন্দ্র-রচনাবলী : ১ম খণ্ড।*

সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত :

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ

২। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

৩। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার

৪। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

J. H. Kerr, C. I. E., I. C. S., Secretary to the Government of Bengal লিখিত 2213 T. G., dated Darjeeling the 19th October 1912 তারিখের পত্রে তৎকালীন Governor in Council বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে পুস্তক প্রকাশের জন্য বার্ষিক ১২০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ১৯৭৫ সালেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ১২০০ টাকা বার্ষিক অনুদানই দিতেছেন, বারবার আবেদন করিয়াও উহা বাড়ানো যায় নাই। ১৯৭৫ অক্টোবরে Kerr সাহেবের এই পত্রখানি পরিষৎ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মহাধ্যক্ষ ও শিক্ষাসচিব মহাশয়কে দেখাইয়া তাঁহার নিকট এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার ও বিবেচনা প্রার্থনা করেন। এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্য পরিষদের প্রতি অনুকূলাত করিয়াছেন। আগামী বর্ষে পুস্তক প্রকাশের অনুদান বৃদ্ধির প্রত্যাশা করিতেছি।

চিত্রশালা

অপহৃত বিষ্ণুমূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

বিগত ২৯ শে মাঘ ১৩৮১ তারিখে আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত আন্তনি লস্লট্ দিয়াস্ কর্তৃক পরিষদের অপহৃত বিষ্ণুমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পাল রীতির এই বিষ্ণুমূর্তিটি পরিষদের সংগ্রহশালা হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি মধ্যরাত্রে অপহৃত হয়। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল, জাতীয় আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ভাষণ দেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার মূর্তি পুনরুদ্ধার সম্পর্কে সভায় বিবরণ দেন। বোস্টন হইতে পরিষদ্ মন্দিরে এই মূর্তি আনয়নের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল

শ্রীআন্তনি লন্সলট্ দিয়াস্, ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাওল, বোস্টন মিউজিয়ম অফ্ ফাইন আর্টস্-এর কিউরেটর য়ান্ ফন্টেন্ ও ডিরেক্টর মেরিল সী. র‍্যাপেল প্রমুখ ব্যক্তিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন সংগৃহীত মূর্তি

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালায় কষ্টিপাথর নির্মিত ১৫শ শতকের একটি সিংহবাহিনী মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার হাড়মাসড়া গ্রামে টেস্ট রিলিফের কর্মিগণ একটি মজা পুষ্করিণী খননকালে এই প্রাচীন কষ্টিপাথরের মূর্তিটি প্রাপ্ত হন। হাড়মাসড়া গ্রামের রায়পাড়ার রায় পরিবারে তিনজন যুবক এই মূর্তিটি পরিষৎ সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমারের হস্তে অর্পণ করেন। হাড়মাসড়ার এই যুবকত্রয় আর্থিক প্রলোভন পরিহার করিয়া যে আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তথা দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

২৯ শে চৈত্র ১৩৮১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রমেশ-ভবনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে মূর্তিটি প্রদর্শিত হয় এবং ঐ পুণ্যদিবসে পরিষদের চিত্রশালায় আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয়।

পুথিশালা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালা বিভিন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তির বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত বাঙালী জাতির চিন্তাজগতের এক অমূল্য রত্নমন্দির। আলোচ্য বর্ষে তালিকাভুক্ত সর্বপ্রকার পুথির সংখ্যা ৬৭৪৭। ইহাদের বিষয় বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বাংলা—৩৫৫০, সংস্কৃত—২৯২৭, হিন্দুস্থানী—২, তিব্বতী—২২৪, ফার্সী—১৩ পরিষদ প্রদত্ত বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে আছে **বাংলা পুথি :** দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ—৪১১, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ—২১, এবং গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ—৫৭। **সংস্কৃত পুথি :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংগ্রহ—৩২৪, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সংগ্রহ—১৩, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংগ্রহ—৬০, এবং গোপালদাস চৌধুরী সংগ্রহ—২৫৬। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসরেই কিছু কিছু বাংলা, সংস্কৃত এবং হিন্দুস্থানী পুথি বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি পরিষদ মন্দিরে প্রদান করেন। এই বৎসর ন' পাড়া নিবাসী শ্রীমতী সাবিত্রী দাস তাঁহার স্বামী স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ দাস কর্তৃক ব্যবহৃত একখানি সংস্কৃত পুঁথি এবং শ্রীযুক্ত ধীরাজ বসু মহাশয় একখানি পুরাতন বাংলা পুঁথি দিয়াছেন, তাঁহাদের এই দানের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্তমান বর্ষে একজন আমেরিকান মহিলাসহ মোট ১২ জন গবেষক ৭৭ খানি পুঁথি পরিষদ্ মন্দিরে বসিয়া ব্যবহার করিয়াছেন।

সাহিত্য পরিষদের ৮২-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় পরিষদের মূল্যবান প্রাচীন পুথি ও দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের উপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেন তাহা হইতে পুথি সংরক্ষণের আসবাব প্রস্তুত করা হইয়াছে ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হইয়াছে।

গ্রন্থশালা

আলোচ্য বর্ষে (১৩৮১) গ্রন্থাগারের কার্য্যাদি যথারীতি পরিচালিত হইয়াছে। এ বৎসর গ্রন্থাগার মোট ২৮৫ দিন খোলা ছিল এবং সর্বমোট ৯৮৩৯ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৪·৫২ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থাগারের লেন-দেন বিভাগেও মোট ২৮৫ দিন কাজ হয় এবং সর্বমোট ৫২০১ জন, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ১৮·২৪ জন পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। পাঠাগার ও লেন-দেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮ ও ৩৯ জন।

এ বৎসর গ্রন্থাগার বিভাগে মোট ১৯২১০ খানি, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৬৭·৪ খানি পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। ইহার মধ্যে লেন-দেন-পত্রকের সাহায্যে ৮১৪৬ খানি, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ২৮·৫৮ খানি, এবং পাঠাগারে ১১০৬৪ খানি, অর্থাৎ গড়ে দৈনিক ৩৮·৮২ খানি পুস্তকের আদান-প্রদান হয়। বিষয়ানুযায়ী ও ভাষানুযায়ী এই আদান-প্রদানের সংখ্যাগত হিসাব পরিশিষ্ট 'গ'-এ দেওয়া হইয়াছে।

১৩৮১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পঞ্জীকৃত (catalogued) পুস্তক তালিকা পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ দেওয়া হইল।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশানের নিকট হইতে পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বাঁধাইয়ের জন্য যে ৯,৭৫০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে মোট ২১০১ খানি পুস্তক আলোচ্য বৎসরে বাঁধানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু অবিরত ব্যবহারের ফলে গ্রন্থশালায় জীর্ণ পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন।

পরিষৎ গ্রন্থাগারে ছাত্র-সদস্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমকালীন গ্রন্থাবলী সরবরাহ করা সম্ভবপর হইতেছে না। এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে দীর্ঘ দিনের পরিত্যক্ত গ্রন্থাবলী ও অব্যবহার্য জিনিসপত্রের স্তূপ হইতে অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক ও পত্রিকা উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

১৩৮১ বঙ্গাব্দে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৫৬৯ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে—যাহার আনুমানিক মূল্য ৩৬৩৮ টাকা। যাঁহারা উপহার দানে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৮০ বর্ষের কার্ত্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র সংখ্যা দুইটি এবং ১৩৮১ বর্ষের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যাটি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৮১ বর্ষের শ্রাবণ-চৈত্র সংখ্যার মুদ্রণ শেষ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট 'স্টেট লেভেল কমিটি'র নিয়ন্ত্রিত মূল্যের কাগজের জন্য সাহিত্য পরিষৎ আবেদন করিয়াছেন। ঐ আবেদন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ঐ কাগজ পাওয়া গেলে পরিষদের এই দুর্দিনেও গবেষণামূলক গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সহজ-সাধ্য হইবে।

বহুকাল পূর্বে বঙ্গীয় সরকার পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের জন্য বার্ষিক ২,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও পর্যন্ত সেই ২,০০০ টাকা অনুদানই পরিষদকে দিতেছেন। এজন্য গত কয়েক বৎসর পরিষদের পক্ষ হইতে আবেদন-নিবেদন করিয়াও অনুদান বৃদ্ধি করাইতে পারি নাই। আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শিক্ষা-মহাধ্যক্ষ ও শিক্ষাসচিব শ্রীদিলীপ-কুমার গুহ, আই. এ. এস. মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরিষৎ সম্পাদকের আলোচনার পর পরিষৎ-পত্রিকার জন্য অনুদান বৃদ্ধির আশ্বাস তাঁহারা দিয়াছেন এবং সরকারী পর্যায়ে এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতিও হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই অনুদান বৃদ্ধি হইবে আশা করিতেছি।

পরিষৎ বাংলা অভিধান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পূর্ণাঙ্গ সর্বাত্মক অভিধান রচনার সংকল্প গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য অগ্রসর হইতেছেন। 'কালিদাস মল্লিক ট্রাস্ট ফাণ্ড' এই কাজের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা 'আরতি মল্লিক গবেষণা-বৃত্তি' দিতেছেন। 'রামকমল সিংহ-স্মৃতি তহবিলে'র আমানতের সুদ হইতে মাসিক ১৫০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। এই সীমিত আর্থিক সাহায্যে এই বিরাট কাজ সম্পন্ন করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে। এই কাজে সহযোগিতার জন্য অবৈতনিক গবেষকদের স্বেচ্ছাশ্রম পরিষৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এ বিষয়ে অবসর সময়ে অভিধান সংকলন কার্যে সহায়তা করিতেছেন। পরিষদের ৮২তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট এই কাজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা পরিষৎ সম্পাদক প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং উপাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষককে এই কার্য্যে সহযোগিতার জন্য প্রেরণ করিবেন আশ্বাস দিয়াছিলেন। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক এ বিষয়ে সহায়তার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পরিষৎ এই বিরাট কার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। *পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য আর্থিক* অনুদানের আবেদন করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পন পেশ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের বিবেচনাধীন আছে। ইতিমধ্যে পরিষৎ সভাপতি ও পরিষৎ সম্পাদকের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রা ত প্রতিনিধি প্রাপ্তাবসর আই-সী-এস শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কয়েকবার আলোচনা করিয়াছেন এবং আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যের প্রত্যাশা করিতেছি।

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পরিশিষ্ট 'গ'

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮১

বিষয়ানুযায়ী

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
দর্শন (১০০)	৬৪	৭৫	১৩৯
ধর্ম (২০০)	১৬৪	২৭৯	৪৪৩
সমাজ-বিজ্ঞান (৩০০)	৮১	২০৭	২৮৮
শিক্ষা (৩৭০)	২৪	২১৭	২৪১
ভাষা (৪০০)	৫৩	২০২	২৫৫
বিজ্ঞান (৫০০)	৩৭	৪৮	৮৫
ফলিত-বিজ্ঞান (৬০০)	১৪	৫২	৬৬
শিল্পকলা (৭০০)	৩৪	৩৩	৬৭
সঙ্গীত (৭৮০)	৮১	১২০	২০১
সাহিত্য (৮০০)	৬৮৮৩	৩৭৯০	১০৬৭৩
ভূগোল, বর্ণনা ও ভ্রমণ (৯১০)	১৮৮	৮৬	২৭৪
জীবনী (৯২০)	৩৭২	৭৪৯	১১২১
ইতিহাস (৯৩০-৯৯৯)	১১৬	৩৭৪	৪৯০
সহায়ক গ্রন্থ (০০০)	৩৫	৩৫২	৩৮৭
পত্র-পত্রিকা		৪৪৮০	৪৪৮০
	৮,১৪৬	১১,০৬৪	১৯,২১০

ভাষানুযায়ী

	লেনদেন	পাঠকক্ষ	মোট
বাংলা	৮,১৪৬	১১,০৬৪	১৯,২১০
ইংরাজী	৪৩	৯৭২	১,০১৫
সংস্কৃত	৩৬	১০৮	১৪৪
হিন্দী	—	—	—
	৮,২২৫	১২,১৪৪	২০,৩৬৯

পরিশিষ্ট 'ঘ'

পঞ্জীকৃত পুস্তক

১৩৮১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগারে পঞ্জীকৃত গ্রন্থ—৯৯১

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

দ্ব্যশীতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক—চৈত্র
১৩৮২

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

দ্ব্যশীতিতম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৮২

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৮২-তম বর্ষ ॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ॥

কার্ত্তিক-চৈত্র

১৩৮২

সূচীপত্র

আলোকচিত্র

১। মুর্শিদাবাদ জেলার ভট্টমাটি গ্রামের অবহেলিত ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির (terracotta) কাজ।

২। নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত চালাঘরের খুঁটিতে অপূর্ব কাঠের কাজ খুঁটিটি বর্তমানে টেবিলের আকারে রূপান্তরিত।

৩। প্রাচীন মন্দিরের দরজায় কাঠের কাজ। নদীয়ার ধর্মদা গ্রাম থেকে সংগৃহীত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৮৩-তম বর্ষ ॥ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ॥

মুর্শিদাবাদ জেলার ভট্টমাটি গ্রামের অবহেলিত ধ্বংসপ্রায় মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির (terracotta) কাজ।

[আলোকচিত্র : শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়]
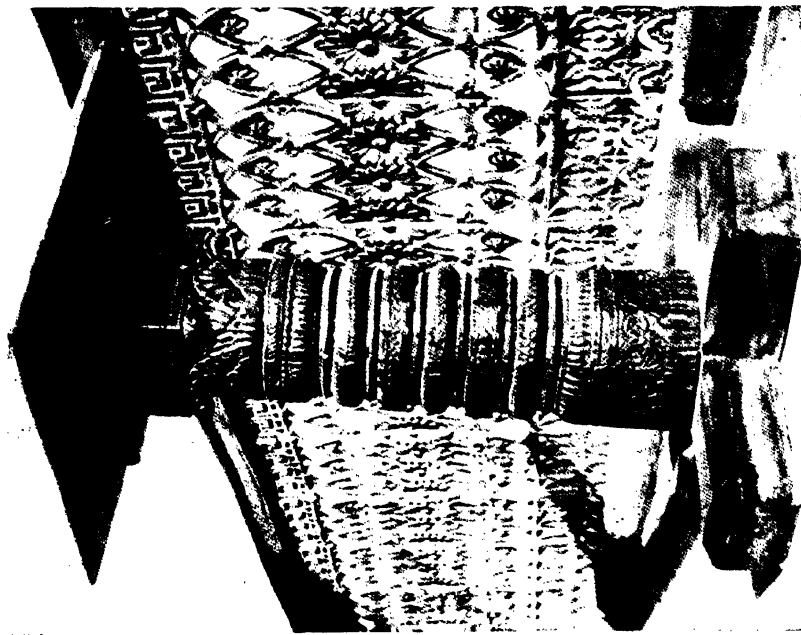
নদীয়া   লার নাকাশীপাড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত চালাঘরের খুঁটিতে অপর্ব কাঠের কাজ। খুঁটিটি বর্তমানে টেবিলের পায়ায় রূপান্তরিত

'আলোকচি   ত্রী
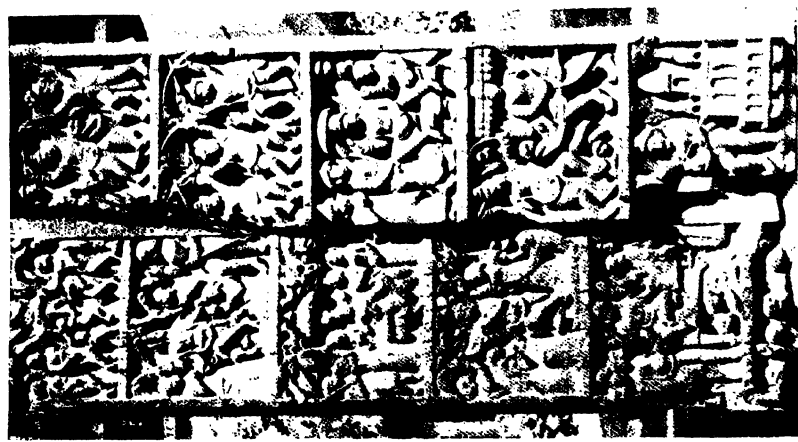
প্রাচীন মন্দিরে   রজায় কাঠের কাজ

গ্রাম   থেকে সংগৃহীত।

সিলেব্‌ল্‌-কে 'অক্ষর' বলি না কেন?

প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলায় সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার করলে যে 'অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়' এ কথা অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে[১] স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতিতে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হয়েছি। কেন বিভ্রান্তি হয় তাও তিনি দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন—'বাংলায় অনেক সময় অক্ষর শব্দের অর্থ ধরা হয় হরফ।' একটু পরেই আবার বলেছেন, 'অক্ষর ও হরফ সমার্থক বলিয়া অনেক সময় মনে করা হয়', আর এ-রকম মনে করা হয় বলেই বিভ্রান্তি ঘটে। যেমন, 'রাখাল গরুর পাল নিয়ে [লয়ে] যায় মাঠে'—এখানে হরফের সংখ্যা ১৪, কিন্তু সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা ১০। বলা বাহুল্য, অমূল্য বাবুর এই হিসাব নির্ভুল। কিন্তু দীর্ঘকালের (বোধ করি ভারতচন্দ্রের সময় থেকে) সংস্কারবশতঃ সব বাঙালিই বলে থাকেন যে, এই লাইনটিতে আছে ১৪ 'অক্ষর'। কেননা তাঁরা হরফকেই অক্ষর বলে অভ্যস্ত, সিলেব্‌ল্‌কে নয়। অমূল্য বাবুর মতো কেউ বলেন না, এখানে হরফসংখ্যা ১৪ আর অক্ষরসংখ্যা ১০। এটা বাঙালির জাতীয় অভ্যাসদোষ হতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের সংস্কারজাত অভ্যাসদোষ সংশোধন করার দুশ্চেষ্টা না করে সিলেব্‌ল্‌-এর নূতন প্রতিশব্দ রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ কথা বহুকাল পূর্বেই বুঝেছিলেন **রামমোহন**। তাঁর ইংরেজি *Bengalee Grammar* গ্রন্থে (১৮২৬) আছে—"The first is called পয়ার consisting of two lines, both ending in the same vowel and consonant. Each line conists of fourteen *consonants or disjoined vowels*, divided into not less than seven or more than fourteen *syllables*."

এই অংশটারই বাংলা অনুবাদ আছে তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে (১৮৩৩)—"প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে একজাতীয় হল্‌ ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ **অক্ষর** হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে, চতুর্দশের অধিক নহে **ধ্বন্যাঘাত** হইয়া থাকে।"

দুই গ্রন্থেই পয়ারের দুটি করে অভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এই—

ডাক্‌ হাঁক্‌ ঢাক্‌ ঢোল মাল্‌ সাট্‌ সার্‌।
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার ॥

এই দৃষ্টান্তের প্রত্যেক Syllable বা ধ্বন্যাঘাতের উপরে ১, ২ ক্রমে অঙ্ক বসিয়ে দেখানো হয়েছে যে, এর প্রথম চরণে ধ্বন্যাঘাত আছে ৭টি আর দ্বিতীয় চরণে আছে ১২টি। অথচ উভয় চরণেই অক্ষর-সংখ্যা ১৪। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—(১) রামমোহনের মতে বাংলায় অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্‌ নয়, (২) সেজন্য সিলেব্‌ল্‌ বোঝাবার জন্য তাঁকে 'ধ্বন্যাঘাত' এই নূতন পারিভাষিক শব্দটি রচনা করতে

১ 'কালি ও কলম' ১৩৮১ আশ্বিন

জলার নাকাশীপাড়া গ্রাম থেকে সংগৃহীত চালাঘরের খুঁটিতে অপর্ব কাঠের কাজ। খুঁটিটি বর্তমানে টেবিলের পায়ায় রূপান্তরিত।

প্রাচীন মন্দি রজায় কাঠের কাজ
ম থেকে সংগৃহীত।

সিলেব্‌ল্‌-কে 'অক্ষর' বলি না কেন?

প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলায় সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার করলে যে 'অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়' এ কথা অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে[১] স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতিতে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হয়েছি। কেন বিভ্রান্তি হয় তাও তিনি দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন—'বাংলায় অনেক সময় অক্ষর শব্দের অর্থ ধরা হয় হরফ।' একটু পরেই আবার বলেছেন, 'অক্ষর ও হরফ সমার্থক বলিয়া অনেক সময় মনে করা হয়', আর এ-রকম মনে করা হয় বলেই বিভ্রান্তি ঘটে। যেমন, 'রাখাল গরুর পাল নিয়ে [লয়ে] যায় মাঠে'—এখানে হরফের সংখ্যা ১৪, কিন্তু সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা ১০। বলা বাহুল্য, অমূল্য বাবুর এই হিসাব নির্ভুল। কিন্তু দীর্ঘকালের (বোধ করি ভারতচন্দ্রের সময় থেকে) সংস্কারবশতঃ সব বাঙালিই বলে থাকেন যে, এই লাইনটিতে আছে ১৪ 'অক্ষর'। কেননা তাঁরা হরফকেই অক্ষর বলে অভ্যস্ত, সিলেব্‌ল্‌কে নয়। অমূল্য বাবুর মতো কেউ বলেন না, এখানে হরফসংখ্যা ১৪ আর অক্ষরসংখ্যা ১০। এটা বাঙালির জাতীয় অভ্যাসদোষ হতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের সংস্কারজাত অভ্যাসদোষ সংশোধন করার দুশ্চেষ্টা না করে সিলেব্‌ল্‌-এর নূতন প্রতিশব্দ রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ কথা বহুকাল পূর্বেই বুঝেছিলেন **রামমোহন**। তাঁর ইংরেজি *Bengalee Grammar* গ্রন্থে (১৮২৬) আছে—"The first is called পয়ার consisting of two lines, both ending in the same vowel and consonant. Each line conists of fourteen *consonants or disjoined vowels,* divided into not less than seven or more than fourteen *syllables.*"

এই অংশটারই বাংলা অনুবাদ আছে তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে (১৮৩৩)—"প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে একজাতীয় হল্‌ ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ **অক্ষর** হয়, তাহাতে সাত হইতে ন্যূন নহে, চতুর্দশের অধিক নহে **ধ্বন্যাঘাত** হইয়া থাকে।"

দুই গ্রন্থেই পয়ারের দুটি করে অভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এই—

ডাক্‌ হাঁক্‌ ঢাক্‌ ঢোল মাল্‌ সাট্‌ সার্‌।
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার ॥

এই দৃষ্টান্তের প্রত্যেক Syllable বা ধ্বন্যাঘাতের উপরে ১, ২ ক্রমে অঙ্ক বসিয়ে দেখানো হয়েছে যে, এর প্রথম চরণে ধ্বন্যাঘাত আছে ৭টি আর দ্বিতীয় চরণে আছে ১২টি। অথচ উভয় চরণেই অক্ষর-সংখ্যা ১৪। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—(১) রামমোহনের মতে বাংলায় অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্‌ নয়, (২) সেজন্য সিলেব্‌ল্‌ বোঝাবার জন্য তাঁকে 'ধ্বন্যাঘাত' এই নূতন পারিভাষিক শব্দটি রচনা করতে

---

১ 'কালি ও কলম' ১৩৮১ আশ্বিন

হয়েছে, আর (৩) বাংলা 'অক্ষর' (অর্থাৎ হরফ) শব্দের কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই, তাই তাঁকে consonant বা disjoined vowel বলে পরোক্ষভাবে বাংলা অক্ষর বোঝাতে হয়েছে।

রামমোহনের রচিত পরিভাষা সম্পর্কে বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য **সুনীতিকুমার** কি বলেন, এবার তাই দেখা যাক। তাঁর 'মনীষী স্মরণে' গ্রন্থের "ব্যাকরণকার রামমোহন" প্রবন্ধে (পৃ ৪-৫) বলা হয়েছে—

> "তিনি···প্রয়োজনবোধে অনেক নোতুন পরিভাষা রচনা করেছেন, নোতুন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। মাতৃভাষার ব্যাকরণে প্রযোজ্য নোতুন পরিভাষা রচনা রামমোহনের অন্যতম কৃতিত্ব। মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ পরিভাষার যে প্রয়োজন আছে, এ কথা মানতেই হবে। রামমোহন বাঙলা ব্যাকরণশাস্ত্রের নোতুন পরিভাষা রচনা করে মাতৃভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। রামমোহনের তৈরী কতকগুলি পরিভাষার সার্থকতা আর প্রয়োজ্যতা আজও স্বীকার করতে হবে।···রামমোহনের কয়েকটি পরিভাষা আজকের দিনে গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু বাঙলা ভাষার ব্যাকরণে নোতুন পরিভাষা প্রণয়নের আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করতেই হবে।"

এই উক্তি বাংলা ছন্দ-ব্যাকরণ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এইজন্যই রামমোহন বাংলা ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ বোঝাবার জন্য নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর রচিত "ধ্বন্যাঘাত" শব্দটি আজকের দিনে গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু বাংলায় সিলেব্‌ল্-বোধক "নোতুন পরিভাষা প্রণয়নের আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করতেই হবে।" কারণ বাংলায় প্রচলিত অর্থে অক্ষর আর ইংরেজি সিলেব্‌ল্ অভিন্ন নয়। তাই বাংলায় ইংরেজি সিলেব্‌ল্ অর্থে 'অক্ষর' শব্দটি চালাতে গেলে 'অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়', এ কথা অমূল্য বাবুও স্বীকার করেছেন। রামমোহন এ কথা বুঝেছিলেন দেড়শো বছর আগে। আধুনিক কালেও দ্বিজেন্দ্রলাল-সত্যেন্দ্রনাথ এবং রাজশেখর-কালিদাস রায় থেকে নীরেন্দ্রনাথ-শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত অনেকেই 'বাংলা' অক্ষর ও ইংরেজি সিলেব্‌ল্ অভিন্নার্থক বলে মনে করেন না। তাঁরা অনেকেই সিলেব্‌ল্-বোধক নূতন শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমিও পূর্বগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'দল' এই নূতন শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কেননা বাংলা ছন্দ-আলোচনায় সিলেব্‌ল্-বোধক নূতন পরিভাষা প্রণয়নের আবশ্যকতা যে আছে সে কথা মানতেই হবে। আমি কেন সিলেব্‌ল্ অর্থে এই 'দল' শব্দটি ব্যবহার করি সে কথা অন্যত্র[১] যথাসাধ্য পরিষ্কার করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এখানে অক্ষর ও সিলেব্‌ল্ সম্পর্কে আরও কয়েকজনের অভিমত কি বিবেচনা করে দেখা যাক।

শ্যামাচরণ শর্মসরকার বিদ্যাভূষণ (১৮১৪-৮২) ছিলেন রামমোহনের ন্যায় একজন বহু-ভাষাভিজ্ঞ মহাপাণ্ডিত ব্যক্তি। কোনো কোনো ব্যক্তি তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন 'অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনী-ভুজঙ্গঃ।' তাঁর *Introduction to the Bengalee Language* গ্রন্থের (১৮৫০) ছন্দ-বিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

১ দ্রষ্টব্য 'সিলেব্‌ল্-কে 'দল' বলি কেন ?' প্রবন্ধ, সাপ্তাহিক 'অমৃত' ১৩৮২ ভাদ্র ১২ ও ১৯

"In measures originally Bengalee, no number and quantity of syllables are observed, the measures being formed solely in consideration of the number of *letters, simple or compound*; no matter whether each of them forms a *full syllable* or not; thus for instance the following two lines—

ডাক্ ডাক্ হাঁক্ হাঁক্ মাল্ সাট্ সার্ ।
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার ॥

The first contains only 7 *syllables* in it, and the second 12 and yet both of them are perfect poetical lines of the same পয়ার measure, because they contain the equal number (14) of *letters* in each and are equally harmonious to the ear."

এই কথাগুলিরই বাংলা প্রতিরূপ পাওয়া যায় তাঁর 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' গ্রন্থের (১২৫৯) নবম পরিচ্ছেদে ।—

"বাঙ্গলা বলিয়া খ্যাত যে যে ছন্দ তাহাতে এক অসংযুক্ত স্বর বা হল্, স্বরযুক্ত হল্ অথবা দুই বা অধিক হলে সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া গণিত হওয়াতে, এক হসন্ত বর্ণও এক বর্ণ গণিত হয় । যথা···

ডাক্ ডাক্ হাঁক্ হাঁক্ মাল্ সাট্ সার ।
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার ।"

এখানে তিনটি দৃষ্টান্ত আছে। এটি তৃতীয়। এটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম "চরণের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ বর্ণ স্বরহীন হওয়াতে **সংস্কৃত পদ্যে বর্ণ বলিয়া গণ্য নয়,** কিন্তু বাঙ্গলায় অন্য যে কোন বর্ণের সঙ্গে সমান রূপে গণিত হইয়া ছন্দ মিলিত হয়, যথা উক্ত দৃষ্টান্তে হইল ।"

এখানে বলা উচিত যে, ইংরেজি ও বাংলা উভয় গ্রন্থেই এই দৃষ্টান্তের প্রত্যেক letter বা বর্ণের উপরে ১, ২ ক্রমে অঙ্ক বসিয়ে দেখানো হয়েছে যে, এর উভয় চরণেই বর্ণ-সংখ্যা ১৪। লক্ষ্য করার বিষয়— (১) রামমোহন যাকে বলেন 'অক্ষর' শ্যামাচরণ তাকেই বলেছেন "বর্ণ"; (২) স্বরান্তই হক আর 'হসন্ত' (অর্থাৎ স্বরহীন) হক, সব বর্ণই পুরো একবর্ণ বলে গণ্য; (৩) সংস্কৃত বর্ণ (অক্ষর) আর বাংলা বর্ণ (অক্ষর) অভিন্ন নয়; (৪) বর্ণসংখ্যার সমতার দ্বারাই বাংলা ছন্দের ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হয়, অর্থাৎ তাঁর মতে বাংলা ছন্দ হচ্ছে আসলে বর্ণবৃত্ত—অবশ্য বাংলা অর্থে, সংস্কৃত অর্থে নয়; (৫) syllable শব্দের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ তিনি ব্যবহার করেন নি; (৬) বাংলা 'বর্ণ' (অক্ষর) শব্দের ইংরেজি তিনি সোজাসুজি করেছেন letter, রামমোহনের মতো ঘুরিয়ে বলার প্রয়াস করেন নি—যদিও বাংলা বর্ণ বা অক্ষর আর ইংরেজি letter অভিন্নার্থক নয়। বস্তুতঃ 'বাংলা' বর্ণ বা অক্ষরের কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। তেমনি ইংরেজি syllable-এর কোনো বাংলা বা ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই। সংস্কৃত (তথা প্রাকৃত) অর্থে অক্ষর বা বর্ণকে সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দ বলে ধরে নিলেও, বাংলায় চালাতে গেলে বিভ্রাট ঘটে। রামমোহন ও শ্যামাচরণের প্রয়োগ থেকেই তা বোঝা যায় ।

২

বেচারি **হালহেড** হলেন সাহেব মানুষ। তাঁর পক্ষে বাংলা বর্ণ বা অক্ষরের অর্থগত জটিলতা বোঝা সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে যে কোনো সমস্যা থাকতে পারে, তাই তিনি বুঝতে পারেন নি। তাই তিনি এক কোপেই Gordian knot (জটিল গ্রন্থি) কেটে ফেললেন। দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি বাংলা বর্ণ বা অক্ষরকে বললেন syllable। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *A Grammar of the Bengalee Language* গ্রন্থের (১৭৭৮) একটি অধ্যায়ে (on Versification, পৃ ২০১-০২) বলা হয়েছে—

"The common heroic measure of the Bengalese is a distich[1] consisting generally *14 syllables* and have a trochaic accent : as

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী।
গোকুল রাখিলা জয়া যশোদা নন্দিনী ॥[2]

This species is called পয়ার।"

কিন্তু হালহেড অসতর্ক ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একেবারে না ভেবেচিন্তেই যে syllable শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তা নয়। তা বোঝা যায়—প্রথমতঃ তাঁর দৃষ্টান্ত নির্বাচন থেকে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর লিপ্যন্তরণ তথা তাঁর স্বীকৃত উচ্চারণপদ্ধতি থেকে। উপরের দৃষ্টান্তটিতে একমাত্র 'গোকুল' শব্দটিই অকারান্ত এবং বাঙালির মুখে হলন্তরূপে উচ্চারিত, বাকি কোনো শব্দই হলন্তরূপে উচ্চারিত নয়। তাই এই দৃষ্টান্তে অক্ষর (বা বর্ণ) ও সিলেব্‌ল্‌ সমার্থক বলে গণ্য হতে বিশেষ বাধা নেই। তিনি বুঝেশুনেই এই দৃষ্টান্তটি নির্বাচন করেছিলেন। আর 'গোকুল' শব্দের সমস্যাকে তিনি নিরস্ত করেছিলেন এটিকে স্বরান্ত রূপে উচ্চারণ করে। প্রমাণ তাঁর নিম্নরূপ লিপ্যন্তরণ।

"doorggaa doorggaa pora toomee doorgotee naasheenee
gokoolo rakheelaa joyaa joshodaa nondeenee."

ঠিক এই কাণ্ডটিই করেছিলেন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত পাদরী **উইলিয়ম ইয়েটস্‌** সাহেব (১৭৯২-১৮৪৫)। তবে তিনি আরও সেয়ানা। তাঁর *Introduction to the Bengali Language* গ্রন্থ (দুই খণ্ড) প্রকাশিত হয় (১৮৪৭) তাঁর মৃত্যুর পরে। সম্পাদনা করেন তাঁর সহকর্মী পাদরী জে. ওয়েঙ্গার। তার দুই বৎসর পরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত ব্যাকরণ অংশ ওয়েঙ্গার কর্তৃক পুনঃসম্পাদিত হয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যাদিসহ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হয় (১৮৪৯) *Bengali Grammar* নামে। এই গ্রন্থের ছন্দ-প্রকরণের (দশম অধ্যায়) গোড়াতেই ইয়েট্‌স্‌ সাহেব বলে রেখেছেন যে, বাংলা পদ্যরচনায়—

---

১ Distich (ডিস্‌টিক্‌) শব্দের মানে যুগ্মক (couplet), অর্থাৎ দুটি ছন্দপঙ্‌ক্তির সমবায়ে গঠিত পদ্যাংশ। আর hemistich শব্দের মানে ছন্দপঙ্‌ক্তির অর্ধাংশ। যেমন—'দুর্গা দুর্গা পরা তুমি'।

২ *কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যে (প্রথম ভাগ), 'কলিঙ্গরাজের স্তব' অংশের দুই পঙ্‌ক্তি। পাঠান্তর—'গোকুলরক্ষিণী'* জয়া (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রিত নূতন সং ১৯৫৮, পৃ ১২৯); দুর্গা দুর্গা পরা 'মাতা' (বঙ্গবাসী, তৃতীয় সং ১৩৩২, পৃ ৩৪)।

"A word is not pronounced as in prose, but every consonant has a vowel after it, though in prose it has none[১] ; thus in prose we have *dwāpar*, in verse *dwāpara*, in prose *man*, in verse *mana* etc."
অতএব বাংলা অক্ষর ও সিলেব্‌ল্‌-এর পার্থক্য স্বীকারের আর কোনো প্রয়োজনই রইল না। তাই তিনি অবলীলাক্রমেই বলতে পারলেন—
"All that is required is that the verse should have a certain number of *syllables* and that the final of one given number of *syllables* should jingle with the final of another given number."

এই প্রসঙ্গে ইয়েটস্‌ সাহেবের পয়ারের স্বরূপ বর্ণনাটাও স্মরণীয়—
"The metre (*chhanda*) most commonly used in Bengali Poetry is that called *Payār*, which consists of fourteen *syllables* to the *Pād*... The fourteen syllables are divided into two parts, the first containing eight, the second six *syllables*."

পয়ারপঙ্‌ক্তির আট ছয় মাত্রার দুই ভাগে বিভাজ্যতার কথা হালহেড বা রামমোহনের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। শ্যামাচরণ কিন্তু এই বিভাগের কথা প্রায় মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর ইংরেজি ব্যাকরণে (১৮৫০) আছে—
"The easiest and most common of all such measures is the পয়ার measure. Each line of this measure consists of 14 letters and elegantly has a ceasura after the eighth letter."

তাঁর বাংলা ব্যাকরণে (১২৫৯) বলা হয়েছে—"পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ বর্ণ থাকে ; তন্মধ্যে অষ্টম ও নবমের মধ্যে (উচ্চারণ-সুগমতার জন্য) প্রায় এক যতি থাকে।" শ্যামাচরণ কিন্তু আট-ছয় মাত্রার বিভাগকে পয়ারের অত্যাজ্য লক্ষণ বলে মনে করতেন না। তাঁর elegantly, 'উচ্চারণসুগমতার জন্য' এবং 'প্রায়', এই তিনটি উক্তি থেকেই তা বোঝা যায়।[২] তিনি ছিলেন অতি সতর্ক ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিশ্লেষক। যা হক, পয়ারের যতি-বিধানের কথাটা আলোচ্যমান বিষয়ের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

আমাদের বিবেচ্য বিষয়, বাংলা অক্ষরকে ইংরেজিতে কি বলা যায়, সিলেব্‌ল্‌ বলা যায় কিনা। আমরা দেখলাম, হালহেড ও ইয়েট্‌স্‌ এই দুই সাহেবই ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ শব্দকেই অক্ষরের প্রতিশব্দ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু তার জন্য দুজনকেই বাংলার স্বাভাবিক হসন্ত উচ্চারণকে (অন্ততঃ

---

১ বলা বাহুল্য, কোনো বাঙালি গদ্যে হসন্ত-উচ্চারিত শব্দকে পদ্যে স্বরান্তরূপে উচ্চারণ করতেন না। রামমোহন এবং শ্যামাচরণ যে করতেন না তা তাঁদের পূর্বোদ্‌ধৃত আলোচনাতেই সুস্পষ্ট। মধুসূদনও মেঘনাদ শব্দকে Meghnad রূপেই উচ্চারণ করতেন, Meghanada রূপে নয়।

২ তুলনীয় : পজ্‌ঝটিকা ছন্দের লক্ষণনির্দেশ উপলক্ষে গঙ্গাদাসের উক্তি—নবমগুরুত্ব'বিভূষিতগাত্রা।' —ছন্দোমঞ্জরী ৬।১৫।

পদ্যরচনায়) অস্বীকার করতে হয়েছে। এসব কারণেই সাহেবদের লেখা ব্যাকরণকে লক্ষ্য করে শ্যামাচরণ তাঁর 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"বিজাতীয় মহাশয়েরা যে দুই-একখানি লিখিয়াছেন তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে।"

৩

মাইকেল **মধুসূদন** (১৮২৪-৭৩) আর-এক সাহেব, 'ডাহা ইংরেজ'। কিন্তু সাহেব হলেও তিনি বাঙালি-সন্তান। তাই ধরে নেওয়া যায়, তিনি আর সব বাঙালির মতোই গদ্যের হসন্ত শব্দকে পদ্যেও হসন্তরূপেই উচ্চারণ করতেন, অর্থাৎ হালহেড-ইয়েট্‌সের মতো গদ্যের হসন্তকে পদ্যে স্বরান্ত করতেন না। কিন্তু তবু তিনি স্বরান্ত-হসন্ত-নির্বিশেষে সব বাংলা অক্ষরকেই 'সিলেব্‌ল্' বলে গণ্য করলেন। এ বিষয়ে তিনি সাহেবদেরও ছাড়িয়ে গেলেন। তাজ্জব ব্যাপার নয়? তাই তিনি অবলীলাক্রমেই বললেন—"our 7 footed verse is *our* heroic verse।" সাহেবরাও বাংলা পয়ারকে '7 footed verse' বলতে সাহস পান নি।[১] যা হক, তিনি অক্ষরকে কি বলেন দেখা যাক। অমিত্রাক্ষর পয়ারের প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে লেখেন—

"So many fellows have, of late, been at me to explain the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th and 12th."

দেখা যাচ্ছে, তিনি স্বরান্ত ও হসন্ত উভয় প্রকার অক্ষরকেই নির্বিচারে সিলেব্‌ল্ বলে গণ্য করতেন। এর চেয়েও চমকপ্রদ একটি উক্তি আছে রাজনারায়ণকে লেখা আর-এক পত্রে।—

"Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the *Meghnad*. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you *improve the music of the line, because the double syllable* ন্ত mars the *strength of* লা।"

দেখা যাচ্ছে, মধুসূদন বাংলা "যুক্তাক্ষর" শব্দটাকেই বলেছেন double syllable। কোনো ইংরেজ-সন্তান double syallble বলতে কি বুঝবেন? ইংরেজি ধারণায় তথা

১ কিন্তু আধুনিক কালের বাঙালি কবি বিষ্ণু দে পয়ার ছন্দের প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমাদের সপ্তপদী বা সপ্তমাত্রিক পদ্যই আমাদের হিরোইক মেসার।" বলা বাহুল্য, সপ্তপদী ও সপ্তমাত্রিক কথা-দুটি যথাক্রমে 7 footed ও heptameter শব্দেরই বাংলারূপ।

ইংরেজি ভাষায় double syllable বলে কোনো বস্তু আছে কি ? শ্যামাচরণ সরকার যাকে বলেছেন compound *letter*,[২] মধুসূদন তাকেই বললেন double *syllable*। সাহেবরা syllable শব্দের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিলেন। আর মধুসূদন বাংলা 'অক্ষর' শব্দের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ শব্দের তাৎপর্যহানি ঘটাতেও দ্বিধা করেন নি। শ্যামাচরণ বাংলা অক্ষরকে বলেছেন letter, simple or compound। তাতে ইংরেজি letter শব্দের তাৎপর্যও রক্ষিত হয় নি, বাংলা অক্ষর (বর্ণ) শব্দের বিচিত্র প্রকৃতিটাও যথাযথ রূপে ব্যক্ত হয় নি।

আসলে বাংলা 'অক্ষর' শব্দের অর্থটাই অদ্‌ভুত ও জটিল। তার চার মূর্তি—স্বরান্ত অযুক্ত, স্বরান্ত যুক্ত, বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন, বিশুদ্ধ স্বর (তারও দুই রূপ—পূর্ণস্বর ও খণ্ডস্বর, যেমন—দিও, দাও্)। তাই বাংলা অক্ষরকে কেউ বলেছেন letter, কেউ বলেছেন syllable। কোনোটাতেই ঠিক ঠিক অক্ষর বোঝায় না। রামমোহন তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি বাংলা অক্ষরকে letter বলেন নি, syllableও বলেন নি ; বলেছিলেন consonants or disjoined vowels। তাতেও কিন্তু বাংলা অক্ষরের জটিল প্রকৃতিটি প্রকাশ পায় নি। বস্তুতঃ বাংলা অক্ষর এমনই একটা অদ্‌ভুত বস্তু যে, কোনো বিদেশী ভাষায় তার প্রতিশব্দ প্রত্যাশা করা যায় না, এমন কি নূতন করে রচনা করাও সম্ভব নয়। আধুনিক কালে বাংলা অক্ষর বোঝাবার জন্য আমি এক সময়ে 'হরফ' শব্দটা ব্যবহার করতাম। পরে রাজশেখর বসু-প্রমুখ কেউ কেউ করেছেন, এখনও কেউ কেউ করেন। কিন্তু 'হরফ' শব্দের দ্বারা বাংলা অক্ষরের বিচিত্র প্রকৃতিটা ঠিকমতো প্রকাশিত হয় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হওয়াতে দীর্ঘকাল পূর্বেই আমি এই শব্দটা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, এ শব্দটা চালানো নিষ্প্রয়োজন বলেও বোধ করেছি। তা ছাড়া, অক্ষর আর হরফ যদি অভিন্নার্থক বলে স্বীকৃত হয়ও তবু সমস্যা থেকে যায়। হরফ শব্দের ইংরেজি কি ? তারও মীমাংসা নেই।

৪

এতক্ষণ যে আলোচনা করা গেল তার থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌ শব্দ দিয়ে 'বাংলা' অক্ষর শব্দের স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ এই দুই শব্দ অভিন্নার্থক নয়, একে অন্যের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হতে পারে না। অতএব বাংলায় ইংরেজি সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'অক্ষর' শব্দটা চালাতে গেলে বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী।

"রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে"—এখানে চৌদ্দটা অক্ষর বা বর্ণ আছে, এ কথা বাংলায় বলা চলে এবং সর্বদাই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে চৌদ্দটা সিলেব্‌ল্‌ আছে এ কথা বলা চলে না। সুতরাং অক্ষর মানে সিলেব্‌ল্‌ ধরে যদি বলি এখানে "অক্ষর" আছে দশটা, তাহলে বাঙালি পাঠকের পক্ষে যে গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি হবে তার থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় থাকবে না। যদি বলি জল, দিন, রাত প্রভৃতি শব্দে আছে একটি করে অক্ষর, তাহলে বাঙালি পাঠকের মনে আমার প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধেই

২ রবীন্দ্রনাথও যুক্তাক্ষরকে compound *letter*-ই বলেছেন, syllable নয়। স্মরণীয় কবির উক্তি—"*In Manasi*, I first used compound letters as equivalent to two *matras*."—এড্‌ওয়ার্ড টম্‌সন : *Rabindranath Tagore*. দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৪৮), পৃ ১৭৪।

সন্দেহ জাগবে। তেমনি বাদলা, পশমী প্রভৃতি শব্দে দুই অক্ষর আর আকবর, সুলতান প্রভৃতি শব্দেও দুই অক্ষর বলা নিরাপদ্ হবে না। কিন্তু যদি বলি দিন শব্দে দুই অক্ষরে এক সিলেব্‌ল্, পশমী শব্দে তিন অক্ষরে দুই সিলেব্‌ল্, সুলতান শব্দ চার অক্ষরে দুই সিলেব্‌ল্ তাহলে আমার বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে কারও সংশয় থাকবে না। তেমনি strength শব্দে এক অক্ষর আর distinct শব্দে দুই অক্ষর, এমন কথা অন্ততঃ বাংলা ভাষায় বলা চলবে না। বলতে হবে strength শব্দে আট-অক্ষরে এক সিলেব্‌ল্ আর distinct শব্দে আট-অক্ষরে দুই সিলেব্‌ল্। অর্থাৎ মানতেই হবে, (১) বাংলা অক্ষর আর সিলেব্‌ল্ দুই ভিন্ন বস্তু আর তাই (২) বাংলায় অক্ষর শব্দ সিলেব্‌ল্এর প্রতিশব্দ বলে গণ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ একমাত্র মধুসূদন বাদে কোনো বাঙালি অক্ষরের প্রতিশব্দ হিসাবে সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করেন নি। আর বোধকরি একমাত্র আচার্য সুনীতিকুমার ও তাঁর অনুবর্তিগণ বাদে অন্য কোনো বাঙালি ইংরেজি সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে অক্ষর শব্দ ব্যবহার করেন নি। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, রাখালরাজ, রাজশেখর, কালিদাস রায়, নীরেন্দ্রনাথ ও শঙ্খ ঘোষ যে করেন নি তা নিশ্চিত। রামমোহনই প্রথম বাংলা অক্ষর ও সিলেব্‌ল্এর পার্থক্য বুঝতে পেরে সিলেব্‌ল্এর জন্য নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর রচিত শব্দটি হল 'ধ্বন্যা-ঘাত'। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রাথও সর্বদাই সিলেব্‌ল্ ও অক্ষরের পার্থক্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি সিলেব্‌ল্-এর কোনো বিশেষ প্রতিশব্দ রচনা করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল 'মাত্রা' শব্দের দ্বারাই সিলেব্‌ল্ বোঝাতেন। সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষর আর শব্দ-পাপড়ির (syllable-এর) পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ করেছেন। সিলেব্‌ল্কে রাখালরাজ বলেছেন 'স্বর', রাজশেখর বলেছেন 'ধ্বনি' (আরও ভাল প্রতিশব্দের অভাবে) আর কালিদাস রায় প্রথমে বলতেন 'পদ্যাংশ', তারপরে 'পাদক' এবং সর্বশেষে বলেছেন 'দল'।[১]

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মধুসূদনের সিলেব্‌ল্-বোধক অক্ষর আর সুনীতিকুমারের সিলেব্‌ল্-বোধক 'অক্ষর' কিন্তু সম্পূর্ণ দুই জাতের বস্তু। মধুসূদনের মতে 'মেঘনাদ' শব্দে চার অক্ষর ও চার সিলেব্‌ল্ আর সুনীতিকুমারের মতে দুই অক্ষর ও দুই সিলেব্‌ল্। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন বাঙালি ঐতিহ্যের অনুবর্তী, আর সুনীতিকুমার ইংরেজি ঐতিহ্যের। আর রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অন্য সব বাঙালির অবস্থান এই উভয়ের মধ্যস্থলে। তাঁদের মতে মেঘনাদ শব্দে আছে চার অক্ষরে দুই সিলেব্‌ল্। সেজন্য তাঁরা সিলেব্‌ল্ শব্দের নূতন প্রতিশব্দ রচনার প্রয়োজন বোধ করছেন। এই প্রয়োজনবোধের ফলেই বাংলা ছন্দ-সাহিত্যে 'দল' শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে।

৫

এখানে বলা উচিত যে, সংস্কৃত অক্ষর (অন্ততঃ ছন্দশাস্ত্রে) আর বাংলা অক্ষরও সম্পূর্ণ অভিন্নার্থক নয়। বোধ করি শ্যামাচরণই সর্বপ্রথম এ কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে গেছেন। বাংলায় অ-স্বরান্ত ব্যঞ্জন (শব্দের মধ্যেই হক আর অন্তেই হক) একটি অক্ষর বলে গণ্য হয়। যেমন--

১ কালিদাস রায়ের উক্তি : "একটি শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে যতটুকু এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, ততটুকুর নাম পাদক বা দল (syllable)।"—নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ, দ্বিতীয় সং (আ. ১৩৫৫ মাঘ। ১৯৪৯ জানুআরি), পৃ ২১০।

পাগল্‌, পাগ্‌লা, পশম্‌, পশ্‌মী প্রভৃতি শব্দের হস্‌বর্ণগুলি এক-একটি অক্ষর বলেই গণ্য হয়ে থাকে। এমন কি, তৎসম শব্দের অন্তিম হস্‌বর্ণও পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা পেয়ে থাকে। বাঙালির হিসাবে বণিক্‌ শব্দে তিন অক্ষর এবং পুণ্যবান্‌ শব্দে চার অক্ষরই গণনা করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতে তা হয় না। সংস্কৃতে শব্দমধ্যে বিচ্ছিন্ন হস্‌বর্ণ স্বীকৃত হয় না ; ও-রকম হস্‌বর্ণ সর্বদাই পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্তভাবে লিখিত হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিখিত না হলেও যুক্ত বলেই কল্পিত হয়, উচ্চারিত না হলেও। যেমন বাংলায় পাগ্লা বা পশ্মী লেখা হয় না, কিংবা বাদ্‌শা ও মুশ্‌কিল শব্দের দ্‌শা ও শ্‌কি যুক্তাক্ষর বলে কল্পিতও হয় না। কিন্তু সংস্কৃতে ঋক্‌থ, রুগ্‌ণ, গুল্‌ফ, চিকিৎসা, ভর্ৎসনা, দিক্‌প্রান্ত প্রভৃতি শব্দের ক্‌থ, গ্‌ণ, ল্‌ফ, ৎস, র্ৎসা, ক্‌প্রা যুক্তাক্ষর বলেই গণ্য হয়, যদিও এ-রকম যুক্তাক্ষর স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না। সংস্কৃত ছন্দে শব্দের অন্তিম হস্‌বর্ণও পরবর্তী শব্দের আদিবর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলে গণ্য হয়। যেমন সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসারে 'কশ্চিৎকান্তা' অংশের 'কশ্চিৎ' শব্দের ৎ 'কান্তা' শব্দের ক-এর সঙ্গে যুক্ত বলেই মনে করা হয়। অর্থাৎ এর কল্পিত অক্ষরবিভাগ ক, শ্চি, ৎকা, ন্তা এ-রকম। এসব কারণে সংস্কৃত শব্দে যত অক্ষর তত সিলেব্‌ল্‌ ধরতে অসুবিধা হয় না। গণনায়ও ভুল হয় না। যেমন রুগ্‌ণ, ও গুল্‌ফ শব্দে দুই অক্ষরে দুই সিলেব্‌ল্‌, দিক্‌প্রান্ত শব্দে তিন অক্ষরে তিন সিলেব্‌ল্‌, কশ্চিৎকান্তা অংশে চার অক্ষরে চার সিলেব্‌ল্‌। তাই সংস্কৃত (তথা প্রাকৃত) ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর'কে সিলেব্‌ল্‌ বলে গণ্য করলে হিসাবে ভুল হয় না। এইজন্যই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা 'অক্ষর'-কে সিলেব্‌ল্‌ বলেন। আচার্য সুনীতিকুমার তাঁদেরই অনুবর্তন করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংস্কৃত শব্দের অক্ষরসংখ্যা ও সিলেব্‌ল্‌সংখ্যা অভিন্ন হলেও তার অক্ষরবিভাগ ও সিলেবল্‌বিভাগ অভিন্ন নয়। যেমন 'কুণ্ঠা' শব্দের অক্ষরসংখ্যা দুই, সিলেব্‌ল্‌সংখ্যাও দুই। কিন্তু এ শব্দটির অক্ষর ও সিলেব্‌ল্‌ বিভাগ ভিন্নরকম। যেমন—

১। কুণ্ঠা = কু + ণ্ঠা = অযুক্তাক্ষর + যুক্তাক্ষর ;
   কুণ্ঠা = কুণ্‌ + ঠা = closed syllable + open syllable।

২। কশ্চিৎকান্তা = ক + শ্চি + ৎকা + ন্তা = ১ অযুক্তাক্ষর + ৩ যুক্তাক্ষর ;
   কশ্চিৎকান্তা = কশ্‌ + চিৎ + কান্‌ + তা = ৩ closed syllable + ১ open syllable।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অক্ষর আর সিলেব্‌ল্‌-এর মোট সংখ্যা সমান হলেও এই দুয়ের বিশ্লেষণ অভিন্ন নয়। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় যুক্তাক্ষর নেই, তাই পাশ্চাত্ত্য মনে যুক্তাক্ষরের ধারণাও নেই। ফলে সে ভাষায় যুক্তাক্ষরবোধক কোনো শব্দও প্রচলিত হয় নি। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সিলেব্‌ল্‌-এর ধারণা ছিল না। তাই open syllable ও closed syllable বোঝাবার জন্য নূতন শব্দ উদ্‌ভাবনের প্রয়োজন হয়েছে।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর লিপিবিভাগ-সূচক, তাই অক্ষরের যুক্ত-অযুক্ত রূপের কথা মনে আসে। আর পাশ্চাত্ত্য সিলেব্‌ল্‌ উচ্চারণবিভাগ-সূচক, তাই সে ভাষায় যুক্ত-অযুক্তের প্রশ্ন মনে আসে না, আসে open, closed ভেদের কথা।

এসব কারণে স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃত অক্ষর ও পাশ্চাত্ত্য সিলেব্‌ল্‌ শব্দ সমার্থক নয়, অর্থাৎ এই দুই শব্দের দ্যোতনা অভিন্ন নয়, যদিও মোটামুটি ভাবে সিলেব্‌ল্‌-এর হিসাব দিয়ে অক্ষর-হিসাবের কাজ চালানো যায়।

এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার, ছন্দের কারবার ধ্বনি ও উচ্চারণ নিয়ে, ধ্বনির লিখিত রূপ নিয়ে নয়। তাই মানতে হবে, ছন্দশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা শব্দের ধ্বনি ও উচ্চারণ-বিভাগের অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌-বিভাগের উপরে, শব্দের লিপিবিভাগ বা অক্ষরবিভাগের উপরে নয়। এজন্যই ছন্দ-আলোচনায় পুরোপুরিভাবে সিলেব্‌ল্‌-এর দ্যোতনা-জ্ঞাপক একটি নূতন শব্দ একান্ত প্রয়োজন।

৬

সিলেব্‌ল্‌-বোধক নূতন শব্দ রচনার আরও একটা গুরুতর কারণ আছে। সংস্কৃত অভিধানে ব্যাকরণে ও ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর ও বর্ণ অভিন্নার্থক বলে গণ্য হয়। আর দুটোরই অর্থ syllable এবং letter। মনিয়ার উইলিয়ামসের অভিধানে এবং অন্য সব সংস্কৃত ও বাংলা অভিধানেই দেখা যায় অক্ষর মানে syllable, letter, আবার বর্ণ মানেও syllable, letter। বাচস্পত্য অভিধানে আছে—

অক্ষরং বর্ণনির্মাণং বর্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ।

অর্থাৎ অক্ষর মানে বর্ণ (letter) এবং বর্ণনিমাণ (অর্থাৎ syllable) দুই-ই যেমন—ক্‌ এবং ই, এই দুটি বর্ণকে দুই অক্ষর বলা যায়, আবার দুই বর্ণ নিয়ে নির্মিত 'কি' এই ধ্বনিমূর্তিটিও এক অক্ষর। স্‌ ত্‌ র্‌ ঈ, এই চার বর্ণে চার অক্ষর, আবার এই চার বর্ণ নিয়ে নির্মিত 'স্ত্রী' এই ধ্বনিমূর্তিটিও এক অক্ষর বলে গণ্য। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, সিলেব্‌ল্‌বোধক অদ্ব্যর্থক কোনো শব্দের অভাবেই 'বর্ণনির্মাণ' শব্দটি রচনা করে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ বাচস্পত্য অভিধানের মতে সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দ 'বর্ণনির্মাণ', যদিও বর্ণ বলতেও অক্ষর বোঝায়। দেখা যাচ্ছে অক্ষর ও বর্ণ দুটো শব্দই দ্ব্যর্থক, সংস্কৃত ভাষায় অদ্ব্যর্থক সিলেব্‌ল্‌বোধক কোনো শব্দ নেই। 'ইংরেজি strength শব্দের একটি syllable গঠিত হয়েছে আটটি letter নিয়ে'—এ কথাটা বাংলা শব্দ দিয়ে বোঝানো যাবে কি ভাবে? একটি 'অক্ষর' গঠিত হয়েছে আট 'বর্ণ' নিয়ে, নাকি একটি 'বর্ণ' গঠিত হয়েছে আটটি 'অক্ষর' নিয়ে? এই গোলক-ধাঁধা থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় নেই। যে-কোনো ছন্দশাস্ত্র (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) খুললেই দেখা যাবে, অক্ষর ও বর্ণ অভিন্নার্থে প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরীতে যাকে বলা হয়েছে 'অক্ষরবৃত্ত', প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে তাকেই বলা হয়েছে 'বর্ণবৃত্ত', হিন্দি ছন্দশাস্ত্রে বলা হয় 'বার্ণিক'। বস্তুতঃ (open) syllable অর্থে বর্ণ শব্দের প্রয়োগই অপেক্ষাকৃত বেশি। অমূল্য বাবুও বলেছেন, প্রাকৃতপৈঙ্গলম্‌ গ্রন্থে—"syllable অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কখনও 'বর্ণ', কখনও 'অক্ষর'।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, syllable ও letter-এর পার্থক্য বোঝাতে গেলে গোলক-ধাঁধায় পড়তে হয়। syllable-কে যদি বলি অক্ষর, তবে letter হবে বর্ণ আবার বর্ণ যদি হয় syllable তবে অক্ষর হবে letter। এই ধাঁধাকে নিরস্ত করার প্রয়োজনেও সিলেব্‌ল্‌-বোধক অদ্ব্যর্থক নূতন শব্দ রচনা প্রয়োজন, অন্ততঃ বাংলা ছন্দের আলোচনায়। কেননা বাংলা ছন্দের সমস্যা আরও বেশি। কারণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে closed syllable নেই বা প্রায় নেই, থাকলেও তাকে গণ্য করা হয় না, উপেক্ষাই করা হয়। এটা ভারতীয় লিপিপদ্ধতিরই একটা পরোক্ষ ফল। পক্ষান্তরে বাংলা ভাষায়, বিশেষতঃ অ-তৎসম শব্দে closed syllable-এরই প্রাধান্য। এমন কি, শব্দের অন্তিম এবং কখনও কখনও মধ্যবর্তী অ-কার অনুচ্চারিত হবার ফলে বহু তৎসম শব্দেও সুস্পষ্ট closed syllable-এর

আবির্ভাব হয়েছে। যেমন—দিন্‌, দেশ্‌, সুনীল্‌, মধুর্‌, দেব্‌তা, সাব্‌ধান্‌, মেঘ্‌দূত্‌, জয়্‌দেব্‌। তাছাড়া, বণিক্‌, বিরাট্‌, হঠাৎ, বিপদ্‌ প্রভৃতি শব্দ পরবর্তী শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে বলে এসব ক্ষেত্রে closed syllable পাওয়া যায়। অধিকন্তু বাংলায় বহু closed vowel (রুদ্ধস্বর) আছে। যেমন—নাই্‌, দুই্‌, খেই্‌, শিউ্‌লি, কেউ্‌টে, পাও্‌না। এসব খণ্ডব্যঞ্জন (ন্‌, শ্‌, স্‌) এবং খণ্ডস্বরও (ই্‌, উ্‌, ও্‌) বাংলায় পূর্ণ অক্ষর বলেই গণ্য হয়। তাই বাংলায় সিলেব্‌ল্‌ অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। এসব ক্ষেত্রে সর্বত্র যুক্তাক্ষর করা যায় না (যেমন—বাল্‌তি, খট্‌কা, পাট্‌না) আর যদি যায়ও তবে অভ্যাসবিরুদ্ধ ও চক্ষুপীড়াদায়ক হবে। যেমন—পাগ্লা, হাল্লা, আস্কারা, হাস্পাতাল।

এসব কারণে বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার করা নিরাপদ্‌ মনে করি না। আর উচ্চারণবিভাগ-সূচক সিলেব্‌ল্‌ই যখন ছন্দ আলোচনার প্রধান অবলম্বন তখন এ শব্দটির জন্য দ্ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা-হীন কোনো সুষ্ঠু পরিভাষা রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। আমরা দেখলাম সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় 'অক্ষর' ও 'বর্ণ' শব্দকে যদিও বা সিলেব্‌ল্‌-এর প্রতিশব্দ বলে গণ্য করা যায়, বাংলা ছন্দের আলোচনায় তা যায় না। আর পূর্বগামীদের রচিত ও ব্যবহৃত সিলেব্‌ল্‌-বোধক বর্ণ-নির্মাণ, ধ্বন্যাঘাত, মাত্রা, শব্দ-পাপড়ি, স্বর, ধ্বনি, পদাংশ, পাদক প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দও সুষ্ঠু ও সুপ্রযোজ্য বলে বোধ হয় নি। তাই বহু দ্বিধা ও বিচার বিবেচনার পরে আমি 'দল' শব্দটিকেই সিলেব্‌ল্‌এর সর্বোত্তম প্রতিশব্দ বলে স্বীকার করে নিই এবং অন্ততঃ আটাশ বৎসর যাবৎ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আসছি। অন্য অনেকেই এই শব্দটিকে স্বীকারও করে নিয়েছেন। কিন্তু এত দিন এই শব্দটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। অবশেষে অমূল্য বাবু সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'দল' শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে রায় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন। অথচ তিনি আমার নাম ও আমার দেওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের উল্লেখও করেন নি। অর্থাৎ তিনি এ বিষয়ে আমার বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ অভিমতটিকে পাঠকসমাজের গোচর করেছেন। কিন্তু পাঠক-সমাজের প্রতি, বিশেষতঃ তরুণ পাঠকদের প্রতি আমারও একটা কর্তব্য আছে। কারণ আমার পূর্বপ্রদত্ত যুক্তিপ্রমাণগুলি সবই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এমন আশা করা যায় না। তাই সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'দল' শব্দ ব্যবহারের পক্ষে আমার মনের চিন্তাভাবনার কথাগুলি অন্যত্র ('অমৃত' ১৩৮২ ভাদ্র ১২ ও ১৯) নূতন করে তাঁদের গোচরে আনতে হয়েছে। আর, সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার না করার পক্ষে আমার যুক্তি কি, এখানে তাই দেখাবার চেষ্টা করা গেল।

এ প্রসঙ্গে অমূল্য বাবুর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন—

> "বাংলায় সাধারণ ব্যবহারে অনেক সময় 'অক্ষর' শব্দের অর্থ ধরা হয় হরফ। ভারতীয় লিপির রীতি অনুসারে এক একটি পদে যে কয়টি অক্ষর সেই কয়টি হরফ প্রায়শঃ থাকে বলিয়া অক্ষর ও হরফ সমার্থক বলিয়া অনেক সময় মনে করা হয়।…'রাখাল গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে'—এখানে হরফের সংখ্যা ১৪,…বাংলা ছন্দের হিসাবে এখানে ১৪টি unit আছে।

এইজন্য অনেকে হরফকেই এইজাতীয় ছন্দের অর্থাৎ পয়ার ছন্দের unit বলিয়া মনে করেন।[১] কিন্তু ছন্দ ত দৃশ্য নহে, ছন্দ শ্রব্য। Roman লিপিতে লিখিলেও পয়ার ছন্দ বজায় থাকে। সুতরাং হরফ কখনই ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। অক্ষর শব্দের যে অর্থই ধরা হউক, বাংলা পয়ার-জাতীয় ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলা ভ্রমাত্মক।"

—কালি ও কলম, ১৩৮১ আশ্বিন

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে "বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ" নামে এক প্রবন্ধে[২] (বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ) আমি ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলাম। তারও নয় বৎসর পূর্বে তার কিছু আভাস দিয়েছিলাম প্রবাসী পত্রিকায় এক প্রবন্ধে।[৩] এত দিন পরেও যে অমূল্য বাবুর মতো প্রবীণ ব্যক্তির কাছে আমার বক্তব্যের এমন অকুণ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ সমর্থন পেলাম, তার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর শেষ বাক্যটিকে আমি বর্ণে বর্ণে সত্য বলেই মনে করি। উক্ত প্রবন্ধে আমি ঠিক এই সত্যই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টিত হয়েছিলাম। তিনি Roman লিপির যে যুক্তি দিয়েছেন তাও ওই প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। আর 'পয়ারজাতীয়' ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলা ভ্রমাত্মক এবং এই ভ্রমের মূলকারণ ভারতীয় লিপিরীতি, তাও দৃষ্টান্তযোগে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল ওই প্রবন্ধেই। এ স্থলে বলা উচিত যে, সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ প্রায় সকলেই বাংলা হরফকেই অক্ষর বলে মনে করেন অর্থাৎ তাঁরা অক্ষর শব্দ ব্যবহার করেন 'হরফ'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, আর সুনীতিকুমার-প্রমুখ কেউ কেউ 'অক্ষর' শব্দকে 'সিলেব্‌ল্‌'-এর প্রতিশব্দ বলে গণ্য করেন। এই দুই অর্থের যে-কোনো অর্থেই 'পয়ারজাতীয়' ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলা ভ্রমাত্মক, এ বিষয়ে আমি অমূল্য বাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

এ প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পূর্বে আমার মনে দুটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। (১) 'হরফ' তো আরবি শব্দ, তার আসল সংজ্ঞার্থ কি, তার ভারতীয় বা ইংরেজি প্রতিশব্দ কি এবং ছাপাখানার জগতে এ শব্দটি কি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে আমার জানা নেই। হরফ মানে কি letter, না syllable, না দুই-ই, না যে-কোনো লিপিচিহ্ন অথবা type ? এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি নি বলে আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই বাংলা ছন্দের আলোচনায় 'হরফ' শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত হয়েছি। তাতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। (২) অমূল্য বাবু বলেছেন, পয়ারের প্রত্যেক 'পদে' থাকে ১৪টি unit। এই unit শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি এবং সুপরিচিত পয়ারবন্ধে কোন্ বস্তুটিকে unit বলে গ্রহণ করা হয়,

১. সব সময় হরফ-সংখ্যা অনুসারে এইজাতীয় ছন্দের unit অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। অনেক সময় বিশেষতঃ আজকাল হরফ-সংখ্যা মাত্রা-সংখ্যার চেয়ে বেশি বা কম হয়। যেমন—'শুকনো কাশে আগুনের মতো' (রবীন্দ্রনাথ, 'পুনশ্চ', খ্যাতি), এখানে মাত্রা-সংখ্যা ১০, কিন্তু হরফ-সংখ্যা ১১। আবার, 'বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত'। (রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', হিং টিং ছট্), এখানে হরফ-সংখ্যা ১৩, কিন্তু মাত্রা-সংখ্যা ১৪)।

২ এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে বর্তমান লেখকের 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে (১৩৮১ বৈশাখ), পৃ ১৫৩-৭৪।

৩ 'বাংলা ছন্দ', প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ। এই প্রবন্ধটিও সংকলিত হয়েছে পূর্বোক্ত 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে। আলোচ্য অক্ষর-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের ৪-৬ পৃষ্ঠায়।

তা নিয়েও আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এ বিষয়ে অমূল্য বাবুর মত কি তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অনেক বিবেচনার পর আমি 'মাত্রা' শব্দটিকেই unit-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রাখালরাজ, কালিদাস রায়, তারাপদ, নীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই unit অর্থে মাত্রা শব্দ ব্যবহার করেন। আমিও করি। তা ছাড়া আমি উচ্চারিত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশকে (অর্থাৎ একটি হ্রস্বস্বরের সমপরিমাণ ধ্বনিকে) এই 'পয়ারজাতীয়' ছন্দের অর্থাৎ তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত'-বর্গীয় ছন্দের মাত্রা (unit) বলে গ্রহণ করে থাকি, আর ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশকে বলি 'কলা' (mora)। সংক্ষেপে বলতে গেলে 'কলা' মানে ধ্বনিকণা।

রামায়ণের সমস্যা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

এক সময়ে কেহ কেহ মনে করিতেন যে, বাল্মীকি-বিরচিত মূল রামায়ণ অর্থাৎ অযোধ্যা কাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনীটি পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ দশরথ জাতকের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়াছিল। কিন্তু পালি সাহিত্য এবং জাতকাদি সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন, সেই সকল সুপণ্ডিত ব্যক্তি ধারণাটিকে অযৌক্তিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রাজ্ঞ গবেষকগণ দেখাইয়াছেন যে, জাতক সমূহের গাথাগুলি প্রাচীন, এবং গদ্যে রচিত গল্পাংশ উহার অনেক পরবর্তী কালে রচিত। গাথাগুলি সুত্তপিটকভুক্ত খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত; কিন্তু গল্পগুলি প্রধানতঃ সিংহলীয় ভিক্ষুগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। পালি সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গিয়া মহাপণ্ডিত হ্বিন্তেরনিৎস্ সাহেব লিখিয়াছেন, "They (অর্থাৎ জাতকসমূহ) cannot serve as documents for the social conditions at the time of the Buddha, but at the most, for the period of the 3rd century B. C., and for the greater part especially in their prose, only for the fifth or sixth century A. D."[১] এই জন্যই জাতকের গাথা এবং গল্পাংশের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য দেখা যায়। এ বিষয়ে লুইদেস্ʼ, হের্তেল এবং শার্পাঁতিয়ে প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান্।[২]

দশরথ জাতক সম্পর্কে হ্বিন্তেরনিৎস্ লিখিয়াছেন, "Only the Gathas of the Jataka belong to the Tipitaka. The prose narrative is the fabrication of the compilers of the commentary (about the fifth century A. D.), and all conclusions drawn from this story, such as those of D. Ch. Sen and others, are faulty."[৩] এখানে তিনি স্বর্গীয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের The Bengali Ramayanas (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২০, পৃষ্ঠা ৯ হইতে) গ্রন্থে প্রচারিত অভিমতকে ভ্রান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, সেন মহাশয় দশরথ জাতকের কাহিনীকে বাল্মীকি-বর্ণিত রামকথার মূল মনে করিতেন। সুপণ্ডিত লুইদেস্ʼ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, দশরথ জাতক কাহিনীটির অর্বাচীন লেখক প্রাচীন গাথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সেকথা উল্লেখের পূর্বে জাতকের গল্পটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

বারাণসীর রাজা দশরথের প্রধান মহিষীর গর্ভে রামপণ্ডিত ও লক্ষ্মণকুমার নামক দুই পুত্র এবং সীতাদেবী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই প্রধানা মহিষীর মৃত্যু ঘটিলে রাজা তাঁহার ষোলহাজার মহিষীর মধ্য হইতে অপর একজনকে প্রধানা মহিষীর পদে উন্নীত করেন। কিছুকাল

পরে ইঁহার গর্ভে ভরতকুমারের জন্ম হয়। একবার দশরথ ভরতের মাতাকে বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ইহার জোরে রানী তাঁহার পুত্রকে রাজ্য দিতে হইবে বলিয়া দাবী করেন। দশরথ তখন রাম ও লক্ষ্মণের বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে দূরে সরিয়া যাইবার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, তাঁহারা যেন বার বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে দেশে ফিরিয়া রাজ্যের অধিকার লন। ফলে সীতাকে সঙ্গে লইয়া রাম ও লক্ষ্মণ হিমালয়ের অরণ্য প্রদেশে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার নয় বৎসর পরে অকস্মাৎ দশরথের মৃত্যু হয়। তখন রামকে সিংহাসনে স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভরত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু রাম বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে ফিরিতে স্বীকার করিলেন না। তিনি ভরতকে তাঁহার চটীজুতা সিংহাসনে রাখিয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে লইয়া ভরত বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। আরও তিন বৎসর পর রাম ফিরিয়া আসিয়া বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; সীতা তাঁহার প্রধানা মহিষী হইলেন। রাম ষোল হাজার বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দশরথ-জাতকের প্রকৃত উদ্দেশ্য গাথাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। উহাতে দেখিতে পাই, দশরথের মৃত্যু-সংবাদে রাম কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তাহাতে ভরতের আশ্চর্য লাগিল। তাই রাম বুঝাইয়া দিলেন যে, মৃত আত্মীয়দের জন্য শোক প্রকাশ অজ্ঞানের লক্ষণ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের এইরূপ মনোভাব আরও কোনও কোনও জাতকে ও কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রামায়ণ-বর্ণিত রাম ও ভরতের কথোপকথনের ব্যাপারটাকে তাঁহারা জাতকটিতে এইভাবে আপনাদের কাজে লাগাইয়াছেন। দশরথ-জাতক যে রামায়ণ-কাহিনীর একটি বিকৃত রূপ তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, বাল্মীকি রামায়ণ (অযোধ্যা হইতে লঙ্কাকাণ্ড) খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী-তে রচিত হয় এবং উহার সহিত দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই আদি ও উত্তর কাণ্ড এবং আর কিছু অংশ সংযোজিত হইয়াছিল।[৪] আমরা দেখিব যে, দশরথ-জাতকের কাহিনী রামায়ণের এই প্রক্ষিপ্ত অংশেরও পরবর্তী এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর বৌদ্ধ লেখকেরাও ইহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, দশরথ জাতকের গদ্যাংশের রচয়িতা উহার পদ্যাংশ সর্বত্র বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম গাথাটিতে আছে, ভরতের নিকট দশরথের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রাম তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভগিনী সীতাকে জলে অবতরণ করিতে বলিতেছেন—"উভো ওতরথোদকং।" ইহার অর্থ এই যে, পিতৃবিয়োগের জন্য তাঁহাদিগকে পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় রামায়ণেও (২।১০৩।১৭) অনুরূপ কথা আছে—"ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ"। কিন্তু এই অর্থ না বুঝিয়া পরবর্তীকালের সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ কাহিনীলেখক একটা আজগুবি কথা বলিয়াছেন। তিনি ভারতীয় হইলে গাথার স্বাভাবিক অর্থ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন। রাম নাকি ভাবিলেন, সরাসরি দশরথের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে লক্ষ্মণ ও সীতার বুক ফাটিয়া যাইবে। তাই তিনি ছল করিয়া তাঁহাদিগকে জলে নামিতে বলিলেন; কারণ উহাতে তাঁহারা সহজে শোক সহ্য করিতে পারিবেন। তিনি নাকি বলিলেন, "তোমরা দেরি করিয়া আশ্রমে ফিরিয়াছ; সুতরাং শাস্তিস্বরূপ ঐ পুষ্করণীর জলে নামিয়া দাঁড়াও।" লক্ষ্মণ ও সীতা জলে নামিলে নাকি রাম তাঁহাদিগকে দশরথের মৃত্যু-সংবাদ দিলেন এবং শোকবশে তাঁহারা তিনবার মূর্ছিত হইয়া পড়িলে, তাঁহাদিগকে জল হইতে টানিয়া তোলা হইল। গল্পটি কোন

গোমূর্খের রচিত বলিয়া বোধ হয় ; কারণ রামের কিছু মাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে জলমধ্যে মূর্ছিত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা ঘটাইতেন না।

কাহিনীর শেষে দশরথ-জাতকে রামের রাজত্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে ষোলহাজার বৎসর—"দস বস্স-সহস্সানি সট্‌ঠি বস্স-সতানি চ।" এই পঙ্‌ক্তিটি রামায়ণে তিনবার উল্লেখিত (১।১।৯৭,৬।১২৮।১০৬ এবং ৭।১০৪।১২) একটি পঙ্‌ক্তির অনুকরণ—"দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।" আবার উহাতে একস্থলে (৬।১২৮।৯৫) কেবল "দশ বর্ষসহস্রাণি" বলা হইয়াছে। যাহা হউক, রামায়ণে যাহা দশ বা এগার হাজার বৎসর, দশরথ-জাতকে পরবর্তীকালের অনুকরণকারী তাহাকে ষোলহাজারে তুলিয়াছেন। আরও একটি কথা এই যে, বাল্মীকির মূল রামায়ণের নায়ক রাম মানুষ মাত্র ; আদি ও উত্তর কাণ্ডের রামের ন্যায় তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন নন। কোন মানুষের পক্ষে দশ এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করা সম্ভব নয় ; সুতরাং উদ্ধৃতিটি অবশ্যই মূল রামায়ণে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অতএব দশরথ-জাতকের কাহিনী রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশেরও পরবর্তীকালের রচনা। জাতকটিকে মহাভারতের বর্তমান আকারের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীরও পরবর্তী বলিতে পারা যায়। কারণ রামায়ণের ঐ পঙ্‌ক্তিটি মহাভারত-বর্ণিত রামকথার মধ্যে একটিতে উদ্ধৃত দেখিতে পাই (৩।১৪৮।১৯)।

কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধচরিত-রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও কবি অশ্বঘোষ কুষাণ-বংশীয় কণিষ্কের সভাসদ ছিলেন, অর্থাৎ তিনি প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাল্মীকি, রাম, দশরথ, অজ, রঘু, অম্বরীষ, বৈবস্বতমনু, সুমিত্র (সারথি সুমন্ত্র), পুরোহিত ঔর্বশেয় (বসিষ্ঠ) এবং মন্ত্রী বামদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে (৭।৪) বামদেবের নাম আছে ; আবার বসিষ্ঠকে ঔবশেয় অর্থাৎ উর্বশীপুত্র বলার মূলে উত্তর কাণ্ডের উর্বশীকথা থাকিতে পারে, যদিও ইহার বৈদিক ভিত্তিও রহিয়াছে।[৫] আদি ও উত্তর কাণ্ড রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ ; সুতরাং অশ্বঘোষের সময়ে রামায়ণের বর্তমান আকার লাভ সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আবার বুদ্ধচরিতে (৮।৭৯) রামের বনগমনের অতি অল্পকাল পরেই দশরথের মৃত্যু ঘটিবার কথা আছে। ঘটনাটি অবশ্যই বাল্মীকি রামায়ণ হইতে গৃহীত ; কারণ দশরথ জাতক অনুসারে রামের বনগমনের নয় বৎসর পরে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হন। অশ্বঘোষ দশরথ জাতকের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মধ্য এশিয়াবাসী কুমারলাতের কল্পনামণ্ডিতিকা সংজ্ঞক গ্রন্থে জনসাধারণের জন্য রামায়ণ পাঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬]

জয়দ্দিস জাতকের একটি গাথায় রামের দণ্ডকারণ্যবাসের উল্লেখ আছে। ইহাও বাল্মীকির রামকথা হইতে গৃহীত ; কারণ দশরথ-জাতকের রাম দণ্ডকারণ্যে যান নাই, হিমালয়ে গিয়াছিলেন। জয়দ্দিস জাতকের গাথাটি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হইলে, উহা বাল্মীকিরামায়ণের প্রাচীনতার দ্যোতক।

বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কাহিনীসমূহকে বিকৃতাকারে প্রকাশ করিতেন। আমরা জাতক হইতে ইহার আরও দুই একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। জাতক-সাহিত্যে রামকথার একাধিক বিকৃতি দেখা যায়। আমাদের ধারণা, বাল্মীকির রামকথা জাতকের কাহিনীতে গৃহীত না হওয়ার কারণ এও হইতে পারে যে, বাল্মীকি সিংহল বা লঙ্কার

অধিবাসীদিগকে রাক্ষস নামে উল্লেখ করিয়াছেন ; আবার জাতক-কাহিনীর অধিকাংশ রচয়িতা সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন।

আমরা উপরে জয়দ্দিস জাতকে রামের দণ্ডকারণ্যবাসের উল্লেখ আছে বলিয়া বলিয়াছি। জনৈক রাজপুত্র আপনাকে এক রাক্ষসের হস্তে সমর্পণ করিতে গেলেন। তখন তাঁহার মা বলিলেন, "যেমন দণ্ডকারণ্যবাসের সময় রামের মাতার প্রার্থনা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, আমার প্রার্থনাও আজ আমার বাছাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।" কিন্তু কাহিনীকার ইঙ্গিতটি উপেক্ষা করিয়া একটি নূতন গল্প ফাঁদিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বারাণসীতে রামনামক এক বণিক্ বাস করিত। সে অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিল। একবার সে বাণিজ্যব্যপদেশে দণ্ডকিরাজার রাজ্যস্থিত কুম্ভবতী নগরীতে গিয়াছিল। দারুণ বৃষ্টির ফলে সেদেশে ভয়ানক জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। তখন বিপদে পড়িয়া রাম তাহার পিতামাতাকে স্মরণ করে। দেবগণ তাহার মাতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। এই কাহিনীটিও দশরথ জাতকের ন্যায় রামকথার বিকৃতি। ইহার কোনটিই বাল্মীকি রামায়ণের মূল হইতে পারে না। অবশ্য বাল্মীকি আদর্শ নরপতি বিষয়ক দুই চারিটি প্রাচীন কীর্তিকথার ভিত্তির উপর তাঁহার কাহিনীটি গ্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা পরে এ প্রসঙ্গে আসিতেছি।

ঘট জাতকে হরিবংশ-বর্ণিত কৃষ্ণকথার বিকৃতি দেখা যায়। এই জাতক অনুসারে কংস ছিলেন অসিতাঞ্জন নগরের রাজা ; তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন উপরাজ উপকংস এবং ভাগিনী দেবগর্ভা। শোনা গিয়াছিল, দেবগর্ভার সন্তানেরা অসিতাঞ্জন-রাজ্য বিনষ্ট করিবে ; তাই দেবগর্ভাকে আবদ্ধ রাখিয়া নন্দগোপা ঐবং উহার স্বামী অন্ধকবিষ্ণুর হস্তে তাঁহার ভার দেওয়া হয়। এই সময়ে উত্তর মথুরার পলাতক উপরাজ উপসাগর অসিতাঞ্জনে আসেন। তিনি গোপনে দেবগর্ভার সহিত মিলিত হন। ফলে দেবগর্ভার দশ পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। নন্দগোপা এবং অন্ধকবিষ্ণুর পুত্রকন্যা বলিয়া ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছল। উল্লিখিত দশ ভ্রাতার নাম—বাসুদেব (অর্থাৎ কৃষ্ণ), বলদেব, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, অর্জুন, প্রদ্যুম্ন, ঘটপণ্ডিত, এবং অস্কুর (অক্রূর)। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহারা দুর্ধর্ষ দস্যুতে পরিণত হইল। তাহারা দেবগর্ভার পুত্র, ইহা জানিতে পারিয়া কংস ভাগিনেয়দিগকে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। ফলে যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল, তাহাতে কংস এবং তদীয় অনুচরগণ নিহত হন এবং বাসুদেব প্রভৃতি দশ ভাই অসিতাঞ্জন রাজধানী হইতে কংসের রাজ্য শাসন করিতে থাকে। কিছুকাল পরে তাহারা ছলেবলে দ্বারাবতীনগরী অধিকার করিয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিল। অতঃপর জম্বুদ্বীপের ৬৩,০০০ নগরীর রাজগণকে ধ্বংস করিয়া তাহারা সমগ্র জম্বুদ্বীপ অধিকার করে এবং দশ ভ্রাতার মধ্যে উহা ভাগাভাগি করিয়া লয়। কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অংশ ভগ্নী অঞ্জনাকে দান করিয়া বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ নয় ভাই দ্বারাবতী হইতে জম্বুদ্বীপের নয় খণ্ডের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল।

কাহিনীটি নবখণ্ডাত্মক জম্বুদ্বীপ বিষয়ক পৌরাণিক কল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার পরবর্তী-কালে রচিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহা যে হরিবংশের কাহিনীর বিকৃত রূপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। লুইদেস্‌ সাহেবের মতের উল্লেখ করিয়া এ সম্পর্কে হ্বিন্তের্‌নিৎস্‌ বলিয়াছেন, "The

Krishna legend is presented in a degenerate condition in the prose of *the Ghata Jataka (No. 355) as so complicated a legend, separated from its home, was gradually bound to be in course of time."*[৭] দুঃখের বিষয়, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, হরিবংশীয় কাহিনীর এই বিকৃতি জাতক লেখকের ইচ্ছাকৃত। হরিবংশ এবং ঘটজাতকের মধ্যে কালের ব্যবধান তেমন অধিক নহে। হরিবংশের রচনা-কাল আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।[৮] ঘটজাতক উহার এক শতাব্দী মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং কাহিনীদ্বয়ের পার্থক্য দীর্ঘকালের ব্যবধানজনিত নহে।

কুণালজাতকের কাহিনীলেখক অনুরূপভাবে মহাভারত বর্ণিত কৃষ্ণাদ্রৌপদীর চরিত্রকে অতি জঘন্যভাবে বিকৃত করিয়াছেন। একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণা অতিমাত্রায় কামুকী ও অসচ্চরিত্রা ছিল এবং পঞ্চপতি সত্ত্বেও জনৈক কুব্জবামনের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিত। ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, কৃষ্ণা কোশল রাজের কন্যা এবং কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের সৎ মেয়ে। পাণ্ডুরাজার পাঁচ পুত্র তক্ষশিলায় বিদ্যালাভ করিতেছিলেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে অর্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির এবং সহদেব। তাঁহারা তক্ষশিলা হইতে বারাণসীতে উপস্থিত হন। স্বয়ংবরসভায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণা সেই পঞ্চ ভ্রাতাকেই পতিত্বে বরণ করিল; কারণ তাহার কামপ্রবৃত্তি দমনের পক্ষে এক জন মাত্র স্বামী যথেষ্ট ছিল না। বিবাহের পরেও সে এক কুব্জবামনের সহিত ব্যভিচার করিত। তাহার কুৎসিৎ ব্যবহারের বিষয়ে অর্জুন তাঁহার অনুজ ভ্রাতৃগণকে বুঝাইয়া বলিলে কৃষ্ণার পঞ্চপতি তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক হিমালয়ে তপস্যা করিতে চলিয়া যান।

এ কাহিনী যে মহাভারতের দ্রৌপদীকথার বিকার, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। অবশ্যই ইহার ভিত্তিতে মহাভারতের কাহিনীটি রচিত হয় নাই। দশরথ জাতক এবং বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যেও সম্পর্কটা ঠিক এইরূপ।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ দসরথজাতকে যে রামের সহিত তাঁহার ভগ্নী সীতার বিবাহের কথা বলা হইয়াছে, কেহ কেহ এই ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহ ব্যাপারটিকে সুপ্রাচীন ধরিয়া লইয়া কাহিনীটিকে রামায়ণকথার পূর্ববর্তী স্থির করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন উপজাতির মধ্যে এইরূপ বিবাহের প্রচলন থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, দসরথজাতকে বাল্মীকি রামায়ণের সাত আট শত বৎসর পরে উহার কাহিনীর একটি বিকৃতরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। পুরাতন কাহিনী হিসাবে জাতকরচয়িতা ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহকে নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা না মনে করিতে পারেন। কিন্তু উহার সহিত কাহিনীটির প্রাচীনতার সম্পর্ক কল্পনা অবান্তর। কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে তরণীসেন, মহীরাবণ, অহিরাবণ প্রভৃতি অনেক চরিত্র আছে, যাহা সংস্কৃত রামায়ণে নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুপ্রাচীন গ্রন্থ অথবা কৃত্তিবাস সংস্কৃত রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থ হইতে চরিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতে উল্লিখিত দুর্যোধনের মহিষী এবং প্রগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত মহাভারতে ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাতে কাশীরামদাসের বর্ণনার প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রন্থাবলী

সম্পর্কে এইরূপ প্রক্ষেপের বহু উদাহরণ আছে। অবশ্য প্রক্ষিপ্ত বিষয়ের মধ্যে সমস্তটার জন্য কৃত্তিবাস বা কাশীদাস দায়ী নন। যেমন, ভট্টনারায়ণকৃত বেণীসংহার নাটকে দুর্যোধনমহিষী ভানুমতীর চরিত্র আছে ; কিন্তু সেখানে তাঁহাকে ভগদত্তের কন্যা বলা হয় নাই।

বাল্মীকিরামায়ণের প্রক্ষিপ্ত সূচনাংশ (১।১) হইতে জানা যায় যে, কবি জনৈক আদর্শচরিত্র নরপতির কাহিনী লিখিতে আগ্রহী ছিলেন। তৎকাল প্রচলিত প্রশস্তিমূলক গাথাবলীর ভিত্তিতে মূল রামায়ণ রচিত হইতে পারে। ইহার কিছু প্রমাণ অশ্বঘোষকৃত বুদ্ধচরিতে (১।৪৮) দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন, "মহর্ষি চ্যবন যাহা রচনা করিতে পারেন নাই, সে কাব্য বাল্মীকির স্বরে ধ্বনিত হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, বাল্মীকির পূর্বে চ্যবনঋষি রামকথা রচনা করেন ; কিন্তু উহা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ ছিল। কেহ কেহ মহাভারতের রামোপ্যাখ্যানকে বাল্মীকির রামকথা হইতে প্রাচীন অথবা উহার সমসাময়িক মনে করেন। আমরা অবশ্য মহাভারতের রামোপাখ্যান অংশটিকে বাল্মীকি রামায়ণের মোটামুটি ধরণের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া মনে করি। মহাভারতেরই অন্যত্র (৩।১৪৮) ঐ রামোপাখ্যানেরও একটি অতি সংক্ষিপ্ত আকার দেখা যায়।

বাল্মীকির কাহিনী-অনুসারে রাম দক্ষিণ ভারত অতিক্রম করিয়া ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত লঙ্কাদ্বীপে গিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের এই কাহিনীটি যখন লিখিত হয়, তখন উত্তরভারতবাসীরা সুদূর দক্ষিণ ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অষ্টাধ্যায়ী রচনা করিতে গিয়া পাণিনি সুদূর দক্ষিণের জনপদ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বার্তিককার কাত্যায়ন ঐ সম্পর্কে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। যেমন, 'পাণ্ডু' নাম হইতে 'পাণ্ডব' শব্দের ব্যুৎপত্তি পাণিনির গ্রন্থে আছে ; কিন্তু কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে, 'পাণ্ড্য' শব্দও 'পাণ্ডু' নাম হইতে উদ্ভূত।[৯] আবার একই শব্দে কোন জাতি এবং উহার রাজা বুঝাইতে পাণিনির সূত্রে কেবল 'কম্বোজ' শব্দের উল্লেখ আছে ; কিন্তু কাত্যায়ন বলেন যে, 'চোড' (অর্থাৎ 'চোল') শব্দ দ্বারাও ঠিক ঐরূপ একটি জাতি এবং উহার রাজা বুঝায়।[১০] সুতরাং পাণিনি সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য এবং চোল জাতি এবং উহাদের জনপদকে জানিতেন না ; কিন্তু কাত্যায়ন জানিতেন। পাণিনির গ্রন্থ যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে লিখিত হয় নাই, উহাতে 'যবন' শব্দের ব্যবহার তাহার প্রমাণ।[১১] শব্দটির মৌলিক অর্থ এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত *Ionia*-বাসী গ্রীক। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়া মাইনর এবং ভারতের সিন্ধু-গন্ধার অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন হয়। তখন হইতে পারস্য সাম্রাজ্যের 'যৌন' বা গ্রীক কর্মচারীরা ভারতীয় রাজ্যাংশে যাতায়াত করিত এবং সেই সূত্রেই 'গ্রীক' অর্থে 'যৌন' এবং 'যবন' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইয়াছিল।[১২] সুতরাং পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের নন্দ ও মৌর্যবংশীয় সম্রাটেরা দক্ষিণভারতে রাজ্য বিস্তার করেন। তখন সুদূর দক্ষিণভারত বিষয়ক ভৌগোলিক জ্ঞান উত্তরভারতবাসীর পক্ষে সহজলভ্য হয়। রাম-রাবণের কাহিনী এই যুগের পূর্ববর্তী নহে।

বাল্মীকি যদি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রামায়ণ রচনা করিয়া থাকেন, তবে রামকে তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করা যায় না। কারণ রামায়ণ অনুসারে রামের সময়ে যমুনা নদীর

দক্ষিণ হইতে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত অরণ্যের মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা নামক একটি মাত্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত অনেক জনপদের কথা জানা যায়। অবশ্য তখন অযোধ্যাতে কোন স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং বাল্মীকির কাহিনী প্রকৃতপক্ষে কল্পনামূলক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেলগাড়ীর প্রচলনের পূর্বে দূরবর্তী তীর্থের যাত্রীরা অনেকেই প্রবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইত এবং তাহাদের অতি সামান্য সংখ্যাই স্বদেশে ফিরিয়া আসিত। ঐ যুগে বর্ধমান হইতে মাত্র কয়েকশত মাইল দূরবর্তী পুরী পর্যন্ত তীর্থযাত্রার ভয়বহ বিবরণ লালবিহারী দে মহাশয়ের Bengal Peasant Life (১৮৭৪) নামক পুস্তকে দেখিতে পাই।[১৩] তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক শোচনীয় ভ্রমণ ব্যবস্থায় রাম অযোধ্যা হইতে লঙ্কা পর্যন্ত গিয়া জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ অতিবিশ্বাসীর পক্ষেই সম্ভব। বোধহয়, বাল্মীকি রামায়ণের পরবর্তীকালের প্রক্ষেপকারীরাও কথাটাকে অসম্ভব বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা রামের লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য কাল্পনিক পুষ্পকরথের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাবণ কর্তৃক পুষ্পকে করিয়া সীতাকে গোদাবরীতীর হইতে লঙ্কায় লইয়া যাইবার কাহিনীর মূলেও ঐ ধরণের সন্দেহ থাকিতে পারে। কারণ একজন অনিচ্ছুক মহিলাকে নদী, পর্বত, অরণ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বহু দূরের পথ লইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হইতে পারে। আবার কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, প্রাচীন ভারতে বায়ুযান ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এরূপ ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত। কারণ উহা সত্য হইলে আমরা আলেকজান্দার প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীকে সহজেই পরাজিত করিতে পারিতাম। অধিকন্তু মেগাস্থেনিস, হিউএনচাঙ্, অলবীরুনী প্রমুখ বিদেশী লেখকের ভারতবর্ণনায় এবং ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও লেখমালায় অবশ্যই উহার কোনরূপ উল্লেখ থাকিত।[১৪]

আর দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই আমরা বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব! আমাদের কিংবদন্তী অনুসারে রাম ত্রেতা যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান কলিযুগ এবং ত্রেতার মধ্যবর্তী দ্বাপর যুগ ছিল আট লক্ষাধিক বর্ষব্যাপী। সুতরাং সে হিসাবে রাম দশ পনর লক্ষ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে মনুষ্যসভ্যতার জন্মকালই একলক্ষ বৎসরেরও কম। সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে, 'দ্বাপর' এবং 'ত্রেতা' শব্দ দ্বয়ে 'দুই' ও 'তিন' শব্দ দুটির সংস্রব আছে; সুতরাং এক সময়ে দ্বাপরকে সত্য বা কৃতনামক প্রথম যুগের পরবর্তী দ্বিতীয় যুগ ধরা হইত।[১৫] এই অনুমান সত্য হইলে ত্রেতাযুগ বর্তমান কলিযুগের অব্যবহিত পূর্বে আসিয়া পড়িত এবং আমাদের সময় হইতে রামের আবির্ভাব কালের দূরত্ব আট লক্ষাধিক বৎসর কমিয়া যাইত। দুঃখের বিষয়, সেন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ দ্বাপর যে দ্বিতীয়, তাহা সত্য বা কৃত যুগকে প্রথম ধরিয়া নহে, আমাদের দিক্ হইতে কলিকে প্রথম গণনা করিয়া। ইহার প্রমাণ এই যে, বৈদিক সাহিত্যে পাশার দান সম্পর্কে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, এবং শব্দ চারিটির মূল্য যথাক্রমে চার, তিন, দুই এবং এক।[১৬]

রামায়ণে সূর্যবংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনু ও তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে রাম পর্যন্ত ৩৫ জন রাজার নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে পুরাণের বংশাবলীতে ৬৩ জন রাজার নাম আছে। কালিদাসের

রঘুবংশে এই দ্বিতীয় মত অনুসৃত হইয়াছে। যাহা হউক, উল্লিখিত মতভেদের জন্য সূর্যবংশীয় রাজগণের দুইটি তালিকাকেই ঐতিহাসিক ভিত্তিবর্জিত বলিয়া বোধ হয়। তাছাড়া, ১৭ লক্ষাধিক বর্ষব্যাপী সত্যযুগের সূচনাতে বৈবস্বত মনুর এবং পরবর্তী ১২ লক্ষাধিক বর্ষব্যাপী ত্রেতাযুগের মাঝামাঝি রামের রাজত্বকাল কল্পনা করিলে ৩৫ কিংবা ৬৩ জন নরপতির শাসনকালের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২০।২৫ লক্ষ বৎসর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০০ জন রাজার রাজত্বকালও ২০০০।২৫০০ বৎসরের অধিক হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

বহুদিন পূর্বে হ্বেবর সাহেব বাল্মীকি রামায়ণের উপর হোমর-রচিত গ্রীকমহাগ্রন্থ দুইটির প্রভাব অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু য়াকোবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় ঐ অনুমানের অসারতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।[১৭] য়াকোবির মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া হ্বিন্তের্নিৎস বলিয়াছেন—

"...the entire absence, in the old and genuine Ramayana, of any traces of Greek influence or of an acquaintance with the Greeks,...... there is not even a remote similarity between the stealing of Sita and the rape of Helen, between the advance on Lanka and that on Troy, and only a very remote similarity of motive between the bending of the bow by Rama and that by Ulysses."[১৮] আরও একটি কথা আছে। বাল্মীকি বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলবাসী কবি ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে ঐ অঞ্চলের সহিত যবন বা গ্রীক জাতির কোনই সম্পর্ক ছিল না। ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Demetrius এবং শেষভাগে Menander বর্তমান বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্তীকালের রচনা না হইলে উহাতে গ্রীক প্রভাবের কথা উঠিতে পারে না।[১৭]

পাদটীকা

১। A History of Indian Literature, English translation, Vol. II, p. 156.

২। Nachrichten von der Koeniglischen Geselschaft der Wissenschaften Goettingen, Phil.-Hist. Klasse, 1897, pp. 40 ff.; Zeitschrift der Deutchen Morgenlaendischen Geselschaft, Vol. 60, 1906 pp. 399 ff.; Vol. 62, 1908, pp. 725 ff.

৩। Op. cit., Vol. I, p. 508, note 3.

৪। ঐ পৃষ্ঠা ৫১৬-১৭

৫। Cowell's translation of Asvaghosha's Buddhacharita, S. B. E. Vol. XLIX, pp. 66, 80, 90, 93, 100-01. Cowell সাহেব 'ঔর্বশেয়' বলিতে অগস্ত্য বুঝিয়াছেন; কিন্তু অগস্ত্য দশরথের পুরোহিত ছিলেন না। উর্বশীকাহিনীর বৈদিক ভিত্তির

জন্য দ্রষ্টব্য Vedic Index, Vol. II, p. 276. বুদ্ধচরিতের ৫ম সর্গে সুন্দরকাণ্ডের নিদ্রামগ্ন লঙ্কাপুরীবর্ণনার ছাপ আছে।

৬। Winternitz, op. cit., Vol. I, p. 513.

৭। Zeitschrift der Deutchen Morgenlaendischen Geselschaft, Vol. 58, 1904, pp. 689 ff.; Winternitz, op. cit., Vol. II, p. 119, note 2.

৮। J. N. Farquhar, An Outline of the Religious Literature of India p. 143.

৯। পাণিনির ৪।১।১৬৮ সংখ্যক সূত্রের উপর কাত্যায়নের বার্ত্তিক 'পাণ্ডোর্ড্যন্' দ্রষ্টব্য।

১০। পাণিনির 'কম্বোজাল্লুক্' (৪।১।১৭৫) সূত্রের উপর কাত্যায়নের বার্ত্তিক 'কম্বোজাদিভ্য ইতি বক্তব্যং [চোডাদ্যর্থম্]'।

১১। 'ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাচার্যাণামানুক্' (৪।১।৪৯) এবং কাত্যায়নের বার্ত্তিক 'যবনাল্লিপ্যাম্'।

১২। প্রাচীন পারসিক ভাষার গ্রীকজাতিবোধক 'যৌন' নাম মহাভারতে (১২।২০৭।৪৩) দেখিতে পাই— যৌন-কাম্বোজ-গান্ধারাঃ কিরাতা বর্বরৈঃ সহ। সংস্কৃতে নামটি সাধারণতঃ 'যবন' এবং প্রাকৃতে 'যোন'।

১৩। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৮-৯, ১২৪৪-৪৫।

১৪। বিমান এবং আগ্নেয়াস্ত্রের কাল্পনিকতা সম্পর্কে Indian Historical Quarterly, Vol. XXI, পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৮তে আমাদের মতামত দ্রষ্টব্য। আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন যে, রাবণের লঙ্কা প্রকৃত পক্ষে অত দূরে ছিলনা ; উহা উত্তরভারতের কাছাকাছি অমরকণ্টক পর্বতে অবস্থিত ছিল। এই মতের পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নাই। কারণ গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদীর এবং সহ্য, মলয়, মহেন্দ্র প্রমুখ পর্বতের দক্ষিণে মহাসমুদ্রের মধ্যে রাবণের পুরী অবস্থিত ছিল—একথা কেবল রামায়ণে আছে তাহা নহে ; কালিদাস, প্রবরসেন, কুমারদাস ভর্তৃহরি, ভবভূতি ইত্যাদি সকল প্রাচীন লেখকই একথা বলিয়াছেন।

১৫। দেশ (বাংলা সাপ্তাহিক), ১৩ই মার্চ, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৪৪৮।

১৬। Vedic Index, Vol. I, p. 4—"It is clear that the game consisted in securing even numbers of dice, usually a number divisible by four, the Krita,—the other three throws then being the Treta when three remained over after division by four ; the Dvapara when two was the remainder ; and the Kali when one remained."

১৭। কেহ কেহ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (১।৬।৮) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য উলেখ করিয়া রামায়ণের প্রাচীনতা প্রমাণ করিতে চান। কিন্তু বর্তমান আকারে ঐ দুখানি গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।

সম্পাদক শরৎচন্দ্র

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

১৩৪০ সালে একটি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখছেন, 'কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাইনি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই।' (১।১০।৩৮৩) শরৎচন্দ্রের এই উক্তির মানে এই নয়, যে তিনি মোটেই পত্রিকা সম্পাদনা করেন নি বা সম্পাদনা সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করেন নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের জীবনীতে লিখেছেন, '১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে শরৎচন্দ্র 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে পত্রিকা-সম্পাদনে রীতিমত সাহায্য করিতেন। রেঙ্গুন হইতে যমুনার জন্য প্রবন্ধ গল্পাদি নির্বাচন করিয়া পাঠাইতেন।' (২।১৯) আবার 'যমুনার' সহিত সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি শরৎচন্দ্রের নাম অন্যতর সম্পাদকরূপে ১৩২১ সালের যমুনায় মুদ্রিত করিতে লাগিলেন।' (ঐ।২০) শরৎচন্দ্রের বহু চিঠিপত্রে "যমুনা'-সম্পাদনা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এ ত হল মূলত নেপথ্য-কাহিনী। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম রাজনৈতিক নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নামের সঙ্গে প্রথম থেকেই বার হতে লাগল। পত্রিকাটির নাম 'রূপ ও রঙ্গ'। এই তথ্য শরৎ-জীবনীতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ-চেতনা' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৯২৮—অক্টোবর, 'রূপ ও রঙ্গ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহিত যুগ্ম-সম্পাদক।' (৩)

পত্রিকা সম্পাদনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও প্রয়াস বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু তথ্য উপস্থিত করা হচ্ছে।

শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর সাহিত্য-প্রীতি পিতৃদত্ত। তিনি লিখেছেন, 'পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্নই দেখে গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি শেষ করে যান নি এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি।' (২।১০)

এই স্বীকৃতির মধ্যে শরৎচন্দ্রের শুধু নিজস্ব সাহিত্য-রচনার উন্মেষ নয়, অপরের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্যায়ন ও পরিপূরণের মানসিক প্রস্তুতি-পর্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্পাদনার এগুলিও ত উপকরণ। তাই দেখি সেই অল্প বয়সে শরৎচন্দ্র যে শুধু নিজে লিখছেন তাই নয়, অপরের লেখার উপর কলম চালিয়ে ঘসে মেজে তাকে প্রকাশের উপযোগী করে দিচ্ছেন।

'বাল্যস্মৃতি' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয়··· আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়···গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই।···কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য সভার মাসিক পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলী-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর।' (২।১৬) শরৎচন্দ্র যদিও সবিনয় গুরুগিরি অস্বীকার করেছেন, কিন্তু অন্যত্র একপত্রে তিনি লিখেছেন, 'গিরীন তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চলে আসি।···ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন করে দিয়েছি। আমি লিখতাম বলেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও বাড়ির মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তারপরে ওরা চাঁচল থেকে হাতে লিখে মাসিক-পত্র বার করত।' এই স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে সেই কৈশোরেই শরৎচন্দ্র হলেন সম্পাদকেরও সম্পাদক।

কিন্তু বেশ কিছুদিন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় ছেদ পড়েছিল। আত্ম-কাহিনীতে তিনি লিখেছেন, 'কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

'আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈবদুর্ঘটনারই মত। আমার গুটি কয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য•পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা।···আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত "যমুনার" জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক-সমাজের সমাদর লাভ করল। আমি একদিনেই নাম করে বসলাম।' (২।১১) এই সময়ের কাছাকাছি 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হতে সুরু হয়। সেই নূতন পত্রিকার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য যুক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়।

'যমুনা' ও 'ভারতবর্ষ'কে কেন্দ্র করে অনেক চিঠিপত্রে শরৎচন্দ্র সাময়িকপত্র সম্পাদনা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। সেই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর আলোচনার মধ্যে বিশিষ্ট সমালোচক ও সম্পাদকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। পত্রিকাগুলির উন্নতি-সম্পর্কেও তিনি নিজস্ব মত প্রকাশ করেন। এমন কি তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র অনেক সময় নির্মম সমালোচনা করেন, এবং প্রথম দিকের রচনা বিনা অনুমতিতে প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। যথা, "দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না।···ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত।

ওটা immoral. বেশ্যাচরিত্র ত আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয় যেন। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি তা তোমাদের কাগজেই হোক আর ফণীর কাগজেই হোক।' (১।১৩।৩৭৬-৭) পত্রটিতে পত্রিকা-সম্পর্কে অনেক সরস টিপ্পনীও আছে। যেমন, 'তোমাদের গল্পের ছবিগুলি আরও চমৎকার! পাঁজিতে জামাইষষ্ঠীর পুরাণো ব্লক তোলার ছবির মত।' (ঐ) 'আর অত বড় কাগজ এতে কি চলে? অন্তত এমন একটা জিনিস continuously থাকা চাই যার জন্যে গ্রাহকের মনে আশা জেগে থাকবে—সে কোথায়? একটা bold review থাকা প্রয়োজন—কই তা? …গল্পগুলি অতি বদ। এই কি তোমাদের selection? …তবে প্রথমবারের কাগজ দেখে কিছুই বলা যায় না—খুব চেষ্টা কর যাতে 100 times ভাল হয়।' (ঐ)

শুধু বাগাড়ম্বরে সম্পাদনা চলে না, পত্রিকাকে জনপ্রিয় করতে গেলে সম্পাদককে পরিশ্রম করতে হয়। তাই শরৎচন্দ্র প্রার্থনা করেন, 'ঈশ্বর করুন, ফণী এইভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুই দিন পরে হোক দশদিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই।' (১।১৩।৩৮৯)

পত্রিকার বহুলপ্রচারের জন্যে অযথা অর্থব্যয় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া শরৎচন্দ্রের মনঃপূত ছিল না। তাই 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্র পালকে তিনি অভিযোগ করেন, '১ম কথা 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি করে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিষ থাকে দু-দিনে হোক দশদিনে হোক সে কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস করে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ভাল।' (ঐ।৩৯৫) 'ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, একদিন পরে হোক পাঁচদিন পরে হোক খদ্দের জুটবে। মাল ভাল না হলে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না—দুচার দিনে হোক, মাসে হোক ফেল হতে হবে।' (ঐ। ৩৯৬)

শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে পত্রিকা চলে না, শরৎচন্দ্র এটা যেমন জানিয়েছিলেন, তেমনি শুধু ফাঁকা স্লোগান তুলেও কাগজ চালান উচিত নয়, এই ছিল তাঁর মত। সম্পাদককে হতে হবে নিরপেক্ষ। তাই অনেক পরে ১৩৩৬ সালে তিনি লিখছেন, 'একখানি মাসিকপত্রের তুমি সম্পাদক, catchword-এর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে।' (১।১০।৩৭৯) আবার কেবল আদর্শ সম্পর্কে নিরপেক্ষ হলেই চলবে না, ব্যক্তি সম্পর্কেও হতে হবে। 'খাতিরে পড়ে ছাই মাটি দেওয়া কিংবা 'নাম' দেখে ছাইমাটি দেওয়া দু-ই মন্দ।' (১।১৩।৩৯৬)

শরৎচন্দ্র নিজে চিত্রশিল্পী ছিলেন। কিন্তু পত্রিকায় ছবি ছাপা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। 'ছবির পেছুনে মেলাই কতকগুলো টাকা নষ্ট না করে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না গ্রাহক ছবি চায় কি না, যদি ঐ ফ্যাশান হয় তা হলে নিশ্চয় দিতে হবে।' (ঐ) 'এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা হয় একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোন দিন করি নি। 'Art painting' আমিও নিজে করি। Oil painting আমিও বুঝি—ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বইও পড়ি

নি—কিন্তু 'যমুনা' ছোট কাগজ ওতে সুবিধে হবে না।' (ঐ।৩৮০) 'ছবি দেবে কি হে? দোহাই প্রমথ, আমার গল্পের ভেতরে ছবি দিও না—ওরে বাপ্‌রে। সেই 'কুলগাছ' আর সেই ব্যথিতের মৃত্যুশয্যা। আমি তাহলে লজ্জায় বাঁচব না। তাছাড়া আশা করি, ছবি আমার গল্পে না দিলেও লোকে পড়বে।' (ঐ। ৩৮৩)

১৯১৩ সালেই সম্পাদক হবার বাসনা শরৎচন্দ্রের মনে উঁকিঝুঁকি মারে। ঐ সময়ে ফণীন্দ্র পালকে লেখা তাঁর একটি পত্রে দেখা যায়, 'আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি।' (ঐ।৩৯৬) কোন্ কোন্ লেখক লেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায় করতে হবে, সে সম্পর্কেও শরৎচন্দ্রের অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। (ঐ।৩৯৬, ৪০৪) 'যমুনা'র অর্থকরী দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি লিখেছেন, 'অসুবিধা এই, 'যমুনা' আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছুদিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে এবং প্রমাণ করে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলে লোক, কিন্তু সে রকম হলে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই।' (ঐ।৩৯৭) "যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশী লক্ষ্য, তারপর আর কিছু।...এ বৎসর যাতে 'যমুনা' অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধিলাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তারপরে অর্থাৎ পর বৎসর আকারটা আরও বৃদ্ধি করে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশী এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরও প্রচার করতে পারতাম তা হলে 'যমুনা' সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হ'ত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না, এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হতে হবে।...আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজ মনে করি।' (ঐ।৪০৩।৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, 'প্রতুত ১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্যন্ত 'যমুনা'র প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা সমালোচনা—কোন-না-কোন রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।' (২।১২)

নেপথ্য সম্পাদনার ব্যবস্থা শরৎচন্দ্র নিজেই উত্থাপন করেন এই পদ্ধতিতে, 'আপনি 'যমুনা' ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে যদি একবার দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্যে যে সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে একটু নির্বাচন ক'রে দিতেও পারি।...অবশ্য এতে আপনার পড়বে (ডাক টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এ দিক থেকে ফেরত পাঠাবার খরচ আমি দেব..কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই শুধু গল্পই লিখি নি। সব রকমই পারি, শুধু পদ্য পারি নে।' (ঐ।৩৯৪) সম্পাদনার ইচ্ছা তাঁর এত প্রবল হল যে নিজের খরচায় কাগজপত্র লেনদেনের জন্য এক পিঠের ডাক খরচ নিজেই দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ৯ই আগষ্ট ১৯১৩ তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন, 'রাত্রে একটু আফিমের ঘোরও ধরে উঠে, বসে লিখতে পারি নে। এ সব কারণেই লেখা এত কম হয়। তাই আর এক কাজ করেছি প্রমথ, আমি নিজে ত 'যমুনা' চালাতে

পারি নে, তাই আমার সমস্ত শিষ্যগুলিকে লাগিয়ে দিয়েছি। নিরুপমা, বিভূতি, সুরেন, গিরীন এবং ভাগলপুরের আরো দুই একজন সাহিত্যিক লিখতে সুরু করে দিয়েছেন। দেখা যাক 'যমুনা'র অদৃষ্টে কি সঞ্চয় হয়। তারা ত বলেছে তুমি গুরুদেব তোমার কথার আমরা অবাধ্য হব না। এই যা আশা।' (ঐ।৩৮৩)

আমরা দেখেছি সাময়িক পত্রিকায় গ্রাহকদের ভাল জিনিষ দেবার কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্রাহকদের রুচি সম্পর্কে তাঁর ধারণা সব সময় ভাল ছিল না। প্রমথনাথকে অপর একটি পত্রে তিনি লিখছেন, 'এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে ক'রে দিই। যদি ভাল বলে মনে না হয় প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না। হয় 'সাহিত্য', না হয় 'যমুনা'য় না হয় 'ভারতী'তে বেরুতে পারবে, কিন্তু তোমাদের এটা নতুন কাগজ—একটু 'পুণ্যের জয়', কিংবা ঐ রকমের ঘোরাল সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরেছে কিংবা ঐ রকম জলধর সেন গোছের দিব্যি হবে। লোকও খুব তারিফ করে বলবে—হাঁ, হিঁদু কাগজ বটে! হিঁদু ideal বজায় হচ্ছে। তা নইলে এসব লেখা একে ত শক্ত, তার পরে তেমন হিঁদু মাখামাখি নয়।' (১।১২।৩৫৯) এই উক্তিগুলি নিজের রচনা 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে। আর 'নতুন কাগজ' হল 'ভারতবর্ষ'। প্রমথনাথ 'ভারতবর্ষ' পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঐ পত্রে তাঁকে শরৎচন্দ্র আবার লিখছেন, 'তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি না ভার নিয়েছো, তাই বলা, না হলে বলতাম না। যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর তা হ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী তপ-জপ-কুলকুণ্ডলিনী ফুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখাবে। ওটা বাজারে বড় করে নাম দেয়। আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় ক'রে ম'রে যাবে (একটা বিষ খাওয়া চাই!) আর না হয়, কোথা থেকে হঠাৎ সবাই এসে এক জায়গায় মিলে যাবে। এ হলে লোকে খুব তারিফ করবে। এবং নুতন কাগজ বার করতে হলে এই সব নভেলের বড় আদর।' (ঐ। ৩৫৯) 'লোকে' অর্থাৎ সাধারণ পাঠক-পাঠিকা। শরৎচন্দ্রের ঐ মন্তব্যের মধ্যে এদের রুচি সম্পর্কে বিশেষ উচ্চ ধারণা প্রকাশ পায় না। এর পরই তিনি ব্যঙ্গ করে লিখছেন, 'আমাকেও যদি অনুমতি কর আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐ রকম একটা চমৎকার জিনিস অতি সত্বর লিখে দিতে পারব। যা ভাল বিবেচনা কর লিখবে। আমি সেই মতই রচনা সুরু ক'রে দেব। যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্রটন্ত্র পাঠাবে বিশেষ আবশ্যক। ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতগুলো (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যেসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও একটু আভাস দিয়ে দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখবে।' (ঐ। ৩৬০) এই সস্তা জনপ্রিয়তার ফরমূলা দেবার মধ্যে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার চাহিদা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গই রয়েছে। ফরমায়েসি লেখা তাঁর পক্ষে সত্যই সম্ভব না হলেও জনরুচিকে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। যাই হোক, এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর।

৯ই আগস্ট ১৯১৩-য় এক পত্রে সম্পাদক হবার তীব্র বাসনা শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে জানান। তিনি বন্ধুকে লেখেন, 'প্রমথ, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলি। এতদিন এ কথাটা আমার মনে

ওঠে নি। এত বড়বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ Sub-editor কি :কিছু একটা করে না ? অনেক কাজ তাদের করে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা এও আমিই দিতে পারব। তা ছাড়া, ছবি judge করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্য আলোচনা এও, (আর কিছু ভাল না জুটলে) আমি করে দেব। ১০টা থেকে ৪।৫'টা পর্যন্ত খাটলে আমি খুব পারি।…তারপরে এখন যেমন সকালে ও রাত্রে নিজের কাজ করি তখনও করব। দেখো যদি কেউ আমাকে নিতে স্বীকার করে। একজন ভাল Editor থাকলেই আমি কাজ চালিয়ে দেব। অন্তত ছি ছি কাগজ কোন মাসেই হতে দেব না এ assurance তুমি আমার হয়ে দিতে পার। এ চাকরি আমার খুব ভাল লাগবে, তবে যদি টিকসই হয়। এমন না হয় দুদিন পরেই বলে তোমাকে চাইনে, যাও। এর মধ্যে যদি কোন কাগজ বার হবার কথাবার্তা হয় আর তোমার চেনাশোনা থাকে তাহলে চেষ্টা দেখ—আমার বর্মা আর পোষাচ্ছে না।' (১।১৩।৩৮৪) অর্থাৎ সম্পাদনা করতে হলে সম্পাদক বা সহকারীকে হতে হবে সব্যসাচী, এই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত। তাঁর সামনে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি সুরেশ সমাজপতির সম্পাদনার আদর্শ। ২৫ এ জুলাই ১৯১৩ (?) তিনি প্রমথনাথকে লিখলেন, 'দেখ না লেখবার কায়দা বঙ্কিমবাবু রবিবাবুর। প্রথমেই একটা something ! …মনে হয় প্রমথ নিজের একটা কাগজ থাকত ত, বাক্যবাণে এই তথাকথিত পণ্ডিতগুলির চৈতন্য করিয়ে দিতাম। কতক বলে সমাজপতি, কিন্তু তার বলায় কোন ফল হয় না, কেন না, তার অনেকটাই শুধু গ্লানি আর গালিগালাজ। প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। তাতে আওয়াজ থাকে কামানের মত, কিন্তু ভেতরে একটা ছররাও থাকে না। তাই লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আমি Jack of all trade কি না, সঙ্গীত, চিত্র, দর্শন, কাব্য, নাটক নভেল, সব বিষয়েই এক ফোঁটা এক ফোঁটা জানি, তার উপর নির্ভর করে মনের সাধে 'যুদ্ধং দেহি' করে দিতাম।' (১।১৩।৩৮২)

কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তাঁর নিজের একটা কাগজ হল না। 'যমুনায়' বকলমে কাজ করে তাঁর সম্পাদনার আকাঙ্ক্ষা কিছুদিন প্রশমিত হতে লাগল। তবে তাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। 'যমুনা' আর 'ভারতবর্ষ' শরৎচন্দ্রকে নিয়ে টানাপোড়েন সুরু করল। ফণীন্দ্রবাবু ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের নাম অন্যতর সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'শরৎচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" অসমাপ্ত রাখিয়া শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।' (২।২০)

এটি ইংরাজী ১৯১৫ সাল। পরের বছর তিনি রেঙ্গুন বরাবরের মত ছেড়ে দিলেন আর বাংলায় বসবাস সুরু করলেন। সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তাঁর সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে তিনি সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন, স্বেচ্ছাসেবক হলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সম্পর্কে এলেন। শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদও অলংকৃত করেন।

নির্মলচন্দ্র চন্দ্রও এই সময় ছিলেন দেশবন্ধুর বিশিষ্ট সহকর্মী ও বঙ্গদেশে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা। এই সূত্রে শরৎচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র খুব কাছাকাছি এসে পড়লেন। নির্মলচন্দ্র মজলিসি লোক ছিলেন। তাঁর বৈঠকখানায় বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তির সমাগম হত। শরৎচন্দ্রও সেখানে প্রায়ই আসতেন। সেখানে ভালো তামাকের ঢালাও আয়োজন থাকত, শরৎচন্দ্র সেই আসরে বসে মৌজ করে গড়গড়া টানতেন। রাজনীতি ছাড়াও সেই আসরে সাহিত্য শিল্প নাট্যকলা নিয়েও আলোচনা হত। গুণীব্যক্তিরা তাতে অংশগ্রহণ করতেন। শরৎচন্দ্র নির্মলচন্দ্রের চেয়ে বয়সে বারো বছরের বড় হলেও দুজনের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল।

রাজনীতি ছাড়াও দুজনের আর একটি বিষয়ে মিল ছিল, তা হল নাট্য-প্রীতি। শরৎচন্দ্র বাল্যকালে নিজেই অভিনয় করতেন। চন্দ্র-পরিবারও দীর্ঘকাল নানাভাবে নাট্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। তাই যখন নাট্যকলাসম্পর্কে একটি অভিজাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা উঠল, শরৎচন্দ্র যুগ্মসম্পাদক হিসাবে নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করতে সম্মত হলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক-খ্যাতি তখন তুঙ্গে। ১৯২২-এ অকসফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস তাঁর 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছে, ১৯২৩-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'জগত্তারিণী পদক' অর্পণ করেছে। ঐ বছর 'বঙ্গবাণী'তে তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। এই পটভূমিকায় ১৯২৪-এ শরৎচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্রের যুগ্মসম্পাদনায় 'রূপ ও রঙ্গ' নামে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল। তার প্রথম প্রকাশ, শনিবার, ১৮ই আশ্বিন ১৩৩১।

পত্রিকাটি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে এই পত্রিকার প্রথম বৎসরের কয়েকটি সংখ্যা বাঁধান আছে। এই পত্রিকাটির কথা খুব কম লোকই জানেন। শরৎজীবনীগ্রন্থে তার উল্লেখমাত্র আছে।

পত্রিকাটি ১২৪।২।১ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে গদাধর প্রিণ্টিং ওয়ার্ক'স্ লিমিটেডে শ্রীজানকীনাথ বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লেখকেরা ছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু (পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা), অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শিক্ষাদানে অর্দ্ধেন্দু), জলধর সেন (কবিব্যাধি—গল্প), ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ('বাসর' নাটকের অপ্রকাশিত দৃশ্য), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (রঙ্গমঞ্চের প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (রূপ ও রঙ্গ—কবিতা), অমরেন্দ্র রায় (যাত্রার কথা), ফণীন্দ্রনাথ পাল (অভিনেত্রী)। প্রথম সংখ্যার লেখকেরা সকলেই স্বনামধন্য। এঁদের মধ্যে জলধর সেন ও ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সংখ্যায় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, ৺নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺ধর্মদাস সুর, ৺অমৃতলাল বসু, জে. এফ ম্যাডানের ছবি ছাপা হয়। ছবিগুলি একরঙ্গা, নীল রং-এর কালিতে ছাপা হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার রচনাগুলি থেকে পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া যায়।

পত্রিকাটির সম্পাদনে শরৎচন্দ্র কতটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন, তা জানা যায় না। তাঁর নিজস্ব রচনাও এই পত্রিকায় বিশেষ ছিল না। দেখা যায়, যে এর ত্রয়োদশ সংখ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্রের ভাষণ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা

থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। পঞ্চবিংশ সংখ্যায় মুন্সিগঞ্জে সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি শরৎচন্দ্রের ভাষণ প্রকাশিত হয়। একচত্বারিংশ সংখ্যায় 'চরিত্রহীন' থেকে কিরণময়ীর 'ভালবাসা' সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে নিজের যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকায় শরৎচন্দ্র নিজে কোনও মৌলিক রচনা দিতে এগিয়ে আসেন নি।

কিন্তু পত্রিকাটির বিষয়-নির্বাচন ও অঙ্গসৌষ্ঠব শরৎচন্দ্রের সম্পাদকীয় আদর্শকে প্রতিফলিত করে বলেই মনে হয়। কবি দেবেন্দ্রনাথ বসু তাঁর আশীর্বচনে 'রূপ ও রঙ্গে'র উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, 'রস-সাহিত্য ও ললিত-কলার যাহা লক্ষ্য, সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি, বিকাশ ও বিস্তার কল্পে যাহা প্রযোজ্য বা অপরিহার্য, আশা করি এ পত্রিকা প্রচারে তাহার অণুমাত্র ত্রুটি হইবে না।···এ পত্রিকা ক্ষুদ্র হইলেও এর উদ্দেশ্য বৃহৎ ও মহৎ।'

৫ই বৈশাখ ১৩৩২-এর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, "রূপ ও রঙ্গে'র নববর্ষের আশা যে সে জাতির সত্য আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুগামী হইয়াই চলিবে। জীবনের আনন্দলাভের ধারা নির্দ্দেশের শক্তি দেশের মস্তিষ্ক যাহারা সেই চিন্তাশীল মনীষীদেরই আছে। সাহিত্যকে জীবনের অনুষঙ্গী ও পথনির্দ্দেশক করিবার প্রচেষ্টায় দেশের সুধীসমাজ 'রূপও রঙ্গকে' নিজ চিন্তাধারায় সমুজ্জ্বল করিবেন—'রূপ ও রঙ্গ' নববর্ষে এই আশা লইয়াই জাতির ভাবের অনুষঙ্গী হইতে চাহিতেছে।'

ভালো-কাগজে-ছাপা, অনেক-চিত্র-শোভিত এই পত্রিকাটি সাহিত্য শিল্প নাট্যকলা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত করে। প্রথম সংখ্যার লেখক ছাড়াও আরও অনেক খ্যাতনামা লেখক বিভিন্ন সময়ে এই পত্রিকায় যোগ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর), নজরুল ইসলাম, সাফিয়া খাতুন, খুরসিদ জাঁহা চৌধুরী প্রভৃতি। পত্রিকাটির বিষয়বস্তুও ছিল বিচিত্র। এতে গিরিশচন্দ্রের কিছু অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত হয়। এতে নিয়মিতভাবে নট-নটীদের জীবনী বা আত্মকথা প্রকাশিত হতে থাকে। স্বর্গীয়া সুশীলাবালার জীবনালেখ্য প্রসঙ্গে লেখা হয়, 'পতিতা, সমাজ-বিবর্জিতা ক্ষুদ্র মানবীর জন্য আমরা প্রকাশ্যভাবে শোক করিতেছি দেখিয়া আশাকরি সুরুচি-সম্পন্ন সুধীসমাজ আমাদের উপর বক্রদৃষ্টি পাত করিবেন না।··· দেশ-কাল-পাত্র অনুকূল হইলে হয়ত আবার আমাদের বাঙ্গালা দেশেই স্বর্গীয়া সুশীলাবালার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইবে।' অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকথা এই পত্রিকায় চিত্রসহযোগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এ সবের পিছনে শরৎচন্দ্রের আদর্শের প্রভাব কল্পনা করে নিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

এই পত্রিকায় দেশবিদেশের নাট্যকলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ বসু লেখেন 'শকুন্তলায় নাট্যকলা', শৈলেন্দ্রনাথ বিশী 'ভরতনাট্যশাস্ত্রের কথা', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' (ধারাবাহিক), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'বাংলার প্রথম রঙ্গমঞ্চ'। আবার বিদেশী নট-নটী ও নাটক প্রসঙ্গে বহু আলোচনাও প্রকাশিত হত, যেমন এলেন টেরী, সারা বার্নাড, মাক্স রেনর্ড প্রভৃতির সচিত্র জীবনী। স্বয়ং নির্মলচন্দ্র চন্দ্র 'অভিনেতা কীনের' জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে লিখে যেতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভারত, চীন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের ফিল্ম ব্যবসায় সম্পর্কে লেখেন।

অমরেন্দ্রনাথ রায় 'যাত্রার কথা' লেখেন। অভিনয়-কলা সম্পর্কে অভিনেতাদের শিক্ষামূলক কিছু প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হত।

সম্পাদক-যুগলের রাজনীতি-প্রীতির দারুণ 'রূপ ও রঙ্গ' পরে শুধু কলাবিষয়ক পত্রিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনীতিক ও সমাজনৈতিক নিবন্ধ সমূহও প্রকাশিত করতে থাকে। এতে মহাত্মাজীর রচনা 'পতিতা ভগ্নীগণ', লাজপত রায়ের ভাষণ 'নারী ও জাতির ভবিষ্যৎ', আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ 'শিক্ষার বাহন' ইত্যাদি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধানে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে দেশবন্ধুর অনেক নিজস্ব রচনা মুদ্রিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম স্বর্গত দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় 'অর্ঘ্য' প্রদান করেন—

হায়, চিরভোলা হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া।
কেন এত ভালবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি।
ধরা আজ তোমা ধরিতে পারে না
আজ তুমি দেবতার ;
নিয়া যাও দেব, মরু-হুগলীর
অর্ঘ্য নয়নসার।

'রূপ ও রঙ্গ' কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, তা জানা যায় নি। এর সংখ্যাগুলিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। সব কটি সংখ্যা চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা যায় নি। যতদূর দেখা গেছে, শরৎচন্দ্রের সম্পাদকীয় আদর্শে পত্রিকাটি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র সাময়িক পত্র সম্পাদনা সম্পর্কে আরও কতকগুলি মূল্যবান্ মন্তব্য করেন। ২৪শে ভাদ্র ১৩৪০-এ 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু ভৌমিককে তিনি লিখেছেন, '...প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটাই মনে হয় মাসিক পত্র বহু লোকের প্রিয় করে তোলার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত করে তোলার জন্যে যে লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্য পাঠকদের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য—সে টিঁকছে না।

'ইনটেলেকচুয়াল গল্প বলে একটা কথা আজকাল শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখিনি, কিংবা দেখেও যদি থাকি, চিনতে পারি নি। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষনীয়, হৃদয়বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজা দরকার।' (১।১০।৩৮৩)

আবার ৭ই শ্রাবণ ১৩৪২-এ 'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র ঘোষালকে তিনি লেখেন, লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমশঃ দশের উৎসুক ও উৎকণ্ঠ দৃষ্টিলাভ করিতেছে। পূর্বেকার উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব আর নাই। অর্থাৎ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজন এইগুলির প্রয়োজনীয়তাও মানুষ এখন উপলব্ধি করিতেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আসনটি কেবলমাত্র দখল করিয়া রাখিলে চলিবে না, কাজের মধ্য দিয়া স্বকীয় মর্যাদা প্রতিদিন প্রমাণিত করিতে হইবে; নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে তোমার কর্মশীলতা সাধারণের সৌভাগ্য ও কল্যাণ সমৃদ্ধ করিতেছে। আর কোন পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলা কাগজের পক্ষে শুধু ব্যর্থতা নয়, বিড়ম্বনা।

'কাগজ পরিচালনার কাজ কেবলমাত্র দায়িত্বপূর্ণই নয়, নানাভাবে বিঘ্নসঙ্কুল। বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকাংশ সাময়িক নিঃসন্দেহ, তথাপি সংযম ও অসহিষ্ণুতার (?) অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি নির্ভীক আলোচনা সাপ্তাহিকের প্রাণ, কর্তব্যবিমুখতা অপরাধ, তবু বলি তার চেয়েও মহার্ঘ তোমার আপন চরিত্র ও মর্যাদা।' (১।১০।৩৮৬)

আর একটি পত্রে অবিনাশবাবুকে তিনি লেখেন, '...লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি-বা সহ্য যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক-সমাজ সইতে পারেন না। তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম—সর্বপ্রকারেই তার কল্যাণের সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না।' (ঐ)

আবার ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ তারিখে 'বেণু'র সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে শরৎচন্দ্র লিখছেন, ''একখানি মাসিকপত্রের তুমি সম্পাদক, catchword-এর মোহ যেন তোমাকে পেয়ে না বসে।' (১।১০।৩৭৯)

পত্রিকা-সম্পাদনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘকালীন ভাবনার মধ্যে বিশেষ কোনও হেরফের হয় নি। ফণীন্দ্র পাল মহাশয়কে তিনি যে ধরণের উপদেশ দিয়েছিলেন, অবিনাশ ঘোষাল মহাশয়ের প্রতি তাঁর নির্দেশও তদনুরূপ। এবং তা চিরকালীন সত্য।

ইচ্ছা থাকলেও সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পাদনায় শরৎচন্দ্রের পক্ষে কোনও সাময়িক পত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। তবে 'যমুনা'য় কিছু দিন তাঁর যুগ্মসম্পাদনার নিদর্শন আছে, আর 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক তিনি ছিলেন প্রথম থেকেই। শেষোক্ত পত্রিকায় তাঁর সম্পাদকীয় আদর্শ কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তার পূর্ণ বিকাশের সময় ও সুযোগ বোধ হয় ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রকে আমরা পুরোপুরি সম্পাদক হিসাবে পাই নি। তাঁর মূল্যবান্ মন্তব্য ও সীমিত কার্যকলাপের মধ্যে আমরা সম্পাদক শরৎচন্দ্রের একটি আভাসমাত্র লাভ করেছি।

সূচী ঃ –

১। শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ। সম্ভার। পত্র-সংখ্যা (এম. সি. সকার এণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড)

২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৩। শরৎ-চেতনা—ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

সেদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবন প্রেক্ষাগৃহে শরৎস্মৃতিসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে সমবেত ছাত্রদের বলেছিলাম, "এই তোমাদের শরৎচন্দ্রকে পড়বার প্রকৃষ্ট সময়। তিরিশ পার হয়ে গেলে শুভ সময়টি উত্তীর্ণ হয়ে গেল।" এই কথায় আমার কোন সহকর্মী কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে, আমার দশ মিনিটের বক্তৃতার উত্তর দিলেন সওয়া এক ঘণ্টা ধ'রে, এবং কিছু কিছু ছাত্র শ্রোতাও একটু যে বিরক্ত হল না তা নয়। কিন্তু কি করব। বহুদিন পরে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে ঐ কথাগুলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে পড়ে তখন ক্লাস টেনে পড়ি। 'পথের দাবী' রাজরোষে পড়েছে। স্কুলের ছুটির দিন, একান্ত সঙ্গোপনে, একলা ঘরে, দরজায় খিল দিয়ে 'পথের দাবী' পড়ছি, আর খুট ক'রে একটু শব্দ হলেই চমকে উঠছি, কেউ ডাকলে বিরক্ত হচ্ছি-- কতবার বালিশের তলায় আর বই লুকোনো যায়। মনের মধ্যে চিন চিন করছে ; সাহেব পাই'ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলি। সব্যসাচীর এক একটি কথা যেন ফুলঝুরির মত মনের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে। সেই সময় আবার কাজী নজরুল ইসলাম নবদ্বীপে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বকণ্ঠের 'কারার ঐ লৌহকপাট' তাঁর বিসর্পিত কেশগুচ্ছের মত দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে অন্তরে। সে কি অসহ্য উত্তেজনা। তারপরেই কলকাতায় বেড়াতে এসেছি। কলেজ স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যাচ্ছি বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ধরে (তখনও বোধ হয় বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট নাম হয় নি)। দেখি দলে দলে লোক ছুটে আসছে। একটু পরেই সাদা আর দেশী পুলিশ পেছনে দেখা গেল। তারা সব লোককে ছত্রভঙ্গ ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন যেটি 'বামা' পুস্তকালয় (তখন তার নাম কি ছিল মনে নেই) সেই গ্রন্থালয় থেকে বাজেয়াপ্ত 'পথের দাবী' বিক্রী হচ্ছে—প্রকাশক ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (না কি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)। লোকে এক কপি ক'রে সংগ্রহ করছিল, এমন সময় পুলিশ খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে দিল এবং জনতাকে মেরে ধরে তাড়াল। আমাদের সামনে পুলিশ। লাঠি উদ্যত। আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন আমার দাদার বন্ধু। তিনি বিপদে পড়লেন। বন্ধুভ্রাতার মাথাটি রাখা বুঝি দায় হল। আমাদের দিকে সাহেব পুলিশ পড়েছিল। দাদার বন্ধু কি সব হিন্দীতে বললেন। আমাদের মাথা বজায় রইল, অবশ্য ঐ পথে আর এগোন গেল না, ফিরে আসতে হল। আমি ত অবাক। আমার সামনে ওদিকে দেশী পুলিশ লোক ঠেঙাল আর এ দিকে সাদা পুলিশ আমাদের ছেড়ে দিল ! এর জন্য আফশোস হল। সাদা পুলিশের কাছ থেকে এই দয়া আমি কোন মতেই গ্রহণ করতে পারছিলাম না। তারাও যে মানুষ, এ কথাটা আমি তখন স্বীকার করতে একেবারেই অনিচ্ছুক।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের শাসক-শাসিত সম্পর্ক হবার ফলে, আমাদের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গী একপেশে হয়ে গিয়েছিল। শাসকের সমপর্যায়ভুক্ত হলে দেশী পুলিশও যে সাদার ওপর দিয়ে যেতে

পারে, এ কথাটা মন মানতে চাইছিল না। আর তখন আমার যা বয়স তাতে উত্তেজনাটাই আস্বাদন করতে ভালো লাগত। উত্তেজনার বদলে যুক্তি মনকে তখন টানত না। ইংরেজকে তাড়ানো এক কথা আর ইংরেজ চরিত্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন আলাদা কথা। এই উত্তেজনাই 'পথের দাবীর' মূল উপজীব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দেশে ও কালে এই বই-এর প্রচারের অন্ত থাকবে না।' পথের দাবীর নায়ক আর নজরুলের বিদ্রোহী—একই ছাঁচে গড়া ; তবে নজরুলের উচ্ছ্বাস কবিতাতে বেশী সুযোগ পেয়েছে——শেষ পর্যন্ত সে ভগবানের বুকেও পদাঘাত করেছে। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী কিন্তু ভারতী আর অপূর্বকে ক্ষমা করেছেন। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সত্যদৃষ্টি প্রকট। এই দৃষ্টি নজরুলের নেই। উগ্র রাষ্ট্রনীতিতে ভারতী-অপূর্বের মত কোমল, সাধারণ চরিত্রের স্থান নেই বলে, তাদের জগৎ থেকে সরিয়ে দিতে যে ব্রজেন প্রয়াসী সে এই মূল সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। সাধারণ মানুষকে নিয়েই জগৎ ও সমাজ। এক একটি ঐতিহাসিক ক্ষণে এই সাধারণ মানুষের কাউকে কাউকে বিশেষ কাজ করতে যখন হয় তখন সেই কাজের অনুপযুক্ত অনেক মানুষ, ঝোঁকের বশে লিপ্ত হলেও, নিজেদের অক্ষমতায় কাজটিকে ব্যাহত করে। তাদের ক্ষতি হয়, হয়ত তাদের চরম মূল্যও দিতে হয়। এই ইতিহাসের ধারা। শরৎচন্দ্র ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর গতিপথ থেকে অপূর্ব ও ভারতীকে সরিয়ে দিতে গিয়ে, সব্যসাচীতে যে গুণের আরোপ করেছেন সে গুণ কিন্তু জীবনের তথ্যাভিত্তিক নয়, তবু যে শরৎচন্দ্র সব্যসাচীকে এই মানবিক দুর্বলতাটুকু দিয়েছেন সেই দেওয়াতেই তাঁর মৌলিকতা। অনেক ক্ষেত্রে এই গুণ দুর্বলতা বা sentimentality-তে পর্যবসিত হয়েছে, কোন কোন জায়গায় গ্রন্থকার নিজে ভাবালু হয়ে পড়েছেন, চেষ্টা করেছেন পাঠকের চোখের জল ঝরাতে। জানি না ethnology কি বলে এবং ethnology-র তত্ত্ব কতখানি কোন সময়ে সত্য তাও বলতে পারি না। কিন্তু বাঙালীর কাছে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির বিশেষ আবেদন হচ্ছে এইখানে। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীতে সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে 'চোখের বালি' তিনি ৩৬ বার পড়েছেন। এই পড়া যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি বিনোদিনীই হল শরৎচন্দ্রের নায়িকামণ্ডলীর মডেল বা আদর্শ। বিনোদিনী শরৎচন্দ্রে শেষ পর্যন্ত কিরণময়ীতে পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথ এত জীবনসত্যে বা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত যে বিনোদিনীর পরিণতিতে আমরা ব্যথিত হলেও কিছু বলতে পারি না। অন্য কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। বিনোদিনী বিদগ্ধা নায়িকা কিন্তু তার বৈদগ্ধ্যকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করান নি। বিনোদিনীর মনোহারিত্ব বিশ্বাসের সীমার মধ্যেই আছে। কিন্তু কিরণময়ীর মনোহারিত্ব সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। তাকে অসামাজিক হতে হয়েছে কিন্তু তাতে ক্ষতি যে তার নিজের চেয়ে বেশী সমাজের, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, শরৎচন্দ্র তার রূপ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যা পর্যন্ত সবই শুধু অসাধারণ করেন নি, একেবারে অবিশ্বাস্য করেছেন। এতে শিল্পকলার, বিশেষ করে, উপন্যাসের শিল্পকলায় ত্রুটি ঘটেছে। তা ঘটুক। কিন্তু শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর tragic পরিণতি ঘটিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই যে ব্যতিক্রমের পথে পা বাড়ানো এইখানেই তাঁর মৌলিকতা। বিনোদিনী সমাজের শাসন মেনে নিল, কিরণময়ী পারল না। এক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শরৎচন্দ্র এখানে রোম্যাণ্টিক হয়ে উঠেছেন ; যা

অভাবিত তাকেই আটপৌরে জীবনে ধরে দিতে গিয়ে দেখাচ্ছেন সেই অভাবিতের মূল্য। এই অভাবিত সম্পদকে আপাঙক্তেয় করে সমাজ নিজেকে দুর্বল করে আর এই সম্পদের নাশে যে অপচয় ঘটে তার বেদনা দুঃসহ। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী অপচিত হয় নি ; সে যেন, তার যা মূল্য তাই পেয়েছে ; সে অতিমূল্যায়িত হয় নি। কিরণময়ী যে নিজের ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারাল তার কারণ, শরৎচন্দ্রের মতে, সে নিজে নয়, সমাজ। সমাজ ব্যক্তিকে ঠেলে দিল নিশ্চিত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে। যে সমাজ এমন ব্যক্তিকে অস্বীকার করে সেই সমাজই অসুস্থ। কিরণময়ীর মানসিক বিকৃতি সমাজের বিকৃতিরই প্রতিফলন।

Shakespeare-এর King Lear নাটকে Cordelia-র হত্যাকে অনেক সমালোচক গ্রহণই করতে পারেন না ; অনেকের মতে Lear অসহনীয় নাটক। A. C. Bradley-র মতে Cordelia-র মৃত্যু হল tragic waste—এই অপচয়ের কোন প্রত্যক্ষ কারণ নেই। যে অকল্যাণের শক্তি সংঘর্ষের ফলে জেগে উঠেছিল তার ক্ষোভ শান্ত হল কর্ডেলিয়াকে পর্যন্ত নিয়ে। একে না নিলে কি চলত না ? এ প্রশ্ন এই শক্তির কাছে অবান্তর। ক্ষুব্ধ অশুভ শক্তির আক্ষেপে কল্যাণের শক্তির কিছু অর্থহীন ক্ষয় ঘটল ; তারপর আবার সেই জনমণ্ডলে স্থিতি এল। নাটকের মধ্যে এমন ইঙ্গিত কিছু দেওয়া হল না যাতে মনে হতে পারে এই অপচয়ের জন্যে সমাজই দায়ী, ব্যক্তি নয়, অতএব সমাজের পরিবর্তন প্রয়োজন।

আজকের দিনে সামাজিক পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন, প্রগতি ঘটানো ইত্যাদি অনেক কথা এমন সহজে, শ্বাসপ্রশ্বাসের মত আমরা বলে যাই যাতে মনে হয় সমাজ নামক পদার্থটিকে আমরা সম্যক চিনি এবং তার পরিবর্তনের চাবিকাঠিটি আমাদের হাতেই ; প্রয়োজন শুধু চাবিটি ঘোরানো। সেই প্লেটো থেকে আরম্ভ করে এ কালে মার্কস্ এঙ্গেল্স্ লেনিন পর্যন্ত পশ্চিমী চিন্তানায়কেরা সমাজের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন—কেউ সহিংসভাবে, কেউ অহিংসভাবে।

ভারতবর্ষ কখনও সমাজের এই জাতীয় আমূল, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবে নি। অর্থাৎ প্রাচীন চিন্তানায়কেরা। ইংরেজ আসার পরে সমাজের কোন না কোন প্রকারের আমূল পরিবর্তনের কথা কোন কোন কর্মবীর বলেছেন। তার পরের কথা সর্বজনবিদিত। তবু এই পশ্চিমের আর প্রাচ্যের পার্থক্য মৌলিক—জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। প্রাচ্য দিয়েছে ব্যক্তির ওপর জোর আর প্রতীচ্য গোষ্ঠীর ওপর। তাই সামাজিক আলোড়ন প্রতীচ্যে এত বেশী, প্রায় অবিরাম। প্রতীচ্য চেয়েছে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে সুখী করতে আর প্রাচ্য চেয়েছে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। প্রাচ্য সুখ চেয়েছে আপন অন্তরে, সেই অন্তরের পরিমার্জনায়। কিন্তু এই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মৌলিক পার্থক্য বড় কথা নয় বড় সাহিত্যিকের কাছে, সেই সাহিত্যিকের কাছে, যিনি পরিবর্তমান পরিবেশের চেয়ে প্রায় পরিবর্তনহীন মানুষের সত্তাটি বেশী মূল্যবান ব'লে মনে করেন, যিনি জানেন যে, পরিবেশকে অতিক্রম ক'রে ব্যক্তি মানুষটি যখন আপনার সঙ্গে মুখোমুখি একা দাঁড়ায়, তখন সেই একা মানুষের চিত্ত-বেদনাকে রূপ দেওয়াই হল তাঁর কাজ।

শেক্সপীয়র সেই ব্যক্তিমানুষের অন্তরঙ্গ, গভীর, দুরবগাহ চিত্র এঁকেছেন। এই চিত্র এঁকেছেন সফোক্লেস, দান্তে, তলস্তয়, প্রুস্ত, রবীন্দ্রনাথ। এই চিত্রণের দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা যে পরিবেশকে

অবহেলা করেন তা নয় ; তাঁরা জানেন যে এই মনুষ্য সমাজ নামক পদার্থটি এমনই দুর্বিজ্ঞেয়, এর কার্যকারণভাব এত গুহাহিত এবং সর্বোপরি মানুষ এমন রহস্যময় জীব যে, কাউকে দোষ দেওয়া, কারও পরিবর্তন করতে যাওয়া, কোন কিছুর সংস্কার সাধন করতে যাওয়া, এক অর্থে বাতুলতামাত্র। তাই বলে কি মানুষ চুপ করে বসে থাকবে ? সে কি আপনার অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করবে না ? না ক'রে সে থাকবে কি ক'রে ? সে ত চুপ করে বসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। অথচ যে সর্বাঙ্গীণ প্রজ্ঞা থাকলে এই গুরু দায়িত্বের ভার নেওয়া যায় সে প্রজ্ঞা কোন মানুষের নেই, থাকা সম্ভবও নয়। তাই মানুষ বিপ্লব করতে গিয়ে শিব গড়তে বাঁদর গড়ে। মহান সাহিত্যিক যাঁরা তাঁরা এই জগৎব্যাপারকে গ্রহণ করেন, তার ওপর কোন কর্তৃত্ব করতে চান না। রবীন্দ্রনাথের গোরা সেই কর্তৃত্বাভিমান ছেড়ে সুচরিতার হাত ধরেছিল। শেক্সপীয়র ম্যাকবেথকেও চিত্রিত করেছেন, কর্ডেলিয়াকেও। কিন্তু ম্যাকবেথের জীবনের ঘটনাপরম্পরা তার নিজেরও সৃষ্টি, আবার তার ক্ষমতার বহির্ভূত শক্তিরও সৃষ্টি। এ জন্য শেক্সপীয়র কাউকে দায়ী করেন নি। Goneril এবং Regan-এর জন্যে কোন সমাজব্যবস্থা দায়ী নয়। Romeo এবং Juliet-এর জন্যে পরিবেশ দায়ী বটে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ নেই। অবশ্য এই শেষোক্ত নাটক লেখবার সময় শেক্সপীয়র তাঁর প্রতিভার পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছান নি। তলস্তয় War and Peace-এ কাউকেই দায়ী করছেন না। দায়ী করতে গেলেই দৃষ্টির সঙ্কোচ ঘটে, পক্ষপাতিত্ব আসে, রূপের একদেশমাত্র প্রকাশিত হয়। শরচন্দ্রের সৃষ্টির বিস্তার অল্প হলেও তিনি অন্নদা দিদি ও অভয়া দুজনকেই স্বীকার করে, অভয়ার কাছেই অন্নদা দিদির মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন শ্রীকান্তের বকলমে। তাতে কোন দোষ হয় নি। দোষ হল এইখানে যে, তিনি এদের, সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চেয়ে কোন ধরণের সমাজব্যবস্থাকে বাঞ্ছনীয় মনে করছেন তার কোন হদিস দেন নি, দেওয়া সম্ভবও নয়। তাহলে যে সমাজকে ভাঙতে চান তার অবয়বসংস্থান পুরো না জেনে কিরণময়ীর অপচয়টাকেই চূড়ান্ত করে দেখালেন কেন ? সাবিত্রীও আছে, সুরবালাও আছে কিন্তু কিরণময়ীর কাছে তারা ম্লান। কিরণময়ীকে যে মূল্য শরৎচন্দ্র দিচ্ছেন সেই মূল্যবোধ একদেশদর্শী, একপ্রকারের রোম্যাণ্টিক ভাবকল্পনা থেকে জাত।

ধরা যাক বেশ্যাবৃত্তির কথা। বহুকাল ধরে মনুষ্যসমাজে, প্রায় সভ্যতার আদিকাল থেকেই এই বেশ্যারা সমাজে রয়েছে সব দেশেই। বহু আন্দোলন সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাকে দূরীভূত করা সম্ভব হয় নি। কেউ যদি এখন সাবিত্রী খুঁজে পান পতিতাদের মধ্যে তাতে ত শুধু একটি ব্যতিক্রমমাত্র ধরা পড়ে। ব্যতিক্রমের জন্যে কোন সাধারণ ব্যবস্থা করা যায় না। ব্যতিক্রমকে চিরকাল মূল্য দিয়ে আসতে হয় আপন কষ্টে। কোন সমাজব্যবস্থাই সকল ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র এই ব্যতিক্রমের প্রতি সহানুভূতিতেই মৌলিক।

অজয়-কৌমুদী

[কুমুদরঞ্জনের 'অজয়' কাব্যের আলোচনা]

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

'অজয়'-নামক কাব্যগ্রন্থ কবি কুমুদরঞ্জনের পরিণত বয়সের রচনা। এর অধিকাংশ কবিতাই ছন্দোবদ্ধ রসাত্মক রহোভাষণ, সুতরাং একে গীতিকাব্য আখ্যা দেওয়াই সমীচীন। পল্লীপ্রেমিক প্রকৃতির দুলাল কবির কাছে অজয় নদ ও উজানি গ্রাম প্রকৃতিরই প্রতীক। এই কাব্যের প্রথম কবিতাটিও অজয় সম্পর্কে। কুমুদরঞ্জন তা'তে বলেছেন—"উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।" প্রকৃতই উজানি তাঁর নিতান্ত আপন, অজয় তাঁর প্রাণের প্রাণ। অজয়ের কল্লোলে কবি কুমুদরঞ্জন পূর্বসূরিদের ভক্তিমন্ত্রের প্রতিধ্বনি পেয়েছেন ঃ

"সে তো কেবল নদ নহেকো—নয়কো সে তো জল,
সে-যে তরল গীতগোবিন্দ, চৈতন্যমঙ্গল !"

জয়দেব ও লোচনদাসের পুণ্যস্মৃতির ধারক ও দিব্যমাহাত্ম্যের দ্যোতক অজয় কুমুদরঞ্জনের হৃদয়কে অমৃতরসে নিষিক্ত করে। আমার মনে হয়—কুমুদরঞ্জনের প্রায় সমগ্র কাব্যকৃতি "অজয়"-কবিতার অনবচ্ছিন্ন ভাষ্য—টীকাটিপ্পনীতে কণ্টকিত নয়, বর্ণালী ও সুরসপ্তকের মাধুর্যে স্ফুটীকৃত। অজয়-তীরস্থ উজানি বুঝি মূর্তিমতী প্রেরণা এবং বিশেষ ক'রে "অজয়" সূক্তাবলি কবি-কোবিদের কান্তকোমল মর্মবাণী। হৃদয় উজাড় ক'রে বিচিত্র ভাবরস তিনি বিতরণ করেছেন কবিতাগুচ্ছের প্রতিটি মঞ্জরীতে।

প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত হয়েছিলেন ব'লে কুমুদরঞ্জনের একটি স্বভাবসুলভ সারল্য ছিল—যা' আমরা হ্রদভূমিবাসী ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মধ্যেও দেখতে পাই। ইংরেজ কবি সচেষ্ট ভাবে প্রাকৃত-জনবোধ্য ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন নিসর্গের নিগূঢ় বাণী প্রচার করতে। কিন্তু অবচেতন মানসের প্রভাবে তাঁর অনেক কবিতা নীতির নীরসতায় বিড়ম্বিত এবং বহুস্থলে গাদ্যিক বাক্যশৈলীর পল্লবগ্রাহিতাদুষ্ট। তবে ওয়ার্ড'স্ওয়ার্থ অজস্র কবিতা রচনা করেছিলেন প্রকৃতির পর্যাপ্তির মতোই ; তাই কবিত্বের বৈষম্য সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টিতে সার্থক রসোত্তীর্ণ কবিতার অপ্রতুলতা ছিল না। কুমুদরঞ্জন ইংরেজ কবির সমানধর্মা হ'লেও সচেতনভাবে সরল বাগ্‌রীতি গ্রহণ করেননি ; বৈদগ্ধ্য তাঁর অশিক্ষিতপটুত্বকে নষ্ট করতে পরেনি, এবং নীতিবাগীশতাকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। নারায়ণ পণ্ডিতের হিতোপদেশের ন্যায় উৎকট ভাবে তিনি নীতির নৈকষ্য ফলা'তে যাননি,—শিক্ষাব্রতীর পক্ষে যা' বিস্ময়কর আত্মসংযমের পরিচায়ক। সুনীতি এখানে সুরুচির সৌরভের মতো বিকীর্ণ হয়েছে—হিত অথচ মনোহারী। অবশ্য ওয়ার্ড'স্ওয়ার্থের সর্বোত্তম কবিতারাজির সমপর্যায়ের সৃষ্টি কুমুদরঞ্জনের গ্রন্থে প্রচুর নেই ; কিন্তু প্রসাদ-গুণে সুস্মিত রসস্নিগ্ধ কবিতার ঐশ্বর্য অকিঞ্চিৎকর নয়। কল্পনার প্রসার, ভাবের বৈচিত্র্য, ভাষার অর্থ-গৌরব ও অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে তিনি ন্যূন ছিলেন না, তবে কাব্যকারুকার্যে বায়রনের মতোই

প্রয়াসশৈথিল্য তাঁর মধ্যে দেখতে পাই, যা' রবীন্দ্রনাথ কিংবা টেনিসনের চরিত্রে ছিল না। আমাদের সৌভাগ্য এই যে তাঁর এরূপ কলাসঙ্কোচ সত্ত্বেও আমরা অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা উপহার পেয়েছি, যা' তাঁকে অমর ক'রে রাখবে। বৈষ্ণবপদাবলীর ঐতিহ্যে নিষ্ণাত কুমুদরঞ্জনের ভক্তিপ্রবণতা ও মানবিকতা প্রকৃতিপ্রীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে তাঁর কাব্যকে এক অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে ; সংস্কৃত কাব্যের মণিমঞ্জুষাতে-ও তা' সুলভ নয়। তিনি ছিলেন ভূয়োদর্শী ও অগাধসঞ্চারী ভবভূতির উত্তরসূরি এবং নিজের সমকালীন কালিদাস রায়ের সগোত্র। তবে কবিশেখর কালিদাস আধুনিক বিদ্যাপতি হ'লে কবিকিরীট কুমুদরঞ্জন আধুনিক চণ্ডীদাস—ভাষার অতীত তীরে যাঁর আনাগোনা। বাহ্য সৌন্দর্যের লোভে ভিতর দুয়ারে অর্গল দিয়ে তিনি স্বধর্মচ্যুত হননি,—এটাও সামান্য গৌরব নয়।

"অজয়"-কবিতায় কুমুদরঞ্জন বলেছেন—তিনি বিশ্বপ্রেমিক নন—শক্তির অভাবে, কিন্তু সেটা তাঁর বৈষ্ণবোচিত বিনয়। অজয়-কাব্যগ্রন্থ একজন সমপ্রাণ ভিন্‌দেশী রাজপুরুষকে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁ'র মূলমন্ত্র বার্নসের একটি বিখ্যাত উক্তি—আমাদের কবির অনুবাচনে ঃ

"সুখের সময় আসছে ওগো,
স্বপ্ন নয়কো—সত্যি এ ঃ—
সকল জাতি নিকট জ্ঞাতি,
ভরবে ধরা আত্মীয়ে !"

মানবপ্রেমই বিশ্বপ্রেম ; আপামর জানসাধারণের জন্য কুমুদরঞ্জনের যে-অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক দরদ ছিল, তা'তেই তো প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের পরিচয়। কবির ভাষাতেই বলি ঃ

"ক্রুদ্ধ কেহ হবেন নাকো, ক্ষম্য অভাজন ;
ক্ষুদ্র গ্রামের চৌসীমানায় রুদ্ধ আমার মন।"

কালবিশেষের ইতিবৃত্ত যেরূপ চিরন্তন হ'তে পারে, সীমিত ভূমির বৃত্তান্তেরও সার্বভৌম গুণের অধিকারী হ'তে বাধা নেই। তাছাড়া পরিবারের পরিবেশেই প্রণয়ের সূচনা এবং কুমুদরঞ্জনের প্রণয় পরিবারের পরিধিকে ক্রমশ বিস্তৃততর করেছে ; সুতরাং তাঁর বিশ্বপ্রেম বাস্তবভাবে বিকাসিত হয়েছে, কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত হয়নি। দুঃখ দৈন্য সত্ত্বেও তাঁর চিত্ত ছিল চিরশ্যামল, বন্যার দাপটও তাঁকে করতে পারেনি বিরূপ। বর্তমান যুগের মাৎসর্যতপ্ত মরুভূমিতে কুমুদরঞ্জনের আন্তর-শ্যামলিমা রসিকজনের মর্মক্ষতের বিশল্যকরণী কাব্যাঞ্জনশলাকায় মূর্ত হয়েছে।

শ্রীপাট কোগ্রামের (বা কুমুদগ্রামের) বকুলতরুটি যখন অজয়ের ভাঙনে উন্মূলিত হয়ে ভেসে গেল কুমুদরঞ্জন তখন শুধু পীঠস্থানের বিলুপ্তিতে তাঁর ধর্মপ্রাণ চিত্তে আঘাত পাননি, প্রিয়জনবিয়োগজাত দুঃখ অনুভব করেছেন—চোখের জলে তা'র স্মৃতির উদ্দেশে নিবাপ-অঞ্জলি দিয়েছেন ঃ

"মনে পড়ে তোমার স্নেহ, তোমার শীতল ছায়া ;
মনে পড়ে ফুলের সুবাস, স্নিগ্ধমধুর হাওয়া।
জম্‌ছে মনে হারিয়ে যাওয়া চেনা মুখের ভিড়,—
প্রিয়জনের বিচ্ছেদেরি যন্ত্রণা নিবিড় !"

প্রেমের উত্তরাধিকারী হবার প্রার্থনা জানালেন। মহাকবি কালিদাস-ও রৌদ্রদগ্ধ

ছায়াপাদপের করুণা কীর্তন ক'রেছেন ভিন্ন প্রসঙ্গে, কিন্তু কুমুদরঞ্জন এখানে তার চিরবিরহে কাতর। তাঁর সহজাত প্রকৃতিপ্রেম কালিদাসের নবীকৃত নিসর্গবিষয়ক কাব্য আস্বাদন করে বর্ধিত হয়েছে—এ সম্বন্ধে সংশয় নেই। কিন্তু অজান্তেই তিনি রবীন্দ্রনাথের-ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, যাঁর উপেন জীবিত রসালতরুর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল মানুষের প্রবঞ্চনায়।

কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতিপ্রেম শিশুসুলভ সারল্যে মধুররসান্বিত। বলা প্রয়োজন—এরূপ ক্ষেত্রে ছদ্মপ্রণয়ের অবকাশ আছে, কিন্তু রসবেত্তা কৃত্রিমতা ও স্বাভাবিকতার পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। কেউ কেউ ভাবেন—চিন্তাগোপনের জন্যই ভাষার সৃষ্টি, কিন্তু ওটা ব্যতিক্রম মাত্র, যার সাফল্য নির্ভর করে নিয়মের সাধারণগ্রাহ্যতার ওপর। কুমুদরঞ্জনের বাঙ্‌ময় সাবলীলতা তাঁর প্রকাশের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করে, কষ্টকল্পনার বিভায়া শুধু অবান্তর নয়, অসম্ভব-ও বটে। কবি পল্লীলক্ষ্মীকে বলছেন ঃ

"যেন মা তোমার স্নেহের দীঘিতে
কমলের সাথে নাইতে পাই ;
যেন মা তোমার বিপিন-ভবনে
পাপিয়ার সাথে গাইতে পাই !"

এই স্তবকে খানিক পরিবর্তনের সাহায্যে "দীঘিতে"র সঙ্গে "বীথিতে"র মিল দেওয়া যেতে পারতো এবং "পাই"-এর দ্বিরুক্তি বর্জন করাও সম্ভব ছিল, কিন্তু কুমুদরঞ্জন সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না ; স্বতঃ-উৎসারিত ভাবানুগ শব্দচয় অবলীলাক্রমে বসিয়ে দিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর স্বচ্ছন্দ সারল্য প্রমাণিত হয়। কবি আরো বলছেন ঃ

"তুই গ'ড়ে দিস্ পাতার টোপর, সোনার কিরীট সেই মা মোর ;
তোর অাঁচলের মধুর বাতাস আয়াস ক'রে কি পায় চামর ?
পারিনে পুঁথির ওল্টাতে পাত,
দিই শিস্ শ্যামা পাপিয়ার সাথ ;
গুণ না থাকুক, গুনগুন্ করি বেড়িয়া ও পদ ভ্রমর।"

এই গুন্‌গুন্‌কারী ভ্রমরকে কোন্ গুণগ্রাহী নির্গুণ বলবেন ?

"মধুর নিমন্ত্রণ" কবিতায় কুমুদরঞ্জন মধুকরের স্তুতিগান করেছেন ; এর ছন্দোঝঙ্কার ও শব্দসম্ভার সুমঞ্জুল।

"আয় রে অলি, আয় রে অলি !
মনের বনের চৌদিকেতে
ফুটলো কলি, ফুটলো কলি !
আয় রে মধুর গুন্‌গুনিয়া,
সারঙ্ সুরের জাল বুনিয়া,—
নিমন্ত্রণ আজ করছে তোরে সুসজ্জিত বনস্থলী।"

কবি কল্পনার মুক্তপক্ষে ভর ক'রে ভ্রমরের সঙ্গে উড়ছেন, তা'র মতোই গুঞ্জন করছেন ; সুতরাং তাঁর

দৃষ্টিতে মধুপিপাসু ষট্‌পদ পুষ্পপ্রণয়ী থেকে ক্রমশ দরদী পুরুষ, ছন্দঃকুশল কবি, হৃৎকমলের রবি, প্রেমিক বুকের বাঁশরি ও হোলির ক্রীড়ারসিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। অন্তিম স্তবকে আছে ঃ

"আয় রে ভ্রমর শীঘ্রগতি !
উজ্জয়িনীর আয় কালিদাস,
আয় মিথিলার বিদ্যাপতি !
ভাবের তুফান আয় রে ভাষায়,
আয় রে রামীর চণ্ডীদাস আয় ;
আয় রে ফুলের নিকষ কালা,—
চরণে তোর মরণ দলি !!"

বর্তমান সমালোচক নিতান্ত অরসিক না হলেও নৈয়ায়িক, সুতরাং তাঁর মন কল্পনারথের রশ্মিহীন দুর্বার গতির আতিশয্যে খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে মতভেদের অবকাশ আছে, বিশেষত আমরা যখন জানি "স্কাইলার্ক" কবিতাতে শেলি এবং "শাজাহান" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দুর্দমনীয় কল্পনায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকে ধমক দিয়ে আমরা এই কল্পনার রাসলীলায় যোগ দিতে পারি সানন্দে। কবি যখন বলেন—"বুকের ভাষা গুঞ্জরিছে তোর মুখেতে ফুটবে বলি", আমরা তখন তর্কের মুখরতাকে স্তব্ধ ক'রে কবির সঙ্গী হতে চাই সঙ্গীতের উন্মাদনায় তালে তালে পা ফেলে। বস্তুত, কুমুদরঞ্জনের পর এরূপ সারল্যের উচ্ছ্বাস বাংলা সাহিত্য থেকে বোধ হয় চিরতরে বিদায় নিয়েছে। খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে চাই—তাঁর শিশু-সাহিত্যেও কল্পনাসৌন্দর্যের আনন্দমেলা আছে, কিন্তু শিশুদের জন্য অজস্র অনবদ্য কবিতা, যা আমাদের ছেলেবেলায় বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পরিবেশিত হয়েছিল, তা' আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেলে শিশুসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, এবং শুধু শিশুরাই নয়, প্রবীণ রসজ্ঞরাও প্রচুর নির্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন।

"চঞ্চলের জয়যাত্রা" অজয় কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা, যার লাস্যময় ছন্দ সত্যেন দত্তকে স্মরণ করায় অথচ যার ব্যঞ্জনা অন্তর্নভশ্চারী ঃ

"ঢলোঢল নয়নের ওই মধুদৃষ্টি,
উড়ো মেঘ করে যায় রামধনু সৃষ্টি।
নোলকের আবছায়ে পলকের হাস্য,
যুগ ধরি' চলে তার সূত্রের ভাষ্য !"

ছন্দ ও চিত্রের এখানে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে এবং চঞ্চল তরুণীটি যেন একাধারে রভসাকুলা রাধিকা ও রহস্যময়ী মোনালিসা। এরূপ সৌন্দর্যচিত্রকেই চিরন্তন হর্ষের নির্ঝর বলা চলে। কিন্তু আলেখ্যটি এখনো আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করিনি।

"আঁখি দিয়ে গড়া পথ, সেই পথে যাত্রা,
গতি তার যতিহীন, নাই ছেদ-মাত্রা।
জেগে রয় লেগে রয় পরাণে সে দীপ্তি,

নিমেষের আলাপেতে জীবনের তৃপ্তি ।
ভেদ নাই ভেদ নাই না-পাওয়ায় পাওয়াতে ;
পলকের পরিচয় সোহাগের হাওয়াতে ॥"

ব্রাউনিঙের পংক্তিবিশেষ এখানে স্মৃতিবাতায়নে উঁকি মারবে, কিন্তু কুমুদরঞ্জনের সম্পূর্ণ কবিতাটি একটি নিরুপম সুবর্ণমঞ্জীর—দীপ্তিময় ও ধ্বনিমঞ্জুল। পাওয়া-না-পাওয়ায় মেশা অনুরাগে রম্যমরমীবাদের সূক্ষ্ম সঙ্কেত রয়েছে এবং কবিতাটিও যেন "তিলে তিলে নৌতুন হয়।" কুমুদরঞ্জনের প্রভাব আমার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়, কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতা সাম্প্রতিক কালের কাব্যে এই কবিতাটির অলখ পরশ অনুভব করতে পারবেন। আর, "আঁখি দিয়ে গড়া পথ, সেই পথে যাত্রা"—এই পংক্তির তুলনা কোথায়? তুলনা খুঁজতে হ'লে বোধ হয় মহাকবি কালিদাসের কাব্যসাগরে ডুব দিতে হবে তবে শুধু সাদৃশ্যের জন্যেই, আদর্শের জন্যে নয়।

"গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড্" আরেকটি সুন্দর কবিতা "সড়কের রাজা" সমপর্কে, স্থানাভাবে যার বিশদ্ বর্ণনা দিতে পারছি না। তবে শুধু একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি। নিগূঢ় তত্ত্ব যাঁরা সর্বত্র অন্বেষণ করেন, তাঁরা হয়তো নৈরাশ্যহত হবেন, কিন্তু সৌন্দর্যরসিক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করবেন তার "বেলোয়ারি আওয়াজে" শ্রবণে এবং পথের বাঁকে বঁকে চমৎকার দৃশ্যের দর্শনে :

"বহুভাষী তুমি কথা কও কভু
উর্দু, ফার্সি, বাঙ্‌লায় ;
হিন্দী পুস্তু সবে ওয়াকিফ,
বলো কে তোমারে সামলায় ?
সুর-যে তোমারে হাত্‌ড়ায়,
ঠুংরি কাজরী দাদ্‌রায় ;
ঘটাও সখ্য খান্দানি শেখ
বাবু শেঠ লালা লাঙ্‌লায়।"

তবে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে "অমৃত পিয়াসা" কবিতাটিতে। রাস্তার ধারের বটগাছের গায়ে একটি বালক নিজের নাম লিখে রেখেছে – আমরা অনেকেও হয়তো এক সময়ে তাই করেছি, আর তাই দেখে কবি মানুষের শাশ্বত বাসনার ইঙ্গিত পেলেন—অমৃতত্বের জন্য। অন্তিম স্তবকে বলছেন :

"মানব কেন ছাড়বে—আমি ভাবি—
অমৃতে তার জন্ম হ'তে দাবি ?
সুধার ক্ষুধাই জাগছে যে ওই দাগে,
মন্থনেরি ঢেউটি বুকে লাগে।
আদিম তৃষা মিটবে নরের কিসে ?
দাবির কথা রক্তে আছে মিশে।"

আমি বলবো—রক্তে দাবির কথা থাক্ বা না থাক্, বুকের পরতে পরতে একটি চিরন্তন আকূতি আকুলি-বিকুলি করছে, যার প্রকাশ উপকথায়, কাব্যে ও দর্শনে—সকল জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে।

যাতে অমরত্ব লাভ হবে না, তা' দিয়ে আমি কী করবো ? "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্ ?" ভরসা না পেলে সবাই টেনিসনের মতো ক্লোরোফর্ম-ভেজা রুমালে মুখ চেপে আত্মহনন করতে অবশ্য চাইবেন না, কিন্তু অনেকেই নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হবেন তা'তে আর সন্দেহ কি ? সামান্য একটি ঘটনা থেকে কুমুদরঞ্জন মানুষের এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষার নিশানা পেলেন এবং তাকে কাব্যে রূপায়িত করলেন। তুচ্ছকেও অসাধারণের প্রতীকরূপে লক্ষ্য করা কবিমানসের একটি লক্ষণ। অবশ্য অধিকাংশ অত্যাধুনিক কাব্য ভাষাভিত্তিক দর্শনের মতোই তুচ্ছসর্বস্ব চরম বস্তুতন্ত্রতার নামে এই লক্ষণটিকে টুঁটি চেপে মারতে চলেছে, যার ফলে ভাষাত্মক দুর্বোধ্যতা দর্শনে ন্যায়ের এবং কাব্যে কল্পনার গভীরতার স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু কল্পনার বিনাশ কাব্যের আত্মহত্যারই নামান্তর ; ভূষণপ্রেমিক সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা অবধি একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। অর্বাচীন স্বয়ংসিদ্ধদের অনেকে হয়তো জানেন না যে বৈজ্ঞানিক সৃজনী প্রতিভার মূলেও রয়েছে কল্পনা, যা' আমাদেব বিশ্বদর্শনে বিপুল পরিবর্তন এনে দেয় যুগসন্ধিক্ষণে। তবে কাব্যে মহৎ কল্পনার ক্লীবায়ন সাময়িক দুর্বিপাক মাত্র ; আশা করি এই সাবক্ষয় যুগ স্থায়ী হবে না। জলে ও স্থলে যে-জ্যোতির সাক্ষাৎ মেলে না—সেই জ্যোতিই কাব্য-অলকার নিশীথসূর্য—লোকোত্তর মনীষার স্বপ্ন। আমি অবশ্য আধ্যাত্মিক ভাষায় কথা বলছি না।

কল্পনার বর্ণসুষমায় রঞ্জিত "অশ্রুনিবাস" কুমুদরঞ্জনের আরেকটি মনোজ্ঞ কবিতা। টেনিসন অতীতের মধুর স্মৃতির জন্য অসার অশ্রুপাত এবং রবীন্দ্রনাথ ঘুমন্ত খোকার চোখের অপরূপ হাসি নিয়ে সুন্দর কবিতা লিখেছেন, কিন্তু কুমুদরঞ্জন শিশু, কিশোরী, বৃদ্ধ ও সাধুর নয়নবারির যে বৈসাদৃশ্যমূলক বর্ণনা দিয়েছেন তার আবেদন অপূর্ব। সংক্ষেপে তাই এখানে তুলে' দিচ্ছি ঃ

"ওই যে খোকার কাজল চোখের জল,
বল্ দেখি সে কোথায় থাকে বল্ ?
রয় সে যেথা নীলোৎপলের ফাঁকে
অমল ধবল মরাল শাবক ডাকে !"

"ওই তরুণীর নয়নকোণার জল,
বল দেখি সে কোথায় থাকে বল ?
রয় সে—যেথা সদাই কদম ফোটে,
কথায় কথায় ইন্দ্রধনুক ফোটে !"

"ওই যে বুড়ার তপ্ত নয়নধার,
বল্ দেখি রে কোথায় আবাস তা'র ?
সে রয়—যেথা কালাগুরুর গাছে
কৃষ্ণ ভুজগ অসঙ্কোচে নাচে,
তীব্র যাহার দৃষ্টি-বিষের শরে
উড়ন্ত ওই কপোত পুড়ে মরে।"

"ওই-যে সাধুর পুণ্য নয়নধার,
বল্ দেখি রে কোথায় আবাস তার ?
মন্দাকিনীর মন্দানিলের ভরে
কল্পতরুর ফল যেখানে ঝরে,
অস্তরবির ঊর্ধ্ব কিরণ লুটে'
যেথায় পূজার স্বর্ণকমল ফুটে ।…
আঁধার ভেদি' কেন্দ্রউষা হাসে,
ও-নীরটুকু সে-দেশ থেকে আসে ।"

সম্পূর্ণ কবিতাটি না পড়লে তার অনবদ্য সৌন্দর্য ও অফুরন্ত মাধুর্য উপভোগ করা যাবে না। এটি কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম এবং এ বিষয়ে হয়তো যে কোনো সাহিত্যে অনন্য। "বুড়ার আঁখিজলে"র একটি ছোট্ট কবিতা আমার জানা আছে (—কবির নাম ভুলে গেছি), কিন্তু আলোচ্যমান কবিতাটি বৈচিত্র্যে নিরুপম এবং এর সমস্ত উপমা কুমুদরঞ্জনের নিজস্ব। কবিতাটি মানবহৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিচায়ক। বস্তুত, কান্নার স্বরূপ না জানলে বোধ হয় কবি বা তত্ত্বজ্ঞ হওয়া নিরর্থক, যদিও কবিবিশেষের মতে কবিতার থাকবে শুধু অর্থহীন সত্তা, ম্যাক্‌বেথের প্রাগন্তিম দৃষ্টিতে যেরূপ মনুষ্যজীবন। কিন্তু বিনি-মানের খেলা তত্ত্বমীমাংসা তো নয়-ই, প্রকৃত কাব্যও নয়,— বড়োজোর প্রহেলিকা বা জাদুমন্ত্র—যেমন সংস্কার-স্বপ্নমঙ্গলের হিং টিং ছট্'!

ভক্তি, ধর্ম, প্রেম ইত্যাদি বিষয়েও অনেক সুন্দর কবিতা —যা' প্রচলিত চিন্তাধারার অববাহিকার অন্তর্গত—অজয় কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তাদের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় ;—"অজয়"-এর মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করাই আমার উদ্দেশ্য।—"চিত্রকরের ভুল" আরেকটি সুরম্য কবিতা, যার শেষ দিক্‌টি খুব চমৎকার। রাজসভার এই তরুণ চিত্রকরকে চন্দ্রোদয়ের ছবি আঁকতে বললে সে আঁকে একটি হাস্যময়ী ললনার আলেখ্য—যে তার আঁচলখানি গায়ে টেনে নিচ্ছে ; সবাই পটুয়াকে উপহাস করলো, কিন্তু রাজকন্যা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকতে বললে সে আঁক্‌লো সমুদ্রসৈকতে কাঁটাগাছে একটি রৌদ্রক্লিষ্ট মলিন মুকুল ; আবার চারদিকে হাসির রোল উঠলো, শুধু রাজকন্যার অধর স্মিত-প্রসন্ন। রাজা তা'কে একটি নির্গুণের ছবি আঁক্‌তে আদেশ করলেন ; শিল্পী আঁকলো মাঠের মাঝে পলাশ গাছে ফুল ফুটেছে আর কাকের দঙ্গল যেন ফুলগুলোকে গালি পাড়ছে। পুনরায় পারিষদদলের বিদ্রুপের ঘটা, কিন্তু—

"আজকে হানি' চক্ষে নতুন ছটা
তারিফ দিলেন আবার রাজার মেয়ে।"

তারপর যখন দয়ার ছবি আঁকার হুকুম হলো, অনেক ভেবে শিল্পী আঁক্‌লো—অনেক দিন্ পরে— রাজকুমারীর মতো করুণার প্রতিমা, যার চরণপানে চেয়ে আছে চিত্রকর নিজে। এবার প্রতিক্রিয়া হলো অন্য রকম।

"সাবাস্ দিলে সভাসদের দলে,
রাজকুমারী কিন্তু এবার বাম ;

নিজের হাতে লিখে দিলেন তলে—

দয়া নহে, প্রেম যে ইহার নাম !"

এই আপাত-ত্রুটিপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কন ক'রে শিল্পী পেলো—তিরস্কার নয়, জীবনের ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার,—যা' শুধু চিত্রের নূতন নামকরণই নয়। মনে হয়, শুধু মর্মিক কবি কুমুদরঞ্জনের পক্ষেই এরূপ কবিতা রচনা করা সম্ভব। অন্তিম স্তবকের মৌন ব্যঞ্জনা কবিতাটিকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের স্তরে উন্নীত করেছে, যার উপমা পাই বনফুলের অণু-গল্পের চকিত চমকে। "সঙ্গীতশালায়" আরেকটি সার্থক রচনা, যার একটি মাত্র স্তবক উদ্ধৃত করছি ঃ

"সুরের সলিলে শুষ্ক গোলাপ আবার উঠিল ফুটিয়া,
মীড়ের তীরেতে কুবেরের চাঁপা ডাল ভেঙে আনে লুটিয়া।
ফিরে নিয়ে এলো হারানো যেসব
শত কণ্ঠের গত বৈভব,
অমরাবতীর চিত্রশালার সব ধার দিলো টুটিয়া।"

কল্পনার নিরঙ্কুশ সাহস লক্ষ্য করুন – চিত্রশালার সব দ্বার খুলে গেলো নয়, সমস্ত প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুলায় লুটে পড়লো আর অমরাবতী হলো নিরাবরণভাবে প্রকটিত! বস্তুত অজয় কাব্যটি আবার পড়তে গিয়ে কুমুদরঞ্জনের অমর কাব্যচিত্রশালার অমিত সৌন্দর্য আমার বিস্ময়মুগ্ধ চোখের সামনে উপস্থিত হলো এবং চিত্র ও সঙ্গীতের পার্থক্য নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেলো। সঙ্গীত শুধু ধ্বনি নয় এবং বর্ণে চিত্রিত কাব্য শুধু দর্শনীয় নয়—উভয়েই মননীয় ও হৃদয়গ্রাহ্য। কালিদাসের মেঘদূত কাব্য চিত্র ও সঙ্গীতের সমন্বয়, রবীন্দ্রাথের একাধিক সদৃশ কাব্যের মধ্যে "বলাকা"ই সর্বোত্তম। কুমুদরঞ্জন এই উভয় মনীষীর দায়ভাগে সমৃদ্ধ হয়েছেন, অথচ স্বকীয়তা হারান নি। বস্তুত, কালিদাস যে ভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছেন, কবিগুরু কুমুদরঞ্জনকে তা' করতে পারেন নি।

"ভাঙ্গা বেহালা" কবিতায় কবিতায় কবি বলেছেন—বাদ্যযন্ত্রটি শুধু অতীতগরিমার স্মৃতি বহন ক'রে ঘরের এক কোণে টাঙানো আছে ঃ

"প্রাণ তা'র ভরপুর সাহানার সোহাগে,
ভোগবতী ধারা টানে সুরশরে বেহাগে।
মল্লার আনে তা'র পথহারা পুলকে,
অলকার সন্দেশ এ নীরস ভূলোকে ॥"

কবিতারূপী ভাঙ্গা বেহালা কিন্তু মোটেই বেসুরো নয়, কবি তা'তে স্নেহতন্ত্রী পরিয়ে দিয়েছেন; তাই আমাদের হৃদয়ে তা' অপূর্ব ঝঙ্কার তুলছে। শব্দসম্ভার-ও শ্রুতিসুভগ এবং তা'র ছন্দোমূর্ছনা হাসিকান্নায় গড়া নাম-না-জানা রাগিনী।

শেক্সপীয়র বার্ধক্যকে 'দ্বিতীয় শৈশব' আখ্যা দিয়েছিলেন। কুমুদরঞ্জন "দ্বিতীয় শৈশব" কবিতায় বলছেন—এই শৈশবে সেই তাজা বর্ণ নেই, সূর্যকরে এখন সেই মাজা স্বর্ণ কই, বুকের সুতোয় নবীনতার মাঞ্জা কোথায়, আর তার আনন্দে অসীমতার পাঞ্জা তো নিশ্চিহ্ন।

"শুষ্ক বোঁটায় শোলার কুসুম রাখলে কে ?
চিত্র ব'লে ব্যঙ্গছবি আঁকলে কে ?
এই শিশু আর সেই শিশুতে তুল করা—
মনকে সে-যে ভুল বুঝায়ে ছল করা ।
মাল্য নয় এ—সূত্র এসে-মাল্যেরি,
বাল্য এ নয়,—শুষ্ক মমি বাল্যেরি !"

শেক্সপীয়র অবশ্য দ্বিতীয় শৈশবের আকর্ষণীয় চিত্র অঙ্কন করতে চান নি, তা' হলেও কুমুদরঞ্জনের কথাই অধিকতর তথ্যসম্মত এবং কাব্যরসে টইটম্বুর ।

"একটি দ্রাক্ষালতার প্রতি" কবিতাটিও রসোত্তীর্ণ, যদিও "ফাটলের ফুল" কবিতার সঙ্গে তা'র ভাবগত সাদৃশ্য আছে ; শেষোক্ত কবিতাটির রচয়িতার নাম মনে পড়ছে না । আগে "ফাটলের ফুল" উদ্ধৃত করছি :

"পাষাণ চেয়ে পাষাণ প্রাচীর, তাহার কঠিন গাত্রে
কেমন ক'রে ফুল ফোটালে একটি বাদল রাত্রে ?
একটি নিশার শবসাধনে এমন মহাসিদ্ধি ?
রূপসাগরের প্রবালদ্বীপের এমনি কি হয় বৃদ্ধি ?
আনলে কে-যে ভাবের জোয়ার এমন নীরস গদ্যে ?
নূরজাহানের জন্ম এ-যে ঊষর মরুর মধ্যে !"

চতুর্দশপদী "দ্রাক্ষালতা" কবিতার ছ'টি পংক্তি এরূপ :

"কে বসালে ঊষর মাঠে এনে আঙুরলতা ?
দিনদুকুরে জুড়ে দিলে আরবনিশির কথা !
মশানে কে বসিয়ে দিলে ন'বৎ সুমধুর ?
মেঘনাদবধ কাব্যে দিলে কীর্তনেরি সুর !···
চিনতে নারি, বিস্ময়েতে দেখছি শুধু চেয়ে—
রাজপুতনায় কে আনিল ল্যাপল্যাণ্ডের মেয়ে !"

অবশ্য দু'টি কবিতাই কুমুদরঞ্জনের রচনা হ'তে পারে এবং উভয়ের নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। কুমুদরঞ্জনের—কাব্য-ভারতীর রত্নালঙ্কারের প্রতি ঔদাসীন্য থাকলেও—পুষ্পস্তবকের আভরণে বিতৃষ্ণা নেই । লক্ষণাগৌরব ও উপমালালিত্য তাঁর বীণার সাতটি তারের মধ্যে দু'টি প্রধান তার ।

"বাউল" আরেকটি মনোরম কবিতা ; যার একটি স্তবক উদ্ধৃত করছি :

"নয় সে কেবল মূর্ত পবিত্রতা,
নয়কো জবা রাঙ্গা পায়ের আলোক ;
কদম্ব সে রসের কেলিকদম,
জঙ্গলেরি জমাটবাঁধা পুলক !"

শেষ পংক্তিটির উপমা অপূর্ব এবং আধুনিক কাব্যের সার্থক রূপকবিস্ময়ের পূর্বাভাস ।

"দরিদ্র" কবিতাটিও সরস, যদিও বিদ্রোহী কবি নজরুলের "দারিদ্র্য" কবিতার আত্মপ্রত্যয় তা'তে নেই ; তবে উভয়ের কবিতায় করুণ সুরের রেশ রয়েছে। কুমুদরঞ্জনের কবিতার শেষ চার পংক্তি এরূপ ঃ

"যূথিকারে তুমি খাতক করো না
হীন সেয়াকুল কাছে ;
পাপিয়ারে তুমি চাতক করো না—
কবি এ করুণা যাচে !"

তিনিও দারিদ্র্যকে প্রার্থী হতে বারণ করেছেন।—"ছোটর দাবী" কবিতাটি সুন্দর ও তথ্যানুগ। কবি বলছেন—ছোট অনেক সময় বড়র দাবী ছাপিয়ে চলে, এবং অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তা সপ্রমাণ করেছেন। একটি স্তবক এখানে নিবেদন করছি ঃ

"তবুরে তার হয় না স্মরণ,—
কুসুমটিকে ভুলতে নারি ;
ভুলতে পারি হোলির রাতি,
ফাগের স্মৃতি ভুলতে নারি।
ভুলি সাগর,—মুক্তাটি তা'র
ক'রে রাখি গলার-যে হার ;
ছোটর অনুরাগের রাখী
আয়াস করে খুলতে নারি ॥"

সাধারণের মধ্যে অসাধারণের আবিষ্কার কবি-মানসের বিশেষ কৃতি।

"আমাদের ঘর" একটি অনবদ্য কবিতা। রম্যাদর্শবাদ এর দৃষ্টিভঙ্গী হলেও চিত্রকল্পে আধুনিকতার ছোপ লেগেছে, যথা—

"দিন দুপুরের গভীর রাতি
দূর অরোরার জ্বলবে বাতি,
শিউলি ফুলের মতন সাদা দুধসাগরের চর ;
আসবে মোদের ডাকটি শুনে
বল্গা হরিণ পেঙ্গুইনে,
দিবসরাতির জ্যোৎস্নাতে জুড়াবে অন্তর।
আয় প্রিয়ে আয়, সেই দেশেতে রচবো মোরা ঘর !!"

দেশটি ঠিক ভৌগোলিক ব'লে বোধ হচ্ছে না, তবু যে সুন্দর তা'তে সন্দেহ নেই। ওমর খৈয়ামকে এখানে অস্পষ্টভাবে মনে পড়তে পারে কিন্তু তাঁর পেয়ালাপ্রীতি নয়।

"কবির দুঃখ" আরেকটি সুন্দর কবিতা ; অবশ্য কুমুদরঞ্জনের প্রতিপাদ্য—এই মহৎ দুঃখ পরম সুখেরই নামান্তর ঃ

"দুখসাগরের সে যে গো ডুবারী,
লোভ তার শুধু মুক্তায়

শঙ্খশামুখ লইতে বিমুখ,
দংশিলে নাহি দুখ তায়।
সে-যে জগতের পাগল হরিণ—
মানেনাকো কোন তর্ক ;
সুদূর বাঁশীতে প্রাণ আনচান,
বুক পেতে লয় শর গো।"

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিজ্ঞানীর মতে বিকৃতির পরিচায়ক, তবে শেক্সপীয়ারের উক্তিবিশেষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কুমুদরঞ্জন এখানে মুখ্যত নিজের কথাই বলেছেন, যদিও তাঁর বক্তব্য অনেক কবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা ছাড়া গভীর জীবন-বোধ ব্যতীত মহৎ সৃজন সম্ভব নয়—তা' কাব্যই হোক বা উপন্যাস নাটকই হোক, এবং এরূপ জীবনবোধে দুঃখের ভূমিকা অবধারিত। পল্লীবাসীরা যাঁর কুটুম্ব ছিল সেই কুমুদরঞ্জন জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই দুঃখ সম্বন্ধে আন্তরিক কথা বলা তাঁর স্বাধিকারের মধ্যে গণ্য, কল্পনাব্যসন নয়।

"কবি লেখে কেমন" কবিতাটিও আত্মবিশ্লেষণাত্মক। টেনিসন বলেছিলেন—

গান না গাইলে মোর নিষ্কৃতি নাই ;
শ্যামার সমান শুধু শিস্ দিয়ে যাই॥"

যদিও দোয়েল শ্যামার থেকে মাজাগলা কালোয়াৎদের সঙ্গে তাঁর সমধিক সাদৃশ্য ছিল। কুমুদরঞ্জন সম্পর্কে কথাটি অধিকতর প্রয়োজ্য এবং তিনি অন্যত্র বলেছেন—বসন্তসখা পরভৃত, যে কবির প্রতীক, নীড় রচনা না ক'রে মাধবীকুঞ্জে বসে আপন মনে সুরের সুধা ঢালে। আলোচ্য কবিতায় অনেক রূপকের সাহায্যে এই তথ্যটি তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। প্রথম স্তবকটি এখানে পরিবেশন করছি ঃ

"কবি তা'র কাব্য লেখে বিটপী ফুল ফুটায় যেমন ;
ডুবারী সাগরজলে মুক্তা তোলে মুঠায় যেমন।
জ্যোতির্বিদ্ যেমনধারা
হেরে হায় নূতন তারা,
ধীবরে মাছের টানে পুলকে জাল গুটায় যেমন।"

তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে কীট্‌সের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, তবে "এহো বাহ্য"। শেলি তাঁর "কবির স্বপ্ন" নামক ছোট্ট কবিতায় বলেছেন—কাব্য অমরত্বের শিশুকুল সৃষ্টি করে, আর কুমুদরঞ্জন বলেছেন—"বাঁধে সে সুরের সেতু কালসাগরের এপার ওপার"। তাঁর সম্পূর্ণ কবিতাটি রসের প্রস্রবণ। কাব্য-রচনার এরূপ বিশ্লেষণ কবিতার মাধ্যমে সুদুর্লভ, অচোর্য মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশের কারিকার কথা স্মরণ রেখেও একথা বলছি। অবশ্য শেলি গদ্যকাব্যে সৌন্দর্য-স্বপ্নভিত্তিক নিজস্ব কাব্যরচনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু কুমুদরঞ্জন কাব্যসৃষ্টি সমর্থন করতে যাননি অন্তত লৌকিক দর্শনের পরি-প্রেক্ষিতে। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত কাব্যসৃষ্টিকে ঈশ্বরোপাসনার তুল্যপর্যায়ের সাধনা বলে গণনা করেছেন, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত কবির পক্ষেই যা' স্বাভাবিক। আমরা অবশ্য কাব্যসৃষ্টিমাত্রকেই তা' মনে করি না।

এই কবিতাটিরই উপসংহার বলা যায় "স্বপ্নের সফলতা" নামক শেষের কবিতাটিকে। উজ্জয়িনীর (বা উজানির ?) রাজা সভাকবি হ'তে কুমুদরঞ্জনকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন এরূপ একটি স্বপ্ন দেখেন তিনি এক ভোরে। চণ্ডীদেবীর মন্দিরে গান গাইতে হবে শুনে শঙ্কাব্রীড়াকাতর কবি সেখানে চললেন এবং রাজার আদেশে একতারা বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করলেন। নূতন গান গাইতে গিয়ে কবি বেসুরো ভাষায় আলাপ করতে লাগলেন। দামাল শিশুর প্রলাপের মতো রাগিণী শুনে সভাসদ্‌রা তাঁকে উপহাস করলো এবং স্বয়ং রাজা—দেবীর সম্মুখে বেয়াদবির জন্য—কবিকে অর্ধচন্দ্রদানের হুকুম করলেন। কবি স্বগৃহে দেবীকে সঙ্গীতে স্তুতি করতেন, দেবী রুষ্টা হয়েছেন তা' কখনো তাঁর মনে হয়নি। তাহলে রাজসভায় ডেকে এনে তাঁকে লাঞ্ছনা করা কেন ? ঠিক সেই সময়—

"স্বর্ণ-প্রতিমা এলেন নামিয়া, রূপে পূর্ণিমা ফুটে ;
শ্রান্ত কবির বদন মুছান স্বর্ণ-চেলীর খুঁটে।"

তখন কবি দেখলেন—রাজসভা নেই, শুধু নীলসাগরসম কালীদহে শতদলাসীনা দেবীর কোলে তিনি ব'সে আছেন, চারদিকে পদ্মের ভীড়, আর তাঁর ওষ্ঠাধরে "কমলে-কামিনী"র সুধাময় স্তন্যধারা ঝরে পড়ছে। অপূর্ব উল্লাসে কবির বুক ভ'রে গেল, চক্ষে ঝরলো আনন্দাশ্রু, তাঁর নিঃশ্বাস পদ্মপরাগের সৌগন্ধ্যে পূর্ণ হলো। ঠিক তখন তাঁর স্বপ্ন অকস্মাৎ ভেঙে গেল।—

"স্বপনের কথা শুনিয়া প্রভাতে বন্ধুরা কহে সবে
ভোরের স্বপন জীবনে না হোক্, মরণে সফল হবে !"

কিন্তু জীবনেই কুমুদরঞ্জনের স্বপ্ন সফল হয়েছে, কারণ কমলাসীনা বীণাপাণির আশীর্বাদে তিনি ধন্য হয়েছেন এবং তাঁর কবিখ্যাতি বাঙালীর হৃদয়রাজসভায় স্বীকৃতি পেয়েছে—তাঁর জীবদ্দশাতেই। চিরকিশোর তিনি, অজয়ের স্রোতে যেন উজান বইয়ে প্রেমবাঁশরীর সুমধুর তানে আপনমনে গান গেয়ে গেছেন, এবং "কবি লেখে কেমন" কবিতায় কাব্যরচনার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন, ওই স্বপ্নের রূপকেই তা'র মর্মার্থ বাস্তব সত্যের সংকেত দিচ্ছে।

"অজয়" কাব্যের অজেয় কবি-মনস্বীকে একটি শ্লোকের দ্বারা আমার সপ্রেম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—

তব লেখনীর চন্দ্রিকাচারু হাসি
প্রস্ফুট করে বঙ্গবাসীর চিত্তকুমুদদলে !
শ্বেতবসনার পাদপীঠ উদ্ভাসি'
মস্তক'পরে নিত্য তোমার কীর্তিকিরীট ঝলে !!

পোড়ামাটি (টেরাকোটা) ও কাঠের কাজ

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

শিল্পময় দেশ এই বাংলা।

এ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিল্পের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ দেশের মানুষের গৌরব। বহু অত্যাচার, অনাচারের পরও আজও বাংলার শিল্প মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে।

বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে এই সব শিল্প-সম্ভার। গ্রামের মানুষ নিজের গ্রামের জিনিসকে খুব একটা মূল্য না দিলেও গর্ব অনুভব করে থাকে মনে মনে। যখনই কোন গ্রামে গিয়ে ভাঙ্গা মন্দিরের খোঁজ করেছি তখনই গ্রামের মানুষ উৎসাহ-ভরে এগিয়ে এসে আলাপ করেছে, ইতিহাস, কিংবদন্তী বলেছে। সেই সঙ্গে দুঃখও করেছে এই বলে যে এত প্রাচীন এই মন্দির, অনেকেই এসেছেন ফোটো তুলেছেন কিন্তু সংস্কার বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেউ করেন নি। এমনকি সরকার পর্য্যন্ত নয়।

গ্রামে ঘোরা আর প্রাচীন কীর্ত্তির ইতিহাস, ছবি সংগ্রহ করার নেশায় বাংলার বহু গ্রাম ঘুরেছি। অনেক জায়গায় আনন্দে মন ভরে উঠেছে আবার অনেক জায়গায় ধ্বংস-উন্মুখ শিল্পকার্য্য-খচিত মন্দির দেখে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আজও বাংলার বহু গ্রামে বহু মূল্যবান কারুকার্য্য-খোদিত মন্দির, অপূর্ব টেরাকোটার কাজে ভর্ত্তি মন্দির অবহেলিত হয়ে ধ্বংস হতে চলেছে। তার হিসাব ক'জনা রাখেন। এই ধরণের একটি মন্দিরের কথা এখানে উল্লেখ করছি। এই রকম কতশত মন্দির যে সকলের দৃষ্টির অলক্ষ্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসাব নেই।

আজ পর্যন্ত এই বাংলায় যতগুলি টেরাকোটার কাজের মন্দির দেখেছি তার মধ্যে ভট্টমাটি মন্দিরের কাজ আমার অপূর্ব লেগেছে। মুর্শীদাবাদ জেলার ভট্টমাটি গ্রাম প্রাচীন। এই গ্রামে বঙ্গাধিকারীগণের দ্বিতীয় কানুনগো বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করে বসবাস সুরু করেন। আজ প্রাসাদ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু অনেকের ধারণা সেই সময় নির্ম্মিত একটি মন্দির অতীতের সাক্ষ্য বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচা পথে অনেকটা গিয়ে হাজির হলাম মন্দিরের কাছে। চারিধারে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল। চারিধারে পাটের চাষ হয়েছে। পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে যখন মন্দিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম—তখন অবাক হয়ে গেলাম মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ দেখে। কেউ বলেন সূর্য্য মন্দির, কেউ বলেন রত্নেশ্বর শিব মন্দির। মন্দিরের মধ্যে ভাঙ্গা শিবলিঙ্গ এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সারা মন্দির-গাত্রে রামায়ণ-মহাভারতের চিত্র নিখুঁতভাবে টেরাকোটার কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরের উপরের চার কোনে চারটি মিথুন মূর্তির কাজ দেখবার মত। এক দিকে দুর্গা প্রতিমা—বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিমায় কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সহ। অপূর্ব চালচিত্রসহ এই দুর্গা প্রতিমা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর একদিকে বলিরাজার দর্পচূর্ণ বিরাট মূর্তিটীও দেখবার মত। একটি মন্দির-গাত্রে অত অপূর্ব টেরাকোটার কাজ ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। অনেক দেবদেবী আছেন। অনেক ফুল নক্সা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে জনসাধারণ

বা সরকার কেউই এই মন্দিরটির প্রতি দৃষ্টি রাখে না। প্রাচীন মন্দির ছাড়াও এই মন্দিরের টেরা-কোটার কাজ শিল্প-জগতে এক অপূর্ব সম্পদ। এখনও সময় আছে, সরকার এই মন্দিরটি গ্রহণ করে সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে অতীতের একটি অপূর্ব শিল্প ও ইতিহাস হয়ত রক্ষা পেয়ে যাবে। যাঁরা আজও মন্দিরটি দেখেন নি আজই দেখে আসুন, নচেৎ ভবিষ্যতে একটি অমূল্য সম্পদ হতে বঞ্চিত হবেন। এই রকম বহু মন্দির অবহেলিত হয়ে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কাঠের কাজের কথা এখানে উল্লেখ করছি। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘোরবার সময় প্রাচীন মঠ-মন্দিরে, টেরাকোটার কাজ, বালির কাজ দেখেছি কিন্তু মন্দিরে কাঠের কাজ আমার নজরে খুবই কম এসেছে। নদীয়ার গ্রামে ঘোরবার সময় নাকাশীপাড়া থানার ধর্ম্মদা গ্রামে একটি ভাঙ্গা মন্দিরের দুপাল্লা দরজা দেখতে পেলাম জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীর গোয়াল-ঘরে! পাল্লাদুটির সর্বাঙ্গে রাম-রাবণের যুদ্ধ, রামরাজা, রাধাকৃষ্ণ, রথ প্রভৃতির অপূর্ব কারুকার্য্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কত দিনের প্রাচীন পাল্লা, কত রোদ জল গিয়েছে এর উপর দিয়ে কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ। অপূর্ব এর শিল্প-নৈপুণ্য। এই ভাবে কত সুন্দর প্রাচীন শিল্প-সম্ভার যে আমাদের দেশে নষ্ট হচ্ছে তার হিসাব নেই। নাকাশীপাড়ার জমিদার-বাড়ীতে একটি খড়ের আটচালা তখনকার দিনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আজ সে আটচালা নিশ্চিহ্ন কিন্তু আটচালার খুঁটিগুলির মধ্যে কয়েকটি খুঁটি আজও নজরে পড়ে। অবশ্য সেই খুঁটি কেটে টেবিলের পা তৈরী হয়েছে। কিন্তু কি অপূর্ব্ব তার কারুকার্য্য। ঐ জমিদার-বাড়ীর দুর্গাদালানের কড়িবরগায় কাঠের কাজ আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কতদিন আগের কাজ কিন্তু আজও নূতন মনে হয়। আর এক জায়গায় কাঠের কাজ দেখলাম। বীরনগরের চণ্ডীমণ্ডপে। আড়াবরগায়, কাঠের থামের কাজ প্রাচীন শিল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সব কাঠের কাজ তখনকার দিনে শিল্পীরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বসে বসে ধীরে ধীরে করত। যেমন সময়-সাপেক্ষ ছিল, তেমনি ছিল অর্থ-ব্যয়। আজকের দিনে সে-সব সুযোগের একান্তই অভাব। মন্দিরের দরজার কাঠের পাল্লায় কাজ, চণ্ডীমণ্ডপে বা ঘরের খুঁটিতে কাঠের কাজ করতে সময়ও যত লাগত অর্থব্যয়ও হত তত। তাছাড়া আজকের দিনে ঐ সব শিল্পীরও অভাব হয়েছে। তাই আমার মনে হয় এইসব দুষ্প্রাপ্য শিল্প কারুকার্য্য যা আজও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবহেলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেগুলির সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা সরকার হতে অবিলম্বে হওয়া উচিত। কলকাতায় বা দিল্লীতে বিরাট সংগ্রহশালা ছাড়াও জেলায় জেলায় সরকারী চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে স্থানীয় উৎসাহীদের নিয়ে যদি একটী করে সংগ্রহশালা করা যায় তো জেলার জিনিষ জেলাতেই কেবল থাকবে না আগ্রহশীল উৎসাহী ব্যক্তিরা গবেষণারও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তা ছাড়া বড় সংগ্রহ শালায় গিয়ে জেলার এইসব ছোটখাট জিনিস হারিয়েও যাবে না। সর্ব্বশেষে এই কথা বলতে চাই যে ভট্টমাটীর মত অপূর্ব্ব টেরাকোটার কাজ হয়ত আরও অনেক মন্দিরে আছে, সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, হয়ত অচিরে নিশ্চিহ্নও হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের কোন কর্ত্তব্যই কি নেই? অতীত ইতিহাস, অতীতের শিল্পকে জানবার চেষ্টাতো অনেকেরই আছে। ভট্টমাটির মন্দিরটি সরকার অবিলম্বে গ্রহণ করে সংস্কার করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন আর জেলায় জেলায় একটি সংগ্রহশালা করে জেলার অপূর্ব সম্পদগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ষাট বছর আগেকার কথা। আমি তখন ঢাকায় ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক। পূজার ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। দুপুরে দিবানিদ্রার অভ্যাস। আমার দাদা মধ্যাহ্ন-আহারের পর বললেন যে, আমাদের বাসার কাছেই একটি ছোট অফিস থেকে 'যমুনা' নামে ছোট একটি পত্রিকায় 'চন্দ্রনাথ' নামে একখানি উপন্যাস ও কয়েকটি ছোট গল্প বেরিয়েছে,—পড়ে দেখো—ভাল লাগবে—এই বলে ছোট চৌকোণা কতকগুলি পত্রিকা আমার হাতে দিলেন। দিবানিদ্রার উপকরণ হিসাবে শুয়ে শুয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গেলাম। ঘুম যে কোথায় উধাও হল টেরও পেলাম না। পত্রিকাটি অখ্যাত—লেখক শরৎচন্দ্রও অজ্ঞাত। অথচ গল্পগুলি অপূর্ব—মনে হল এমনটি বহুকাল চোখে পড়েনি। অজ্ঞাতসারে কবি হেমচন্দ্রের পংক্তিটি আবৃত্তি করলাম—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" আর মনে হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে অজ্ঞাত-অখ্যাত লেখক ইংরেজ কবির ভাষায় বলতে পারেন "ভোরে জেগে উঠে দেখলাম যে আমি জগদ্বিখ্যাত হয়েছি।"

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস বহুবার পাঠ করেছি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তা ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের চেয়ে মানুষ শরৎচন্দ্র-ও আমার মনে কম বিস্ময় বা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে নি।

শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস বহুবার পড়েছি এবং এখনও পড়ি। তাঁর অপূর্ব প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কেন যে তাঁর বইগুলি এত ভাল লাগে, তার বিশ্লেষণ করা কঠিন। তবে এর দুটি কারণই সর্বপ্রধান মনে হয় এবং সেই সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলব।

প্রথমত—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা। তাঁর গল্প ও উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় যেন আমার চির-পরিচিত নরনারীর প্রকৃত রূপ কোন যাদুমন্ত্রবলে জীবন্ত হয়ে আমার সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আমি ছেলেবেলা থেকেই বহুকাল গ্রামে বাস করেছি। 'পল্লী সমাজ' পড়ে মনে হয়েছিল আমাদের গ্রামেরই কয়েকজনের প্রকৃত স্বরূপ অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে আমাকে মুগ্ধ করেছে। যাদের ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করেছি তারাও প্রতিভাবান্ কথাসাহিত্যিকের রসের উপাদান যুগিয়ে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে মনকে অভিভূত করেছে। এই রূপে সমাজের নানা শ্রেণীর নানা প্রকৃতির কত নরনারীর মনের অন্তস্তলের ছবি যে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে অপূর্ব মাধুর্য ও সৌন্দর্য্য-রসের সৃষ্টি করেছেন তার বিশদ বর্ণনা করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত—Proletariat নামে সমাজের যে নিঃস্ব শ্রেণীর দাবির সমর্থনে সারা জগতে আজ কমিউনিস্ট অভিযান চলছে, বাংলা কথাসাহিত্যে তাদের চিত্র শরৎচন্দ্রের গল্পে ও উপন্যাসেই প্রথম পাই। কিন্তু কমিউনিস্ট মতের প্রবর্তক কার্ল মার্কসের Communist Manifesto যাদের নিঃস্ব

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছে—শরৎচন্দ্রের নিঃস্ব সম্প্রদায় সম্বন্ধে ধারণা তার চেয়ে আরও ব্যাপক। স্ব অর্থাৎ আপন বলতে যে শ্রেণীর ধন-সম্পদ্ বা আর্থিক বিভব কিছুই নেই কমিউনিস্টরা Proletariat বলতে তাদেরই নির্দেশ করেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের দরদী মন কেবল তাদেরই নিঃস্ব বলে গণ্য করেনি। যারা সামাজিক নীতি-ভঙ্গের অপরাধে আত্মীয় বন্ধু দ্বারা পরিত্যক্ত এবং সমাজে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত—সামাজিক মান-মর্যাদা, সম্ভ্রম ও সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত—অর্থাৎ ধনে বা মানে যে কোন দিক থেকেই নিঃস্ব—তাদেরও মানুষের মত বাঁচার দাবি আমাদের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন। তারাও যে মানুষের অধিকার নিয়ে জন্মেছে অথচ তা পায়নি বা হারিয়েছে এমন কি তা দাবি করবারও আর সাহস নেই, তাদের দাবি সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করবার এমন সার্থক প্রয়াস শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্পে তিনি কার্ল মার্ক্স বর্ণিত নিঃস্ব সম্প্রদায়ের চিত্র এঁকেছেন—কিন্তু যে সকল নারী দৈবাৎ কোন কারণে নৈতিক চরিত্রের আদর্শ হতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হয়েছে বলে হিন্দু সমাজে স্থান পায়নি এবং বাংলা কথাসাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও রোহিণীর ন্যায় যে শ্রেণীর নারীর মৃত্যু ছাড়া আর কোন পরিণতি কল্পনা করতে পারেননি, সেই শ্রেণীর সাবিত্রীকে তিনি এমন ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে আমাদের মনে এই কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে যে প্রথম শ্রেণীর নিঃস্বের ন্যায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নিঃস্বও মানুষের অধিকার দাবি করতে পারে আনুষ্ঠানিকভাবে সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করলেই। শুধু সেই কারণে শরৎচন্দ্রের 'সতী' গল্পের নায়িকা নির্মলা নারীর মহিমা ও মর্যাদার পূর্ণ অধিকার লাভ করে। কিন্তু দৈবাৎ মুহূর্তের ভ্রমে এই সতীত্বের আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হলেই বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সাবিত্রীর ন্যায় নারী সমাজে স্থান পায় না—এই অন্যায়, বৈষম্যের ও অবিচারের নগ্ন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে অপূর্ব শিল্প-কৌশলে তিনি আমাদের বিবেক ও মনুষ্যত্বকে শাস্ত্র ও সংস্কারের কঠিন মোহ ও নিগড়-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের যুগের অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে 'গণিকা-সাহিত্য' বলে নিন্দা করেছেন। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদকেরা শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস ছাপতে অস্বীকার করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট্. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার প্রস্তাবে বাংলা সাহিত্য বিভাগ থেকে সবচেয়ে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। তবু যে আমি শরৎচন্দ্রকে অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা করি তার প্রধান কারণ তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজের এই নৈতিক নিঃস্ব শ্রেণীর প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন এবং কথা-সাহিত্যের মাধ্যমে ঘোষণা করেন—

"শোন রে মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ঃ ৪৬তম অধিবেশন [তমলুক, মেদিনীপুর, জানুআরি, ১৯৭৪] উপলক্ষে রচিত ও স্মারক গ্রন্থে মুদ্রিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

[৮ শ্রাবণ ১৩৮২ ॥ ২৫ জুলাই ১৯৭৫]

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) প্রদত্ত ভাষণ

মাননীয় সভাপতি মহাশয়,

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা সকলে আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮৩-তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে আমরা সমবেত হইয়াছি বাঙালী জাতির গৌরবকেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানকে প্রণাম নিবেদন করিতে। আমাদের যে পূর্ব্বসূরিগণ তাঁহাদের দূরদর্শিতা, প্রতিভা এবং সাহিত্য-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া একদা এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও আজ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপযোগিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়, কিন্তু তথাপি একথা আজ দুঃখের সহিত বলিব এই প্রতিষ্ঠান এখনও বাঙালীর অন্তরের সম্পদ্ হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই মহৎ প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত অভাবমুক্ত রোগহীন করিয়া রাখিবার সক্রিয় প্রচেষ্টা তেমন দেখিতে পাই না। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার পসরা লইয়া এ প্রতিষ্ঠান, বাঙালী জাতির এই একমাত্র কীর্ত্তিধন্য মন্দির, কোনও ক্রমে জীবনধারণ করিয়া আছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ইহা আমাদের জাতির কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

আমরা দরিদ্র জাতি তাহা সত্য, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যদি প্রত্যহ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের জন্য এক নয়া পয়সা করিয়াও নিয়মিত ভাবে সঞ্চয় করি তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়।

অর্থই কেবল সমস্যা নয়, আগ্রহের অভাবটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে দেশবাসীর তেমন আগ্রহ নাই। একটা গল্প শুনুন। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ইংরেজরা যখন এদেশে ছিলেন তখন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার প্রতিমাসে মাহিনা পাইবার পর কিছু টাকা তাঁহার অধীনস্থ একটি কর্ম্মচারীকে দিয়া বলিতেন—'ইহা দিয়া কিছু ইংরেজি বই কিনিয়া আন।' বই পড়িবার সময় তাঁহার ছিল না, বই কিনিয়া পরের মাসে সেগুলি পুরাতন পুস্তকের দোকানে বিক্রয় করিয়া—আবার নূতন বই কিনিতেন। তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীটি অবশেষে একদিন প্রশ্ন করিলেন—'আপনি যখন বই পড়েন না তখন বই কেনেন কেন?' সাহেবটি উত্তর দিয়াছিলেন—'বই না কিনিলে আমার দেশের লেখকরা বাঁচিবে কি করিয়া?' আমাদের দেশে এরূপ লোক বিরল। আমরা সাহিত্যিকদের সমালোচনা করি, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানগুলির খুঁত ধরি, কিন্তু তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি না। আমরা প্রত্যাশা করি গাছ ভালো ফুল ভালো ফল দিবে, কিন্তু সে গাছে সার বা জল দিই না। আমরা মুখে আমাদের সাহিত্য লইয়া আড়ম্বর করি, কিন্তু আমাদের মনে সে-সাহিত্য শ্রদ্ধার স্থান পায় না।

সাহিত্য যে মানস-কণ্ডুয়ন নিবারণ করিবার উপকরণমাত্র নহে, তাহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রাণদ সঞ্জীবনী সুধা একথা আমরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এই ঔদাসীন্যই আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। সরকারী বরাদ্দের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়। একটা স্বাধীন দেশের সুসমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন পরিষদ্‌কে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ আমরা সরকারের নিকট হইতে পাই না। তবে এখন শুনিতেছি কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ নাকি আমাদের অভাব মিটাইবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। আমাদের সদাশয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত ডায়াসের উদ্যোগেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। ডায়াস মহাশয়ও পরিষদকে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গভর্নমেণ্ট যদি সাহায্য করেন তাহা হইলে হয়তো আমাদের অভাব থাকিবে না, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন জাতির আগ্রহ, জাতির মনোযোগ। এ পরিষদ্ তাঁহাদেরই, এ পরিষদ্‌কে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই—এই শুভবুদ্ধি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হোক।

পরিষদের কর্ণধাররূপে আমরা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পাইয়াছি, আমাদের মধ্যে আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আছেন। পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক মদনমোহন কুমার একজন বিদগ্ধ অনলস কর্ম্মী, তাই আশা করি

দুর্য্যোগের অন্ধকার যদিও ভয়ালো
তবু তাহা দীর্ণ করি দেখা দিবে আলো।

নমস্কার॥

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

১৩৮২ বঙ্গাব্দে ৮৩-তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে উপহৃত পুস্তক তালিকা

অনাদিভূষণ দাস, কলিকাতা-৬

১। সহস্র শ্লোকী ভাগবত, ২য় খণ্ড—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। রুদ্রপ্রয়াগের চিতা—জিম করবেট

২। মরণের ডঙ্কা বাজে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। দি ক্লিপার অব দি ক্লাউডস্—জুল ভার্ণ

৪। ডুয়েল—ময়ূখ চৌধুরী

৫। দি চ্যানিংস—হেনরী উড

৬। হিমালয়ের স্বপ্ন—হেমেন্দ্রকুমার রায়

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, কলিকাতা

১। শরৎ-প্রসঙ্গ—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

অশোক উপাধ্যায়, কলিকাতা

১। পূর্বপাকিস্তানের প্রবন্ধ-সংগ্রহ—মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত

২। রহস্যময় রূপকুণ্ড—ধীরেন্দ্রনাথ সরকার

অশোক কুণ্ডু

১। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১৩৮২ } অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত

২। „ „ ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৮২ } অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত

৩। প্রেমের গল্প—অরণ্য সেন

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা-৭

১। প্রথমা—প্রেমেন্দ্র মিত্র

২। ফেরারী ফৌজ—প্রেমেন্দ্র মিত্র

৩। স্বগতোক্তি—প্রশান্ত চৌধুরী

৪। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সঙ্গম—সুনীলকুমার নাগ

৫। কাব্যের রূপ ও রস—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

৬। দুই নদীর তীরে—চিত্রিতা দেবী

৭। নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২য় পর্ব—অহীন্দ্র চৌধুরী

৮। মারুতির পুথি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২

১। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—নারায়ণ চৌধুরী

এ কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২

১। সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২। টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী—জুল ভার্ন

৩। এ জার্নি টু দি সেণ্টার অব দি আর্থ ঐ

৪। অ্যারাউণ্ড দি ওয়ালর্ড ইন্ এইট্টি ডেজ ঐ

৫। সুকুমার রায়ের হাসির গল্প—সুকুমার রায়

৬। সুকুমার রায়ের মজার গল্প ঐ

৭। হোয়াট কেটি ডিড অ্যাট স্কুল—সুশান কুলিজ

কালীপদ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-১৭

১। নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চার ইতিহাস ১ম খণ্ড—গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত ২য় খণ্ড—সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কলিকাতা

১। তিনে একে চার—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

জিজ্ঞাসা, ১/১ এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১। রাজনারায়ণ বসু ঃ জীবন ও সাহিত্য—অশ্রু কোলে

২। বঙ্গদর্শন ও বাঙ্গালীর মনন সাধনা—সত্যনারায়ণ দাশ

৩। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য

৪। বঙ্কিমচন্দ্র—অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

৫। আচার্য্য যদুনাথ সরকার ঃ জীবন ও সাধনা—মণি বাগচী

৬। সর্ব্বোদয় আন্দোলনের ইতিহাস—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। রাগ ও তালের মৌল বিষয় ও নুতন সঙ্গীত লিপি পদ্ধতি—নিখিল ঘোষ

৮। *Portraits and Memories—Subodhchandra Sengupta*

জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা-১৩

১। সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

২। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

৩। গ্রন্থাগার বিদ্যা—বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস—সরোজকুমার বসু

দেবকুমার বসু, বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯

১। অন্য মুখ আরেক আকাশ—নীরদ রায়।
২। ঈশ্বরের জন্ম—সুব্রত রুদ্র
৩। পায়রার নখের আঁচড় —সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তী
৪। রবীন্দ্রকুসুমাঞ্জলি, ১ম ও ২য় খণ্ড—ফটিকলাল দাস অনু'
৫। সময়ানুগ, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৩৮২
৬। মানুষ শরৎচন্দ্র—বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। ঋদ্ধ জীবন—নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
৮। ঝুলবারান্দা—চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। শতাব্দীর অভিশাপ—শংকর ভট্টাচার্য
১০। হিজল বনে বসন্ত কাল—বিপ্লব রুদ্র

নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯

১। গৌড় রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা

১। খোলা মুঠি—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
২। উলঙ্গ রাজা ঐ

পঞ্চানন রায়, বাসুদেবপুর, পোঃ শঙ্করপুর, মেদিনীপুর

১। বাংলার মন্দির—পঞ্চানন রায়

বগলাকুমার মজুমদার, কলিকাতা

১। আয়ুর্বেদ ভারতী, ১২শ বর্ষ, ১২শ খণ্ড, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৯ } বগলাকুমার মজুমদার সং
২। আয়ুর্বেদ ভারতী, ১৩শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৮০ }
৩। A Concise History of Science in Indian Medicine —R. C. Majumdar

বাসুদেব মোশেল, কলিকাতা

১। বাংলার দুই ভূমি ও রক্তপলাশ—সুদেব সানা সং

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, তমলুক, মেদিনীপুর

১। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ, তমলুক (২ কপি)

বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২

১। তারার আলো—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২। দেহলি দিগন্ত—রমাপদ চৌধুরী
৩। টুইস্ট—অমিতাভ চৌধুরী

৪। অন্য এক রাধা- শমীক গুপ্ত
৫। উজান যমুনা—মণীন্দ্র রায় ও রাম বসু সং

বেলা দেবী, কলিকাতা

১। বিকেলের রং—বেলা দেবী

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, কলিকাতা-১২

১। এল ডোরাডো—বিমলচন্দ্র সিংহ
২। পূর্ব্বাচলের রূপকথা—বীণা মিশ্র
৩। রক্তাক্ত ভিয়েৎনাম—কমল চৌধুরী
৪। ভারতাত্মা—সুধীরচন্দ্র মৈত্র
৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম
৬। নদীর নামটি মধুমতী –নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৭। অতিমুক্ত—গণেশ লালওয়ানী
৮। রোমান্স—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৯। কাঠ গড়ায় একটি জাতি –অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়
১০। মুমূর্ষু পৃথিবী—হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১১। ওম্ মণি পদ্মে হুম্—খগেন দে সরকার
১২। দীঘি আর আকাশ—কল্যাণী প্রামাণিক
১৩। বাংলাদেশ '৭১—অজিতমোহন গুপ্ত সম্পাদিত
১৪। রবির আলো—সুধাময় দাশগুপ্ত
১৫। মণিকুমার ফুলকুমার—বীণা মিশ্র

ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। বাল্মীকি রামায়ণ (১ম)—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনু

মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলিকাতা-১২

১। কমিউনিজমের উৎপত্তি—সুশোভন সরকার
২। যুক্তফ্রন্ট—র্জজি ডিমিটভ
৩। এক কদম আগে দু'কদম পিছে—ভি. আই. লেনিন

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কলিকাতা

১। যুদ্ধ জিজ্ঞাসা সুভদ্রা ও মিনি—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
২। সাহিত্য তীর্থ, ২১শ বর্ষ বার্ষিকী, ১৩৮১—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সং
৩। যদুনাথ মল্লিকের জীবনকথা—রাসবিহারী মল্লিক
৪। বৈশ্য ইতিহাস ঐ
৫। রসমাধুরী ঐ
৬। বংশ গৌরব ঐ
৭। দাদু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ
৮। কাব্য মঞ্জরী ঐ
৯। কাব্য ও কাহিনী ঐ
১০। শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী দেবীর ইতিবৃত্ত মাহাত্ম্য ঐ
১১। কবিতা মঞ্জুষা ঐ

রায় এণ্ড চৌধুরী, ৮।১ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১

১। অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প—শংকর বসু
২। History of Saivism—P. Jash

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা-১২

১। Communist Manifesto—Marx and Engels
২। Marx and the Trade Union—Lozovsky, A.

শিশু সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯

১। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন—শঙ্কর ঘোষ

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা-১২

১। অদ্বৈতমত সমীক্ষা—শ্রীমোহন ভট্টাচার্য্য
২। ক্ষণভঙ্গবাদ—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
৩। জৈন দর্শনের দিগ্‌দর্শন—সতীন্দ্রচন্দ্র ন্যায়াচার্য্য
৪। প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী
৫। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে দোষতত্ত্ব—অণিমা সাহা
৬। Bengal's Contributions to Sanskrit Literature—Kalikumar Dutta Shastri
৭। Epigraphic Discoveries in East Pakistan—D. C. Sarkar.
৮। Study of Sanskrit in South-East Asia—Ramesh Chandra Majumdar
৯। Facets of Buddhist Thought—A. K. Chatterjee

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১। আমাদের গ্রাম—সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় (২ কপি)
২। জননী জন্মভূমিশ্চ— ঐ
৩। রক্তরাঙ্গা কৃষ্ণনগর— ঐ

সাহিত্য অকাদেমী, কলিকাতা-২৯

১। চণ্ডীমঙ্গল—সুকুমার সেন সং
২। Selected Poems—Monomohan Ghosh

হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

নজরুল রচনা সম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড—কাজী নজরুল ইসলাম
দ্বিজেন্দ্র গীতি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
নজরুল গীতি, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড—কাজী নজরুল ইসলাম
৪ কোরান শরিফ
৫ বিষাদ-সিন্ধু—মীর মোশারফ হোসেন
৬। উপনিষদ—অতুলচন্দ্র সেন
৭। বঙ্কিম রচনাবলী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮। দীনবন্ধু রচনাবলী—দীনবন্ধু মিত্র

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।